বঙ্কিমচন্দ্রের
চন্দ্রশেখর

শ্রীসাধনা বিশ্বাস

বিপি
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো : কলিকাতা-৯ : ফোন-২৪১০২২৮

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৬৫

লেজার টাইপিং
ইউনিক লেজার
সল্টলেক এ. ডি. ২১৬
কলিকাতা-৬৪

Printed by:
Hindusthan Art Engraving Co (P) Ltd.
24 Dr. Kirtic Bose Street
Calcutta-9

উৎসর্গ

দুর্লভ মনুষ্যত্বের অধিকারী
অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর
স্মৃতিতে

সূচীপত্র

এক

উপন্যাস ঃ দেশ-কাল

অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও জটিল মানব-জীবনকে কাহিনিবদ্ধ করার প্রেরণা থেকে উদ্ভূত শিল্পরূপই হল উপন্যাস। প্রয়োজন অনুযায়ী উপন্যাস একটু বড় বা ছোট হতেই পারে।

বোকাচিও-র Decameron থেকেই য়ুরোপে গদ্য ভাষায় যথার্থ আখ্যান শুরু হয়। তিনি এই গ্রন্থকে 'Novella Storie' বা নূতন গল্প আখ্যা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'Novella' শব্দ থেকেই Novel শব্দের সৃষ্টি।

মোটামুটিভাবে বাংলায় উপন্যাস বললেই আমরা বুঝি ইংরেজিতে যাকে বলে 'নভেল'। ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই নভেল আমাদের দেশে এসেছে। বিশেষ করে, ইংরেজি সাহিত্য ও অন্য ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত এক বিশেষ প্রকৃতির পাশ্চাত্য সাহিত্য আমাদের সামনে ধরেছিল উপন্যাসের আদর্শ। ইংরেজিতেও সেই প্রথম যুগে নভেল রূপের বৈচিত্র্য কম ছিল না। যেমন—রহস্যরোমান্স, ঐতিহাসিক রোমান্স, পর্যটন ও অভিযান-কথা ইত্যাদি। কিন্তু নভেলের সর্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম বলে শেষ পর্যন্ত গণ্য হল 'বাস্তব জীবনের চিত্র'। রোমান্টিক নভেল, ঐতিহাসিক নভেলও ছিল। কিন্তু নভেল বলতে সাধারণভাবে রোমান্স নয়, বিশেষ করে বাস্তব সামাজিক চিত্র সবই বোঝায়।

নানা ধারায় নভেলের কতকগুলি সামান্য লক্ষণও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যেমন, নভেলে থাকবে প্রথমত, একটা প্লট—যাকে বাংলায় আমরা বলি কার্যকারণ সম্বলিত কথাবস্তু, ঘটনা বিবৃতি বা ব্যাকরণ যার মূল সেই চিরদিনের গল্প বা উপাখ্যান। ব্যক্তির 'চরিত্র-চিত্র' (character) বর্ণনা আর সংলাপ (ডায়ালগ) নভেলের এই চার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদের অন্য নামেও বলা যায়। যথা—পরিবেশ, প্লট, চরিত্র, সংলাপ, স্টাইল। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে এই সবই ছিল সাধারণ স্বীকৃত লক্ষণ—বঙ্কিমচন্দ্রও নভেলের এই ধারণাই গ্রহণ করেছিলেন।

অথচ অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা অস্বাভাবিক ভাবেই নভেলের উপযোগী ছিল না। কার্যত এবং বাস্তবত ঊনবিংশ শতকের সূচনায় বাঙালি সমাজ জমিদারতন্ত্রে বাঁধা, আর মনের দিকে বাঙালি সমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অংশ আধুনিক ভাবাদর্শে ও সাহিত্যে আস্বাদনে উল্লসিত। ঔপনিবেশিক অবস্থায় তাদের কর্মশক্তি বাস্তবে ব্যাহত। শুধু সামাজিক ক্ষেত্রে ও ভাব-কল্পনায় আছে তার একপেশে প্রকাশের পথ। ডিফো, সুইফ্‌ট প্রভৃতি প্রবর্তিত পাশ্চাত্য নভেলের বাস্তব প্রধান পদ্ধতি কী করে বাঙালি লেখক অনুসরণ করবে। রাষ্ট্রে-সমাজে সবদিকেই সে বাঁধা। বিদেশি শাসন ও

ঔপনিবেশিক অবস্থা তো আছেই, আমাদের সামাজিক বাধাই কি কম? পদে পদে আমাদের সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অস্বীকৃত। ধর্মের বাধা, জাতি বর্ণের বাধা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি। নারী-পুরুষের বাস্তবজীবনে আত্মবিকাশের সুযোগ পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় প্রায় কিছুই নেই। লেখকের পক্ষে তাই প্রেম-ভালোবাসার দ্বন্দ্ব ভরা প্লট রচনার অবকাশ কোথায়? সমাজে ব্যক্তি-চরিত্র ফোটাবার বাস্তব সুযোগও নেই।

তবে গল্পে-আখ্যানে বাস্তব জীবন স্পষ্ট হল শহুরে স্বাধীন 'বাবু'-দের ব্যঙ্গচিত্রে। কিংবা নতুন শিক্ষিতদের জন্য নীতিশিক্ষামূলক চিত্র। তা না হলে তৃতীয় এক পথে আঁকা যায় বাস্তব থেকে পালিয়ে রম্যন্যাসের সূত্র ধরে নতুন রম্যন্যাস বা রোমান্স। সেই রোমান্সের একটা দিক খুলে যেতে পারে ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতনতায়। যে কথা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় অবাস্তব, ইতিহাসের অস্পষ্ট যুগের মধ্যে তাকেও বাস্তব-কল্প বলে খাড়া করা যায়। এ ধরনের রোমান্সের প্রকৃষ্ট প্রেরণাও ছিল। শেক্সপিয়রের রোমান্টিক নাটকে বাঙালি শিক্ষিতরা তখন চমৎকৃত। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইয়োরোপে-ইংল্যাণ্ডে ধীরে ধীরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নভেলের প্রতিষ্ঠা, ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশের ইংরেজি শিক্ষিত লেখককে উদ্বুদ্ধ করে। সেদিকে আরও দৃষ্টি পড়ল টড্-এর ''অ্যানালস্ এ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিজ অব রাজস্থান'' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ইতিহাস, বীরগাথা সবই একসঙ্গে লাভ করা যায় টডের পুরাকাহিনি থেকে। কাজেই বাস্তবপন্থী নভেলের ধারা অপেক্ষা তখনকার পরাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক ধারার নভেলের দিকে সৃষ্টি-উৎসাহী বাঙালি লেখকদের দৃষ্টি ১৮৫০ সালের পরে পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আধুনিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দলিল হ'ল উপন্যাস। উপন্যাসের একদিকে যেমন থাকে জটিলতা, তেমনই অন্যদিকে থাকে সচেতন মনের আত্মপ্রকাশ। উপন্যাসে জীবনের যে সামগ্রিক রূপ উপস্থিত হয় সেই রূপ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কারণ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর ধ্যান-ধারণার সামগ্রিকতা তার শিল্প-সার্থকতার মূল উপাদানরূপে স্বীকৃত। আবার ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ও বিরোধ নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল সমাজ-সভ্যতার বৃহৎ দায় ব্যক্তি কেমন করে বহন করছে, তার রূপায়ণও ঔপন্যাসিকের কর্তব্য। ব্যক্তি-মানুষ সমাজ-পরিবেশের আঘাতে যে যন্ত্রণা অনুভব করছে, যে যন্ত্রণা অস্তিত্বের—তাকে ফুটিয়ে তোলাও ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। ঔপন্যাসিককে প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেশ ও কাল, তাঁর সময় ও সমাজ এবং ব্যক্তিমানস সম্পর্কে সহস্র সম্পর্কের জটিল সূত্রগুলিকে উন্মোচিত করতে হয়। সমালোচক হাডসন তাই বলেছেন— 'Every novel must necessarily present a certain view of life and of some of the problems of life.' এদিক থেকে উপন্যাস মানবজীবনের কাব্যও বটে, আবার ইতিহাসও বটে।

উপন্যাস যে নব্য শিল্পরূপ লাভ করেছে তা বস্তুত আধুনিক জীবনের দাবিতে। আধুনিক জীবনের মৌল লক্ষণ হল আত্ম-সচেতনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ—ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে যা তীব্রতর হয়েছিল এবং উপন্যাস ছিল তার সহযাত্রী। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের প্রাথমিক শর্ত হল সমকালীন জীবন ও চেতনা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বাস্তব আগ্রহ। ঊনবিংশ শতকে যে আত্মসচেতন জীবন ও সমাজ-পরিবেশের উদ্ভব হয়েছিল—তা থেকেই উপন্যাস রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এ সময়টা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কাল, যে কালে আবির্ভূত হয়েছিল নতুন শহরবাসী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ফলে জীবনের দ্বান্দ্বিক অবয়ব তখনকার শিক্ষিত বাঙালির কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। উনবিংশ শতাব্দীর আমাদের সমস্ত জীবনবোধ দাঁড়িয়েছিল এই দ্বন্দ্ব উপলব্ধির সূত্র ধরেই। ইউরোপে শিল্পায়ন নগরজীবনকে গড়ে তুলেছিল এবং নগরজীবনই মানুষকে ব্যক্তিমুখী করে তুলল। কলকাতা ও তার পার্শ্বস্থ গ্রামাঞ্চলকে কেন্দ্র করে তখন জীবনের দুটি ধারা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একদিকে ছিল কলকাতা-আশ্রয়ী দেওয়ান,' মুৎসুদ্দি প্রভৃতি বর্ণমর্যাদাচ্যুত মধ্যস্বত্বভোগী এবং অন্যদিকে ছিল দুর্বল প্রতিপত্তিহীন প্রাচীন পুঁথি-আশ্রয়ী সংস্কৃত বিদ্যাব্রতী সমাজ। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় ও ভবানীচরণের 'নববিবিবিলাস' ও 'নববাবুবিলাস'-এ তৎকালীন এই শ্রেণির পরিচয় পাই। তৎকালীন নাগরিক সমাজেই যুগপৎ অবস্থান করছিল সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা থেকে উদ্ভূত বাবু সম্প্রদায় এবং আধুনিক জীবনাদর্শে দীক্ষিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়। সেই সঙ্গে ছিল প্রাচীন ধর্মধ্বজী সনাতন ঐতিহ্যের বাহক প্রবীণ সম্প্রদায়। ফলে সমাজ পরিবেশে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ মেলে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটিতে।

নভেলের জন্য বাঙালি মনে মনে প্রস্তুত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার সামাজিক ক্ষেত্র প্রস্তুত নেই, ক্ষেত্রটা বরং অচল-অনড়, জাতি-বর্ণ--বাল্যবিবাহ-বদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিরোধী আধা-সামন্ততান্ত্রিক এই নানা চাপ সত্ত্বেও ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃতির আলোয় উদ্দীপ্ত, ভাব-কল্পনা-কুশল বাঙালির হাতে পুরনো রূপকথা-উপকথা-ফোকলোর জাতীয় উপাখ্যান উপন্যাস ও ছোটগল্পের পূর্বরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজচেতনা সম্ভাবনার দাবি নিয়েই উপন্যাস-গল্পে রূপ নিতে লাগল।

দুই

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের প্রথম যথার্থ শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন।" ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ লগ্নে 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের আর্বিভাব। বঙ্কিম-প্রতিভা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সাঙ্গীকৃত করেছিল বলেই বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে তাঁর খ্যাতি যুগপৎ স্রষ্টা ও সম্পাদক রূপে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র মাধ্যমে স্রষ্টা বঙ্কিমের আবির্ভাব এবং ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে আবির্ভাব নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ঘটনা। কারণ, 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস এবং বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে তিনি বাঙালির হৃদয়-মন লুঠ করে নিয়েছিলেন।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের বেশিরভাগ উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পত্রিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন; "পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির্' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য-নাটক-উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিক পত্র, কত সংবাদপত্র , বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রেক্ষাপট। এই সময়ে নাগরিক সমাজের প্রতি বেশির ভাগ মানুষ আকৃষ্ট হতে লাগল। শহরে শিল্পায়নের ফলে গ্রাম থেকে নগদ টাকার লোভে মানুষ চলে আসতে লাগল শহরে। নগর কলকাতায় বুদ্ধিজীবীরা এক স্থির আদর্শের সন্ধানে ব্যাপৃত হল। শুরু হল তাদের জীবনাগ্রহ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন, ধর্মান্দোলন অথবা নবজাগরণের পেছনে ছিল এই জীবনাগ্রহ। কলকাতার মধ্যবিত্ত মানুষকে কেন্দ্র করে এই যে জীবনাগ্রহের অঙ্কুরোদগম হ'ল তার থেকে জন্ম নিল ব্যক্তিচিন্তার প্রাধান্য, স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা। আর এই পথ ধরেই নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন নারীব্যক্তিত্বের পুনর্মূল্যায়ন বাঙালির পারিবারিক জীবনে এক নতুন দিকের উন্মেষ ঘটাল। প্রথা ও সংস্কারধর্মী আন্দোলন, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান, হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা, ব্রাহ্মসমাজের উদারতা ও

গোঁড়ামি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাত ও রূপান্তর, প্রগতিশীল ভাবধারার অভাব, সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার প্রাধান্য—এ হ'ল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকা এবং এই পটভূমিকাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙালির পারিবারিক জীবনের চিত্র স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেল। তখনো একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন পুরোমাত্রায় আসেনি, গ্রামীণ জীবনে দ্বন্দ্ব তথা নাগরিক জীবনের গতিশীলতা তখনো তীব্র হয়ে ওঠেনি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের রীতিনীতি ও আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু পুনরুত্থানের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন কীভাবে মানুষ প্রাচীন সমাজ ও সংস্কারের আচরণবিধি বা ধর্মকে নষ্ট করে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। এই যন্ত্রণার চিহ্ন রয়েছে তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মধ্যে। শৈবলিনী, কুন্দ, রোহিণী, অমরনাথ, নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল সবাই এই যন্ত্রণার সাক্ষ্য বহন করছে। পারিবারিক জীবনে এই কল্যাণবোধের যন্ত্রণাচিহ্নিত আদর্শ বঙ্কিম উপন্যাসের সামাজিক পটভূমি। মানুষের সুখের আকাঙ্ক্ষা যখন বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হয় তখন তার মানসলোকে শুরু হয় প্রবল আলোড়ন। তখন সে সান্ত্বনা খোঁজে অন্তরে, সাড়া পেতে চায় প্রকৃতিতে। সমস্যার এই রূপই প্রকাশিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চোদ্দখানি উপন্যাসকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—ইতিহাস ও রোমান্স, পারিবারিক ও সামাজিক এবং তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক। ইতিহাস ও রোমান্স শ্রেণিতে রয়েছে—'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ' ও 'সীতারাম'। এর মধ্যে রাজসিংহ বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ইতিহাস ও রোমান্স ঃ ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনীর' আবির্ভাবের সঙ্গে বাংলার 'ঐতিহাসিক উপন্যাস-ধারাতে বাংলা উপন্যাসের যাত্রারম্ভ। বঙ্কিমকেই প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিক বলা যায়।

"বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে, তিনি যেমনই ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনই সেই বিজয়-বসন্ত, লায়লা-মজনুর হাতির দাঁতের বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে মালাবদল হয়ে গেল, তারপর থেকে তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখে কে?" —এই হল রবীন্দ্রনাথের কথায় বঙ্কিমের আবির্ভাবের অর্থ। এ আবির্ভাব 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' দিয়ে নয়, 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে।

"যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্ব চালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ; এবং বঙ্গ-উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।" —শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথাটি আংশিক সত্য। কারণ, বঙ্কিমের সৃষ্টি কী জাতীয় রোমান্স, তা একটু বোঝা দরকার। এক কথায় বলা যেতে পারে, রোমান্টিক রস হচ্ছে "অদ্ভুত রসের চমৎকৃতি"—'বিস্ময়' তার প্রধান ভাব। তার অবলম্বন রোমান্স।

রোমান্সেরও অনেক রকমভেদ রয়েছে—আজব কথা, ঘটন অপেক্ষা অঘটন, লৌকিক অপেক্ষা অলৌকিক, অতিলৌকিক যার প্রাণ; আবার শঙ্কাসূচক গা ছমছমে কথা, মিসেস ব্যাডক্লিফ্‌রা যার পশরা খুলেছিলেন; 'গথিক' রোমান্স ও জার্মান রোমান্সের যা প্রধান গুণ; অজ্ঞাত অপরিচিত (স্ট্রেঞ্জনেস) কথা (হয়তো সুদূর দেশের, হয়তো সুদূর কালের)—অর্থাৎ অতীত ইতিহাসের কিংবা ভাবীকালের কল্পকথা, সায়েন্স ফিক্‌শান বা বিজ্ঞানের কল্পকাহিনি তাই এ যুগের রোমান্স; অসামান্য বীরত্বকথা, অসমসাহসিক কর্ম (ভালো মন্দ, জীবনরহস্যের কল্পনাময় কথা, অথবা আবেগরঞ্জিত হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রধান কথা প্রভৃতি)—রোমান্সের এরূপ কত রকমফের দেখা যায়। কিন্তু মূল মানবজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারালে রোমান্সও চলে না। রোমান্সও জীবনসত্য। মানবসত্যেরই স্বীকৃতি; তবে অসাধারণকে অবলম্বনে, বিস্ময়ভাব আশ্রয় করে, অদ্ভুতরসকে প্রাধান্য দিয়ে,—বাস্তবকথা যেমন জীবনসত্যের, মানবসত্যের স্বীকৃতি সাধারণকে অবলম্বন করে, প্রত্যক্ষতার আনন্দকে আশ্রয় করে, মানবরসকে প্রাধান্য দিয়ে রোমান্সেরও সার্থকতা। রোমান্স ও বাস্তবের দুয়েরই উদ্দেশ্য চমৎকৃতি-রসসৃষ্টি। একটার হয়তো অবলম্বন আকবর বাদশাহ, অন্যটির হরিপদ কেরাণী। মাঝখানে বিশিষ্ট মানুষ, অসাধারণ যে সাধারণ হয়ে।

আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে রোমান্স-রস বলে কোন রস নেই। 'রোমান্স' শব্দটি বিদেশী। স্থায়ী ভাব বিস্ময়ের রস-পরিণামের সঙ্গে এর যোগ আছে। এদেশের গল্পসাহিত্যে 'আখ্যায়িকা', 'কথা', রম্যকথার সঙ্গে রোমান্সের মিল দেখা যায়। 'বাসবদত্তা', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি রম্যকথা, যেন জীবনের পটে এক আশ্চর্য স্বপ্নমায়া—সেখানে কল্পনা, সুরম্য কল্পলোক নির্মাণ করে। আমাদেরই মাটির জগতে গভীর অরণ্যের নির্জনতায় স্ফটিকশুভ্র জলের স্বচ্ছতা নিয়ে অচ্ছোদ সরোবরের শোভা জেগে ওঠে, হৃদয়ে সৌন্দর্যের লয় সৃষ্টি করে পশুপত মন্দিরে ভেসে উঠে সর্বশুক্লা পবিত্র শুভ্রতার প্রতিমা অনিন্দ্যসুন্দরী মহাশ্বেতা। বিস্ময় ও সৌন্দর্য, চমক ও চমৎকারিত্বের সংযোগ সে যেন অদৃষ্টপূর্ব এক আনন্দলোক। সেই আনন্দ পটে ছায়াবাণীর মতো শোনা যায় অলৌকিক প্রেমের গুঞ্জরণ—পূর্বরাগ, বিরহ-মিলনের স্বপ্নময় কাহিনি। এ যেন মরলোকে গন্ধর্বলোকের গান।

রোমান্সেও মর্তলোকের অমর্ত্য রাগ—'তার অনেকটা মায়া, অনেকটা ছায়া', যেন প্রাকৃতিক আলো জলের সংযোগে সৃষ্ট আকাশের ইন্দ্রধনুচ্ছটা। জীবন থেকে তা বিচ্ছিন্ন নয়। জীবন-রসেই রোমান্সের সৃষ্টি। রোমান্স অলীক আকাশকুসুম নির্মাণ করে না। কিন্তু পুষ্পিত বৃক্ষ যেমন ধুলিমলিন মূলকে না দেখিয়ে শাখার পুষ্প প্রাচুর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রোমান্স তেমনই বস্তুরূপকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে জীবনের পুষ্প-সমৃদ্ধিকে প্রকাশ করে দেখায়। জীবনের যাবতীয় ভাবকে যদি উদারা মুদারা তারা—এই তিন গ্রামে ভাগ করা যায়, তবে বলতে হয়, রোমান্সের সঞ্চরণ তারা-গ্রামে। সুন্দর-অসুন্দর, প্রেম-ঈর্ষা, ক্ষমা-ক্রোধ, বিনয়-দম্ভ, সবই এখানে সুর-পঞ্চমে ধ্বনিত হয়। চেনা মহল অপেক্ষা অচেনা মহলের

দিকেই রোমান্সের ঝোঁক। সেইখানেই চমক ও চমৎকৃতি নিজেদের সার্থকতা খুঁজে পায়। সেইজন্যই নিকট অপেক্ষা দূর, বর্তমান অপেক্ষা অতীত বা ইতিহাসের প্রতি রোমান্সের মোহ আকর্ষণ। অশ্রুতপূর্ব কাহিনি, অভূতপূর্ব ঘটনা, অদৃষ্টপূর্ব স্থান ও অচিন্তিতপূর্ব ভাব নিয়ে রোমান্সের বিলাস।

উপন্যাসের ধর্ম স্বতন্ত্র। প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজ, গৃহ ও জীবন উপন্যাসের উপাদান। উপন্যাস 'মাটির কাছাকাছি'। তাই কল্পনা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ-রসের জগতের প্রতি তার আকর্ষণ।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নভেল ও রোমান্সের আলোচনা প্রসঙ্গে রোমান্সের যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, তার অনুসরণে বলা যায়—যেখানে আমাদের 'delight in seeing in the near and familiar artistically rendered' তাকেই আমরা অবিমিশ্র বাস্তবপন্থী নভেল বলতে পারি। উপন্যাসে আমাদের সমাজ ও সাধারণ মানুষ মূর্ত হয়ে ওঠে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেব ছবিগুলি নভেলের মধ্যেই সার্থকভাবে পাওয়া যায়। নভেল সাধারণত সমসাময়িক যুগের ঘটনাবলী নিয়ে রচিত, তাই সেখানে কল্পনা প্রকাশের অবকাশ কম। রোমান্সেও বাস্তবতা আছে, কিন্তু সেখানে বাস্তবতা কল্পনার রসে রঙিন হয়ে ওঠে।

ইংরেজ শাসন আমাদের বাস্তবে চাপ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমাদের ভাবনায়-কল্পনায় আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্বলল। কর্মজগতে সাফল্য না পেয়ে সেই নবজাগ্রত জীবন স্বপ্ন, মানুষের মহিমা, অতীতের ভাবময় কল্পনা তার ক্ষতিপূরণ খুঁজছিল মানসলোকে, বিস্ময়ের উদ্বোধনে, অদ্ভুতরসে, আত্মস্ফূর্তিতে। বাঙালির জাগরণের পিছনে একদিকে ছিল রামমোহন-অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের 'বুদ্ধির যুক্তির অভিযান, আর একদিকে বিশেষ করে ১৮৫০ সালের সময় থেকে কল্পনা-আবেগ-আশা-উল্লাস ভরা আত্মস্ফূর্তি যা দেখা দেয় ধর্মের উন্মাদনায় ও সাহিত্যের সৃষ্টি সংকল্পে। ঐতিহাসিক অস্পষ্টতার প্রেক্ষাপট রোমান্টিক কাহিনি রচনায় বঙ্কিমের তাই হস্তার্পণ। বঙ্কিমের কল্পনা ও মোহাঞ্জন বাঙালি পাঠকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন, "ইতিহাস ও উপন্যাস এক বস্তু নহে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্থান সাহিত্যের শ্রেণীতে, ইতিহাসের শ্রেণীতে নয়।"

সামাজিক উপন্যাস সামাজিক তথ্যের রিপোর্ট নয়; ঐতিহাসিক উপন্যাসই বা ইতিহাসের তথ্য-সর্বস্ব হবে কেন? এইটি সর্বস্বীকৃত সত্য—সাহিত্যকে সাহিত্য হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ইতিহাস রস', তা শুধু বস্তু-সত্য নয়, তা আরও সত্য, কারণ তা রসসত্য। তাই যা ইতিহাস কথিত ঘটনা, ইচ্ছামতো তাকে ঐতিহাসিক মানুষদের প্রধান বা অপ্রধান রূপে উপন্যাসে টেনে আনলে তাদের যা ঐতিহাসিক রূপ তাকে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেরূপ কল্পনায় ছড়িয়ে যাওয়া বা পূরণ করা যায়। কল্পনারও

কিন্তু মাত্রা থাকবে—তাহলেই ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করা হয়। আর ভাবে-ভাষায় বিশেষ সময়কার ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রাখা তো বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য ঐতিহাসিক মানুষদের পার্শ্ব চরিত্র রেখে অন্যদের প্রধান চরিত্র করলেও সে উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস হতে পারে। স্কট তো প্রায়ই তা করেছেন। যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন ঃ "লেখক যতই বেশী পরিমাণে নিজ কল্পনায় সৃষ্ট চরিত্র ও ঘটনা রঙ্গমঞ্চে নামাইবেন, ততই তাঁহার একখানা সাহিত্যগ্রন্থ, একটি প্রকৃত কথার বস্তু রচনা করিবার সুযোগ বাড়িবে।"

এই সত্য গ্রহণ করলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকারভেদ হতে পারে। স্কট কি রোমান্স লিখছেন? স্কট অতীতকে শুধু এঁকেছেন তা নয়, জীবন্ত মানুষ দিয়েই ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করেছেন। অথচ থ্যাকারের 'হেনরি এস্‌মণ্ড'কে বলা যায় বেশি বাস্তববাদী ধারা। আবার ডিকেন্সের "টেল অব টু সিটিজ" রোমান্টিকতার ধারা। ইতিহাসের রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সর্বগ্রাসী হয়ে উঠলে উপন্যাস শিল্প সেখানে পরাজিত। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক ঐ দুই-এর মধ্যবর্তী পথ গ্রহণ করবেন। মোটামুটি ভারসাম্য বজায় রেখে লেখক ইতিহাস ও কল্পনাভিত্তিক হৃদয়াবেগের মিলন ঘটাতে পারেন। সেখানেও দুটি সীমা। একদিকে ইতিহাস, অন্যদিকে কল্পনা। মিলিত ঝোঁকটা প্রথম দিকে হলে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', আর দ্বিতীয় প্রান্তে পড়লে 'ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স'।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। এই উপন্যাসে বিমলার পরিণাম এবং জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষার কাহিনি ও চরিত্র সত্যই অনবদ্য। স্কটের 'Ivanhoe' বা ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের সঙ্গে এর কাহিনির কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে'। কিন্তু এর রসবস্তু ও নির্মিতি কৌশল বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব।

উপন্যাসের পটভূমি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশক। আকবর তখন বাদশাহ্‌। বাংলা দেশে মোঘল-পাঠানের প্রাধান্যের লড়াই। মূল কাহিনিই ইতিহাসাশ্রয়ী। বিমলার পরিণাম এবং জগৎ সিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষার কাহিনী এর মূল উপজীব্য। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে কাহিনিবয়নের দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঔপন্যাসিক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে নারীর বিভিন্ন রূপকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-প্রেম, অনুরাগ-বিরাগ সব কিছুকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন উপন্যাসের মধ্যে। এজন্য তিনি নানা শ্রেণির নারীকে পরীক্ষায় নিয়োজিত করেছেন। আয়েষা তাঁর প্রথম পরীক্ষা, দ্বিতীয় পরীক্ষা 'কপালকুণ্ডলা'। তাই কপালকুণ্ডলা চরিত্র রোমান্টিক বঙ্কিমের স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

উপরন্তু কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা, কাহিনির নির্মাণ-কৌশল, ভাবের ঐক্য, কাব্য-ধর্ম, নাটকীয় গুণ, রোমান্সের নবত্ব, প্রকৃতি-চিন্তা প্রভৃতি বঙ্কিম প্রতিভার আনন্দস্ফূর্তি। এইসব গুণেই 'কপালকুণ্ডলা' অভিনব ও দ্বিতীয়রহিত এবং এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যের শার্লকহোমস্‌।

আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তথা 'কপালকুণ্ডলা' পাশ্চাত্য রোমান্সেরই বাংলা সংস্করণ। এই উপন্যাসের অনেকগুলি পরিচ্ছেদের শুরুতে তিনি ভাবের সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে শেক্সপিয়র, বায়রন, মেকলে, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কীটস ও লিটনের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে এই মানস-ভ্রমণ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে, ভাবসংগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের কাছে ঋণী। বিশেষত শেক্সপিয়রের কাছে তাঁর ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। কপালকুণ্ডলার অরণ্যপুষ্ট যৌবনশ্রী, সারল্য ও সহজ অনুকম্পা টেম্পেস্ট নাটকের মিরাণ্ডাকে মনে করিয়ে দেয়। নাটকীয় অবস্থা বা কৌশল সৃষ্টির দিক থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপিয়রের কাছে ঋণী। ডেস্‌ডিমোনার রুমাল হারানো এবং তার ফলে তার সতীত্ব সম্পর্কে ওথেলোর সন্দেহের দৃঢ়তার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পত্র-হারানো এবং সেই পত্র দ্বারা কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্পর্কে নবকুমারের সংশয়ের নিশ্চয়তার সাদৃশ্য আছে। শেক্সপিয়রের নাটকে অনেক নারী পুরুষবেশ ধারণ করেছেন। যেমন, 'মার্চেন্ট অফ ভেনিসে'র পোর্সিয়া, 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর রোজালিণ্ড। লুৎফউন্নিসার পুরুযোচিত ব্রাহ্মণবেশ ধারণের সঙ্গে তার মিল আছে। তা ছাড়া, কাহিনির মধ্যে অপ্রাকৃত ঘটনা-সন্নিবেশের দিক থেকে ও বিশেষত উপন্যাসের শেষাংশে কপালকুণ্ডলা কর্তৃক 'আকাশমণ্ডলে নবনীরদ-নিন্দিত' কপালমালাবিভূষিত৷ একবেষ্টিতকটি ভৈরবী কালিকা-মূর্তি দর্শন এবং তাঁর নির্দেশ শ্রবণের সঙ্গে শেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথের শূন্যে রক্তাক্ত ছুরিকা, বা শূন্য আসনে ব্যাঙ্কোর মূর্তিদর্শনের সাদৃশ্য আছে।

আর একটি প্রভাব, ইউরোপীয় নিয়তিবাদের প্রাধান্য। 'কপালকুণ্ডলা'র বঙ্কিমচন্দ্র দুর্দম নিয়তির অনতিক্রমনীয় লীলা দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ অক্ষমের অন্ধ অনুকরণ নয়, প্রতিভাবানের স্বীকরণ। লেখকের কৃতিত্ব নির্ভর করে সৃষ্টিক্ষমতার ওপর। এই নৈসর্গিক সৃষ্টিক্ষমতায় স্বীকৃত বস্তু অন্তরেব সামগ্রী হয়ে ওঠে, প্রতিটি মানবদেহ একই উপাদানে নির্মিত হলেও দেহগত লাবণ্য যেমন উপাদান-নিরপেক্ষ এক অভিনব সামগ্রী, প্রতিভাধর কবির সৃষ্টিও তেমনই উপাদান নিরপেক্ষ নতুন সৌন্দর্য, তা যেন বাচ্য-অতিরিক্ত একটি ব্যঞ্জনা। তিল তিল ভাব সমুচ্চয়ে রচিত 'কপালকুণ্ডলা'-ও তেমনই এক অনির্বচনীয় বিস্ময়। কল্পনার ঐশ্বর্যে ভাবের নবত্বে ও ভাবসঙ্গতির মাধুর্যে তা এক অনুপম সৃষ্টি। 'কপালকুণ্ডলা' নাম ভবভূতির কাছ থেকে নেওয়া। কিন্তু ভবভূতির কপালকুণ্ডলা হিংস্র, ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণা ও উদ্দাম—বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা করুণায় বিগলিতা, সংযতা, অচপল বিদ্যুতের মতো স্থির। কালিদাসের আরণ্যক শকুন্তলার চেয়ে কপালিনী স্বতন্ত্র। শকুন্তলা আশ্রমবালিকা হয়েও সমাজ-নীতিতে পূর্ণ অভিজ্ঞা। তাঁর অরণ্য সমাজ থেকে দূরবর্তী নয়; কিন্তু কপালকুণ্ডলা খাঁটি আরণ্যক, প্রকৃতই 'বনোন্মত্তা'। গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্ক্ষাই শকুন্তলার প্রিয়

আকাঙ্ক্ষা, তাঁর তাপসী মূর্তিখানি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি; কিন্তু কপালকুণ্ডলা বিবাহ কাকে বলে, তাই জানেন না, গৃহিণীপদের পূর্ণ অধিকার লাভের সুযোগ সত্ত্বেও উদাসীনা; কপালকুণ্ডলা স্বভাব-যোগিনী। শেক্‌সপিয়রের মিরাণ্ডার চেয়েও কপালকুণ্ডলা ভিন্ন; অরণ্যদ্বীপ-লালিতা মিরাণ্ডার 'Petious heart' ও 'Virtue of compassion'-এর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার সাদৃশ্য থাকলেও কপালকুণ্ডলার বনোন্মত্ততা মিরাণ্ডায় অনুপস্থিত। কপালকুণ্ডলার ভক্তিভাববিমোহত্ত মিরাণ্ডায় নেই। মিরাণ্ডা প্রেম ও স্বামী সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু মৃন্ময়ী প্রেমসংস্কারবর্জিতা, স্বামীকে তিনি হৃদয়ে দেখতে পাননি। বঙ্কিমচন্দ্রের নিয়তিবাদও সম্পূর্ণ শেক্‌সপিয়রীয় নিয়তিবাদ নয়, তার সঙ্গে এসিয়াটিক প্রাচ্য অদৃষ্টবাদের মিশ্রণ আছে (নিয়তি কেন বাধ্যতে)।

মীরকাশিম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় স্থাপিত হলেও 'চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)-এর মূল কাহিনি সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। প্রতাপ-শৈবলিনীর আকর্ষণ এবং শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের আদর্শ চরিত্র এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'ই (১৮৮২) একমাত্র বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কারণ এর কাহিনি ও প্রধান চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক। রাজস্থানের চঞ্চলকুমারীকে ঔরঙ্গজেবের বিবাহের ইচ্ছা এবং তা থেকে রাণা রাজসিংহের জয়লাভ এবং চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে বিবাহ। এই মূল ঘটনা ইতিহাস অনুমোদিত। এই কাহিনির সঙ্গে তিনি জেবুন্নিসা-মবারক-দরিয়া বিবির একটি কাল্পনিক উপকাহিনিও চিত্রিত করেছেন। জেবুন্নিসা চরিত্র এক অপরূপ সৃষ্টি।

'সীতারাম' (১৮৮৭) তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস। এতে সামান্য ঐতিহাসিক কাহিনি ও পটভূমিকা থাকলেও ঐতিহাসিক চরিত্রে কল্পনার আতিশয্য বড় বেশি দেখা যায়। রূপের মোহ (শ্রী তুমি এতই সুন্দরী) চরিত্রবান পুরুষকে কতদূর সর্বনাশ করতে পারে এ উপন্যাসে তা দেখানো হয়েছে।

সুকুমার সেন বলেছেন, "গল্পরস সুনির্দিষ্ট দেশকালের আধারে (আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'স্পেস টাইম-কন্‌টেক্সট্'-এ) পরিবেশিত হলেই উপন্যাসকে বলব ঐতিহাসিক, তা না হলে নয়।" তাহলে বঙ্কিমের আটখানা উপন্যাসকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে পারি। আচার্য যদুনাথ সরকারের সমর্থনও তাতে আছে। কিন্তু এসব গ্রন্থের অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়, ইতিহাসকে জীবন্ত করা বা ইতিহাস রসকে আয়ত্ত করা বঙ্কিমের মুখ্য প্রয়াস নয়। ইতিহাস কখনো বা গৌণ, কদাচিৎ তার বিশিষ্ট অবলম্বন। আসলে বঙ্কিমের উপন্যাসকে ঐতিহাসিক, পারিবারিক বা তত্ত্বমূলক বলে ভাগ করাটা একটা বাহ্য ব্যাপার।

বঙ্কিমের ঐতিহাসিক রোমান্স বা রোমান্টিক রচনার কথাটাও বুঝবার মতো। 'কপালকুণ্ডলা'র মতো উপন্যাসে ইতিহাসের যোগাযোগটা তুচ্ছ; তাকে ঐতিহাসিক বলা ঠিক নয়। ঐতিহাসিক রোমান্সও তা নয়। কেবল অতীতের কেন, কপালকুণ্ডলা সর্বকালের জগতের রোমান্স। জগৎ ও জীবনের শাশ্বত রহস্যের কবি কল্পনায় রূপায়িত কথা।

অসামান্যকে, অভাবনীয়কে, বৃহৎকে ভাবকল্পনায় অনুধাবন; পরিচিতের মধ্যেও তার স্পর্শ—এই রোমান্টিক প্রবণতা বঙ্কিমের শিল্পস্বভাবে প্রায় বারবারই স্বীকৃত। তার জন্য ইতিহাসের প্রয়োজন হত না। 'বিষবৃক্ষ' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' মনে করলেই এই সত্য বুঝতে পারি। বঙ্কিমের মন আজন্ম কবি কল্পনায় ও মহৎ অনুভূতির অধিকারী। প্রথম যৌবনে তাঁকে উপন্যাসে দেখি রসমুগ্ধ, রোমান্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টিতে উদ্‌গ্রীব—'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'মৃণালিনী' পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি চেতনা এইভাবে পরিচালিত। রোমান্টিকতার পথে তিনি যে কী অতুলনীয় সার্থকতার অধিকারী, তা দেখি কপালকুণ্ডলায়। কিন্তু এরূপ রসাস্বাদনে বঙ্কিমের তৃপ্তি কোথায়? ''এ জীবন লইয়া কি করিব?'' এই অনির্বাণ জিজ্ঞাসা তাই চাইল জীবনকে আরও ঘনিষ্ঠ করে পেতে, আরও প্রত্যক্ষভাবে। তাই 'বিষবৃক্ষে' স্পষ্ট আধা-সামন্ত বাঙালিসমাজ, পরিচিত গৃহজীবন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জীবন। বঙ্কিম তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা ও কল্পনা ভাবনায় তার সত্যকে উপন্যাসে স্থাপন করলেন। তাই অতীত বা ইতিহাস আর তাঁর কাছে কল্পনার অনিবার্য প্রেক্ষাপট রইল না। রোমান্টিকতাও চাইল না তেমন সুদূর আলো-অন্ধকারের প্রদোষ-পারিপার্শ্বিক। পরিচিতের মধ্যেও জীবনের মহৎ বা নিগূঢ় প্রবৃত্তি কি কম সত্য? না কম বিস্ময়ের, না কম গুরুতর? জ্ঞানার্জনী বৃত্তি ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সামঞ্জস্য তাঁর অবলম্বন। তাঁর রোমান্টিকতার পরিণতি ধারা তাই জীবননিষ্ঠ। সেখান থেকেও অবশ্য জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেল ধর্ম-জিজ্ঞাসায়—যার প্রভাবে বঙ্কিম নির্মাণ করলেন তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'। কিন্তু ''জীবন লইয়া কি করিব?''—এই ভাবনা তো বঙ্কিম উপন্যাসেরও অন্তর্গূঢ় জিজ্ঞাসা। তাই শত হলেও এই জীবন জিজ্ঞাসার দিক থেকে বঙ্কিম উপন্যাসকে দেখাই আসল দেখা। তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ এই জীবন জিজ্ঞাসা, প্রীতিতত্ত্ব, স্বদেশচেতনা, সাম্যবোধ অপরূপ রূপ লাভ করেছে।

'আনন্দমঠ' (১৮৮৪) ও 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৫) হল তাঁর রচিত তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস। 'আনন্দমঠে'র মধ্যে প্রধান ও প্রবল সুর দেশাত্মবোধ। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে দেশ, সমাজ, ধর্ম, জাতীয়তা সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' দেশাত্মবোধের মহাকাব্য রচনা করেন। 'আনন্দমঠ'-এ অগ্নিগর্ভ স্বদেশপ্রেম ও রক্তাক্ত আত্মোৎসর্গ সন্ত্রাসবাদের যুগে বিপ্লবীদের মনে উদ্দীপনা ও হাতে আগ্নেয় অস্ত্র জুগিয়েছিল। 'আনন্দমঠ'-এর কাহিনি বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের দুটি ঘটনা (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ) অবলম্বনে রচিত। এই উপন্যাসে বিশিষ্ট সম্পদ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত। এই সঙ্গীত সম্বন্ধে বঙ্কিম ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, 'একদিন আসিবে—সেদিন হয়ত তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন না— যেদিন এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।' বলাবাহুল্য তাঁর অনুমান সার্থক হয়েছে, কারণ 'বন্দেমাতরম্' আমাদের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত।

উপন্যাসের নামকরণ সার্থক। কারণ উপন্যাসের কাহিনিগুলি যেমন 'আনন্দমঠ'কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে, 'আনন্দমঠ' তেমনি সন্তানদের প্রেরণার উৎসস্থল। আনন্দমঠের বিশিষ্ট চরিত্র ভবানন্দ, জীবানন্দ ও কল্যাণী। একদিকে স্বেচ্ছাকৃত শুষ্ক ও কঠোর কর্তব্যের আহ্বান, অন্যদিকে নারীব প্রতি পুরুষ চিত্তের আদিম আকর্ষণ—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংগ্রাম ভবানন্দ ও জীবানন্দের জীবনে বৈচিত্র্য এনেছে। আবার কল্যাণীর স্বপ্ন একটি বিশেষ মুহূর্তে আখ্যায়িকার উপযোগী অতীন্দ্রিয় আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। 'আনন্দমঠে'র প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লিখেছিলেন, ''বাঙালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়।'' কল্যাণী ও শান্তি তার প্রমাণ। উভয়েই পতিপ্রাণা হলেও দুটি চরিত্র বিপরীতধর্মী। কল্যাণী ধীর, স্থির, অচঞ্চল, গাম্ভীর্যময়ী; শান্তি রহস্যপ্রিয় এবং বায়ু আন্দোলিত সমুদ্রতরঙ্গের মতো নৃত্যচপল। শান্তি আদর্শময়ী রমণী, কল্যাণী আদর্শ গৃহবধূ।

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসটি পুরাতন বাংলার সমাজ ও পারিবাবিক পটভূমিকায় স্থাপিত একটি মনোরম গার্হস্থ্য কাহিনি হলেও এর অন্তরালে তাত্ত্বিক বঙ্কিমের একপ্রকার সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দুর সামাজিক আচার-আচরণের তত্ত্বকে আমরা লক্ষ করি। প্রফুল্ল নামে একজন সাধারণ কুলবধূকে শ্বশুরের একগুঁয়েমির জন্য স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়েছিল। নানা ঘটনাচক্রে তাকেই হতে হল ভয়ঙ্করী দস্যুনেত্রী দেবীচৌধুরাণী। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গীতাতত্ত্ব এবং হিন্দু নারীর যথার্থ স্থান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছেন—যা উপন্যাসের পক্ষে অনেকটাই অবান্তর। এই উপন্যাসে লেখক প্রফুল্লের মাধ্যমে গৃহাশ্রমে নিষ্কাম সাধনার চরমোৎকর্ষের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এই উপন্যাস অধ্যাত্মবাদের বাহন হলেও তা বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিশেষ চিত্র।

এই উপন্যাসের আখ্যান অংশ নিখুঁত নয়। এমনকি এর ঐতিহাসিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রফুল্ল চরিত্র আদর্শবাদের বাহন হয়ে পড়েছে। এই চরিত্রের রূপায়ণে মাঝে মাঝে শিল্পী বঙ্কিমের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদী বঙ্কিমের বিরোধ লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসে লেখক দু-শ্রেণির চরিত্র চিত্রিত করেছেন। ফুলমণি, দুর্লভচন্দ্র, ব্রহ্মঠাকুরাণী, সাগর, নয়ান বৌ, হরবল্লভ, ব্রজেশ্বর প্রমুখ বাস্তব চরিত্র। কিন্তু ভবানী পাঠক, নিশি ও দেবীচৌধুরাণীর চরিত্র আদর্শবাদের বাহন হওয়ায় ততটা জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাসের শ্রেণিতে রয়েছে—'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'রজনী'। বঙ্গদর্শন পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—''বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাঙ্‌লাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল, সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ।'' রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন—''এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎ লাভ হইত; বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবন ধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটি নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ

হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী, কমলমণি রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।''

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ বাংলা উপন্যাস এবং প্রথম সামাজিক উপন্যাস। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশকাল থেকেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পুস্তক আকারে মুদ্রিত হয়ে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে বিষবৃক্ষের অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এই উপন্যাস প্রকাশকালেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং এব জনপ্রিয়তা এখনো হারায়নি। দেশে-বিদেশে নানা ভাষায় এই উপন্যাসের অনুবাদও হয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস মূলত সমকালীন সমাজসমস্যার আখ্যান। এই দুই সামাজিক সমস্যা হল—বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে সূর্যমুখী চরিত্রের মাধ্যমে বিধবাবিবাহের কুফলকে তুলে ধরেছেন।

'বিষবৃক্ষ' রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল। 'চোখের বালি' উপন্যাসে এর একাধিকবার উল্লেখ আছে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'বিষবৃক্ষ' সম্বন্ধে বলেছেন— ''বঙ্গদর্শনে' যে জিনিষটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। ....বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।'' (প্রবাসী ১৩৩৮, আশ্বিন, পৃঃ—৮০৬-৮০৭)

আসলে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট সমাজবীক্ষণের-ই ফসল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দুশ্চর তপস্যাবলে জীবন সম্পর্কে যে সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, তারই সার্থক ফলশ্রুতি বিষবৃক্ষ। মানুষের প্রতি ঘরে ঘরে রিপুর প্রাবল্যে তিনি যে বিষবৃক্ষের বীজ, অঙ্কুর, বৃক্ষ ও তার ফল দেখেছেন, তারই সার্থক কাহিনিরূপ 'বিষবৃক্ষ'। আমাদের তৎকালীন সমাজে কত কুন্দকলি ঝরে পড়ত কিম্বা কত সূর্যমুখী সূর্যসনাথ হতেন—তারই আলেখ্য উপলব্ধির সততায় ও প্রকাশের অকুণ্ঠ স্বচ্ছতায় 'বিষবৃক্ষে' রূপায়িত হয়েছে।

ঔপন্যাসিকের সমাজবীক্ষণের এই রূপের পরিচয় রয়েছে—কমলাকান্তের দপ্তরের 'পতঙ্গ' প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উপলব্ধিগত সত্য হল—''রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন; জগতে অতুল কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত

দাহের গীত "Paradise Lost" ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ, "আন্টনি, ক্লিওপেত্রা"। রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত", ঈর্ষা বহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতা পতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রতীতি 'বিষবৃক্ষ' সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কারণ নগেন্দ্র পতঙ্গের রূপজ মোহের পরিণতি বিষবৃক্ষ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ সম্বন্ধে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির গভীরতা-ই বিষবৃক্ষ রচনার মূল সূত্র।

আবার 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। দুটি উপন্যাস বিষয় ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রায় একরকম হলেও দুটি গ্রন্থের পার্থক্যও গুরুতর। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কাহিনি সরল, তাতে কোন উপকাহিনি নেই; বিষবৃক্ষের কাহিনি জটিল, তাতে parallel ও contrast দেখবার উদ্দেশ্যে মূল কাহিনির সঙ্গে একাধিক কাহিনি যুক্ত হয়েছে। কাহিনির রস-পরিণাম উভয় ক্ষেত্রেই tragic হলেও, 'বিষবৃক্ষে' নায়ক-নায়িকাব মিলনে গ্রন্থ শেষ হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইলে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নায়ক-নায়িকার (গোবিন্দলাল রোহিণীর) বিয়ে হয়নি। তাদের সম্পর্ক অবৈধ কামনার সম্পর্ক। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দ নগেন্দ্রের বিয়ে আইনসঙ্গত, সূর্যমুখী নিজে উদ্যোগী হয়ে এই বিবাহ দিয়েছেন। বিষবৃক্ষে 'পরের মঙ্গল মন্দিরে' আত্মবিসর্জনের যে দৃষ্টান্তগুলি পাওয়া যায়, কৃষ্ণকান্তের উইলে তার চিহ্নমাত্র নেই। চরিত্রগুলিতে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও, নগেন্দ্র গোবিন্দলাল নয়। গোবিন্দলাল প্রবৃত্তির হাতের ক্রীড়নক। রূপশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে তিনি তেমন কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হননি। লোকনিন্দা তাঁর প্রচ্ছন্ন রূপপিপাসার বাঁধ ভেঙে দিয়েছে মাত্র। কিন্তু নগেন্দ্র সহজে আত্মসমর্পণ করেনি; তাঁর অধঃপতনে হৃদয় দ্বন্দ্ব আছে, আছে বিচার বিতর্ক। নগেন্দ্র কুন্দের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেছেন ঠিকই কিন্তু গোবিন্দলালের মতো নারীহন্তা নন। রোহিণী এবং কুন্দও সমপ্রকৃতির নয়। রোহিণী অতৃপ্ত বাসনার দাসী, প্রেম নয়—সে কামনার আহুতি; কুন্দ নীরব প্রেমিকা; পরের মঙ্গলমন্দিরে সে নিজের প্রাণ বিসর্জন করেছে। হীরার সঙ্গেও রোহিণীকে তুলনা করা যায় না। কেননা হতভাগিনী হীরার হৃদয়ে ভালবাসা জেগেছিল; রোহিণীতে প্রেম বলে কিছু নেই। সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য সূর্যমুখী এবং ভ্রমরের মধ্যে। সূর্যমুখীর অন্তর কিছুটা 'আমিত্বে' ভরা থাকলেও অনাসক্ত স্বামীর প্রতি তিনি একান্ত কঠিন হতে পারেননি। স্বামীর আনন্দপূর্ণ মুখখানি দেখার জন্য তিনি কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রের বিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর উপেক্ষায় তাঁর অন্তরে যে অভিমান ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তাতে তিনি গৃহত্যাগ করলেও প্রতিমুহূর্তে স্বামীর কথা ভেবেছেন। অন্যদিকে পতিব্রতা ভ্রমরের অভিমানজনিত তেজস্বিতা যেন বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ। স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করলেও অনাসক্ত স্বামীকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। আহত পাতিব্রত্য, অভিমানী স্বাতন্ত্র্য রুদ্ধবেগ স্রোতস্বিনীর মতো পত্রাক্ষরে গর্জন করে উঠেছে ঃ

"যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই। ভ্রমরের এই ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। ভ্রমরের এই ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গরূপ 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর মধ্যে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসটি ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন রচিত "The Last Days of Pompeii" উপন্যাসের কানা ফুলওয়ালী নিদিয়ার চরিত্রের আংশিক প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান্ধ রজনীর চরিত্র অঙ্কন করেন। নানা জটিল ঘটনার মধ্য দিয়ে নায়ক শচীশ এবং অন্ধ রজনীর বিবাহ এবং কোন মহাপুরুষের কৃপায় তার দৃষ্টিশক্তি লাভ—এই হল উপন্যাসের মূল আখ্যান।

'রজনী' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নতুন ধরনের উপন্যাস। এই ধরনের উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন, "এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়।" উপন্যাসটি পড়ে মনে হয়, সমগ্র ঘটনার পরিসমাপ্তির পর শচীন্দ্র, অমরনাথ, লবঙ্গ ও রজনী একযোগে পরস্পরের মধ্যে কাহিনির বিভিন্ন অংশের বর্ণনার ভার বণ্টন করে নিয়েছে। ঘটনার যে অংশে বক্তা বেশি জড়িত, সেই অংশই তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। তাছাড়া এই উপন্যাসে প্রত্যেক চরিত্রে কথার যেমন ভাবগত বৈশিষ্ট্য তেমন ভাষা সম্বন্ধেও নিজস্ব সুর-স্বাতন্ত্র্য সমেত ধরা পড়েছে।

রজনীর দৃষ্টিশক্তি লাভ, সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে শচীন্দ্রের মনোভাব পরিবর্তন প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত উপাদানের পরিবেশনে ত্রুটি লক্ষ করা যায়। ঔপন্যাসিকের চরিত্রচিত্রণে মুন্সিয়ানা রয়েছে। অন্ধ রজনীর সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, নারীর দৈহিক গঠনে প্রকৃতি কার্পণ্য করলেও সে নারী। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে মানবজীবনে সুখ দুঃখের প্রশ্নকে উত্থাপিত করেছেন। উপন্যাসে রজনী ও লবঙ্গের কাহিনি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শচীন্দ্র, অমরনাথ, লবঙ্গলতা চরিত্র বেশ জীবন্ত।

'ইন্দিরা' (১৮৭৩) আকারে ছোট এবং প্রকারে একটা বড় গল্প। দাম্পত্য জীবনের রসসন্ধানী দৃষ্টিই বঙ্কিমচন্দ্রকে আলোচ্য উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু কাহিনির ক্ষুদ্র অবয়বের মধ্যে একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষরও লক্ষ করা যায়। গ্রন্থের নায়িকা ইন্দিরার মুখেই কাহিনি বিবৃত হয়েছে এবং মনে হয়, ইন্দিরার রমণী-হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্যকে বঙ্কিমচন্দ্র যেন অনুভব করে তার শিল্পে গেঁথে তুলেছেন। আঙ্গিক রীতিতেও আলোচ্য ক্ষুদ্র উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনবত্বের গৌরব নিয়ে এসেছিল।

'রাধারাণী'তে (১৮৬৬) জীবন সমস্যার কোন চিত্র নেই, যা আছে সে শুধু সাধারণ সংসারের সহজ সরল একটি প্রেমের কাহিনি। বঙ্কিম-প্রতিভার কোন স্বাক্ষরই উপন্যাসটিতে দেখা যায় না। বাংলাদেশের সামাজিক ভিত্তিতে এর কাহিনি স্থাপিত হলেও উপন্যাসে বঙ্কিম-স্বভাবসুলভ রোমান্সের রং-ই লক্ষ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতিশীল শিল্পীমন ছিল এবং সেই সঙ্গে তিনি সুগভীর জীবনবোধের অধিকারীও ছিলেন। তিনি মানব-মানবীর প্রেমকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন এবং চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের রসপিপাসু হৃদয়গুলোর কাছে অন্তর জগতের শাশ্বত সত্যের বার্তাও শুনিয়েছেন। পুরুষ ও নারীর এই চিরন্তন প্রেমবৃত্তিকে অবলম্বন করেই তিনি সামাজিক সমস্যার অবতারণাও করেছেন। প্রেমের দুর্দম শক্তিকে তিনি যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন তেমনই বৈধব্য জীবনের অপরিতৃপ্ত প্রেম পিপাসাকে বাস্তব রূপ দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। দাম্পত্য প্রেমের আদর্শকে তুলে ধরলেও হৃদয়ধর্মকে তিনি ছোট করেননি। এখানেই তিনি জীবনের সার্থক রূপকার। তাঁর মনে সমাজবৃত্তির গুণে রক্ষণশীলতা থাকলেও তার প্রভাব মাঝে মাঝে উপন্যাসের শিল্পীগুণকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তবুও তিনি মূলত শিল্পী। এবং যথার্থ শিল্পী বলে পুরুষ ও নারীর প্রেমকে পরিপূর্ণ জীবনবোধ দিয়ে উপলব্ধি করে চিরকালের সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলেছেন।

ইংরেজ ও ঔপনিবেশিক শাসনে মধ্যবিত্ত জীবনমানসে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল বঙ্কিমের উপন্যাসে তারই আভাস পাওয়া যায়। তবুও তাঁর অন্তরে যুগজীবনের দ্বিধা ছিল। কারণ তখনো সামন্ততান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজের বিলোপ ঘটেনি অথচ তারই ওপর নারীর মানসমুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হচ্ছে, নারীর ব্যক্তিত্ব পুরুষের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই পটভূমিকায় সমাজের ঐতিহ্যকে রক্ষা করে তাঁকে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বিবাহ-পূর্ব চিত্র অঙ্কন করতে হয়েছে। ব্যক্ত করতে হয়েছে নবনারীর স্বাধীন নির্বাচনের ইচ্ছাকে, আবার সেই সঙ্গে পরিত্যাগ করতে পারেননি হিন্দু সমাজের প্রথাসিদ্ধ দাম্পত্য আদর্শকে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব তার পরিচয়ও রয়েছে তাঁর উপন্যাসে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী যে তার সত্তাকে বিলিয়ে দিতে পারে না, আবার তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সুখীও হতে পারে না—এই দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে।

উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অন্তর্জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনার ধারা দেখে বোঝাই যায় নভেল নিছক গল্প নয়, পাঠকের কৌতূহলের চরিতার্থতায় এই গল্পের রসপরিণতি লাভ ঘটে না বরং এই গল্প মানবজীবনের কোনো কঠিন সমস্যার রূপায়ণ, সমস্যার গভীরে এই ধরনের গল্পের রস নিহিত। তাই সমস্যার উপলব্ধি ছাড়া এই সব গল্পের প্রতীতি সম্ভব নয়।

তিন

চন্দ্রশেখর ঃ উৎস ও প্রকাশ

প্রত্যেকটি শিল্প-সৃষ্টির মূলে থাকে কতকগুলি উপাদান কারণ। এই উপাদান কারণগুলি লেখকের চিত্তে বাষ্পের মতো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, তার পর কোন এক সময় তা শিল্পীর· চিত্তে সমীভূত হয়ে একটি বিশেষ রসমূর্তি লাভ করে। যদিও সাহিত্য 'দৈববাণী' কিম্বা 'কাব্যের রস অলৌকিক' তবুও সব সৃষ্টির পেছনে যেমন কোন না কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ থাকে, সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও উপাদান কারণ থাকে। কর্মযোগী ও নীতিনিষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন সামাজিক জীবনে যে ভ্রষ্টাচার লক্ষ করেছিলেন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজের অধীনে মীরকাশেমের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তাকেই উপন্যাসের আকার দিয়েছেন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে।

'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাবয়ব উপন্যাস। ১২৮০ বঙ্গাব্দেব শ্রাবণ মাস থেকে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় চন্দ্রশেখর উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে (বাংলা ১২৮২) গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল. তা গ্রন্থাকাবে প্রকাশের সময় কিছু কিছু পাববর্তিত ও পরিমার্জিত হয।

'চন্দ্রশেখর' রচনার সময় বঙ্কিম প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্যেব দীপ্তিতে ভাস্বর। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন পাঁইত্রিশ বছর। তখন বঙ্কিম প্রতিভার স্বর্ণযুগ। কেননা এসময়েই বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রিকার প্রকাশ এবং এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৪), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরে। তাঁকে কেন্দ্র করে বহু সাহিত্যিকের সরব আনাগোনা। সেজন্য রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, ''বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্নত ধ্বনি'........বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।''

এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের জন্য, জনসাধারণের জন্য ও সাহিত্যনীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজের হৃদয়ে যে প্রেরণা অনুভব করেছিলেন, তা তার সাহিত্যের মধ্যে রূপ পেল। তিনি চেয়েছিলেন দেশের মানুষের উন্নতি, মঙ্গল ও মনোরঞ্জন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এ দেশের কর্মযোগ জ্ঞান নিরপেক্ষ নয়। তাই তাঁর সাহিত্যসাধনায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সমন্বয়ের সূত্রে বিধৃত। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালিকে মনুষ্যত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে, পরহিতব্রতে দীক্ষিত করতে এবং আদর্শ প্রেমের স্বরূপকে তুলে ধরতে। এগুলি তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে কথারূপ পেয়েছে।

চার

চন্দ্রশেখর ঃ কাহিনি সংক্ষেপ

উপক্রমণিকা ঃ (এই অংশে তিনটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে কাহিনির ভিত্তি স্থাপন)

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'বালক-বালিকা'

ভাগীরথী তীরে এক রমণীয় সন্ধ্যায় এক গ্রামের এক কিশোর প্রতাপ ও এক বালিকা শৈবলিনী খেলাচ্ছলে বনের ফুল তুলে মালা গেঁথে প্রতাপের গলায় পরালো। সন্ধ্যার আকাশে দুজনের তারা গণনার খেলায় মত্ত হওয়া তারপর নৌকা গণনার মাধ্যমে এই পরিচ্ছেদের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে'

প্রতাপ ও শৈবলিনীর ভালবাসা ব্যর্থ হয়। কারণ শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য 'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে'। শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা, মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। দুজনে একদিন পরামর্শ করল যেহেতু তাদের বিবাহ সম্ভব নয়, তাই তারা সাঁতার দিতে আরম্ভ করল। সাঁতার দিতে দিতে, অনেক দূরে গিয়ে প্রতাপ বলল, ''শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে''। এই বলে শৈবলিনীকে আহ্বান জানিয়ে প্রতাপ গঙ্গায় ডুবল। কিন্তু প্রতাপ তার কে একথা ভেবে শৈবলিনী মরতে ভয় পেয়ে সাঁতরে কূলে ফিরে এল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'বর মিলিল'

প্রতাপ যখন গঙ্গায় ডুব দিল তখন সেই সময় চন্দ্রশেখর নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ নৌকায় করে সেইদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিমজ্জিত প্রতাপকে উদ্ধার করে তাকে তার বাড়িতে পৌছে দিলেন। চন্দ্রশেখর সে সময় শৈবলিনীকে দেখে মুগ্ধ হন এবং নিজেই ঘটকালি করে শৈবলিনীকে বিয়ে করে বেদগ্রামে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। বিয়ের আট বছর পর মূল ঘটনার সূত্রপাত।

প্রথম খণ্ড ঃ ''পাপীয়সী''

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'দলনী বেগম'

সে সময় মীরকাসেম খাঁ বাঙ্‌লার নবাব। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর তখন বিবাদ চলছিল। এই পরিচ্ছেদের সূচনা নবাবের দুর্গের ভেতরের একটি দৃশ্য দিয়ে। নবাবের বেগম দলনী তখন নবাবের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান। সেই অবসরে নবাব বেগমের সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলেন। নবাব বেগমকে গান গাইতে বললেন। কিন্তু দলনী গাইতে পারল না। এরপর দুজনের মধ্যে নানা কথাবার্তা হতে থাকল। সেই প্রসঙ্গে এল ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের বিরোধ বাধার সম্ভাবনার কথা। স্বামীর বিপদ আশঙ্কায় নবাবকে বিবাদে প্রতিহত

করার জন্য দলনীর ইচ্ছা প্রকাশ। নবাব স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাজনীতি সংক্রান্ত কোন আলোচনায় সম্মত হলেন না। তাতে দলনী রেগে গিয়ে নবাবকে জানালেন, যুদ্ধ শুরু হলে তিনি যেন বেগমকে সঙ্গিনী হিসেবে সঙ্গে রাখেন। এরপর যুদ্ধকালে বেগমের অবস্থান সম্পর্কে নবাবকে গণনা করতে বললেন এবং সেইসূত্রে নবাব তাঁর কৌতূহল দূর করাব জন্য বেদগ্রামের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরকে ডেকে পাঠালেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'ভীমা পুষ্করিণী'

বেদগ্রামে এই দৃশ্যের অবতারণা। বিয়ের পর আট বছর ধরে শৈবলিনী স্বামীগৃহে বাস করলেও প্রতাপের আকর্ষণ অটুট থেকেছে। একদিন সখী সুন্দরীর সঙ্গে ভীমা পুষ্করিণীতে শৈবলিনী স্নান করতে গেলে শৈবলিনী লক্ষ করলেন একটি তালগাছের আড়াল থেকে একজন ইংরেজ (লরেন্স ফষ্টর) তার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। ফষ্টর কাছে এসে শৈবলিনীকে পেতে চাইল কিন্তু শৈবলিনীর দ্বারা তিরস্কৃত হল। শৈবলিনী ভয়ে ভয়ে বাড়িতে ফিরে এলেও স্বামী কর্তৃক তিরস্কৃত হলেন না, কারণ তিনি তখন শাস্ত্রপাঠে নিমগ্ন ছিলেন। গভীর রাতে যখন পাঠ শেষ করে নিজ কক্ষে এলেন তখন শয্যায় শায়িত শৈবলিনীকে দেখে চন্দ্রশেখর উপলব্ধি করলেন, "তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে।" শুধু তাই নয়, চন্দ্রশেখর এর পর আক্ষেপ করলেন "এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত--- শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন?" একথা চিন্তা করতে করতে চন্দ্রশেখর সে রাতে খেতে ভুলে গেলেন। সকালেই নবাবের কাছ থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'লরেন্স ফষ্টর'

বেদগ্রামের কাছেই পুরন্দরপুর গ্রামে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি রেশমের কুটির ছিল। সেই কুটির কুঠিয়াল ছিলেন লরেন্স ফষ্টর। তিনি শৈবলিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ও তাকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন। সেজন্য চন্দ্রশেখর যেদিন নবাবের কাছে চলে গেলেন, সেদিন ফষ্টর ডাকাত দিয়ে বাড়ি লুঠ করে শৈবলিনীকে ধরে আনে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 'নাপিতানী'

শৈবলিনীকে অপহরণ করে যে শিবিকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল লরেন্স ফষ্টর সেই শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত এলেন। সেখানে সে শৈবলিনীকে একটা বড় নৌকায় তুলে দিয়ে মুঙ্গেরের পথে পাঠিয়ে দিয়ে এবং নিজে বিশেষ কাজ সেরে আসার জন্য কলকাতা যাত্রা করল। শৈবলিনীর যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য নৌকায় হিন্দু দাসদাসী এবং প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বায়ুর প্রতিকূলতার জন্য নৌকা বেশি দূর যেতে পারেনি। এদিকে শৈবলিনীকে উদ্ধারের জন্য তার সখী সুন্দরী নাপিতানী সেজে নৌকায় উপস্থিত হল। শৈবলিনীর পায়ে আলতা পরাবার জন্যই নাপিতানীকে নৌকার

মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সুন্দরীর চেষ্টা ব্যর্থ হল। শৈবলিনী বাড়ি যেতে রাজি হলেন না। ফলে সুন্দরী তাকে অভিসম্পাত দিয়ে ফিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন

এদিকে চন্দ্রশেখর দলনী বেগমের ভাগ্যে যে অশুভ ফল রয়েছে তা গণনা করে, নবাবের কাছে তা না বলে বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরে শৈবলিনীর বৃত্তান্ত শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর আর সংসারের আকর্ষণ রইল না। 'শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি'তে 'অগ্নিপ্রদান' করলেন এবং একবস্ত্রে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ 'পাপ'

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'কুল্‌সম্‌'

নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের সম্ভাবনায় দলনী যথেষ্ট চিন্তিত। ইংরেজদের অস্ত্রবোঝাই নৌকা আটক করায় যুদ্ধের আশঙ্কা থেকেই গেছে এই ভেবে সেনাপতি গুরগণ খাঁর কাছে পরিচারিকা কুল্‌সম্‌-এর মারফৎ একটি পত্র প্রেরণ করেন দলনী। লেখক এই পত্রকে সূত্র করে বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'গুরগণ খাঁ'

দলনীর চিঠি পেয়ে গুরগণ খাঁ মাঝরাতে তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। গুরগণের উদ্দেশ্য ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। তার সুশিক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্যদের মাধ্যমে ইংরেজদের পরাজিত করতে পারলে সে অনায়াসে বর্তমান নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই তার স্থান অধিকার করতে পারবে। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট থাকলেও তাকে নবাবের প্রধান সেনাপতি হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। গুরগণের আর এক পরিচয় হল তিনি দলনীর ভাই। কিন্তু উচ্চাকাঙ্খার জন্য গুরগণ নবাব ও তার বোনের সুখশান্তি ও সম্মান বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এদিকে দলনীর আগমনের পর গুরগণ খাঁ উপলব্ধি করলেন, তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান বাধা হল দলনী। তাই গুরগণ দলনী ও কুলসমকে দুর্গমধ্যে ঢোকার পথ বন্ধ করে দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'দলনীর কি হইল?'

দলনী ও কুল্‌সম্‌ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে না পেরে রাজপথে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এই সময়ে অন্ধকার রাজপথে দুটি অসহায় নারীকে দেখতে পেয়ে একজন দীর্ঘকায় পুরুষ তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। এই দীর্ঘকায় পুরুষ হলেন ব্রহ্মচারীবেশী চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর তাঁদের দুজনকে গ্রামের মধ্যে অবস্থিত প্রতাপ রায়ের বাড়িতে নিয়ে এলেন। দলনীর কাছে চন্দ্রশেখর সব বৃত্তান্ত শুনে নবাবকে জানাতে বললেন। সেই অনুযায়ী চন্দ্রশেখর দলনীর লেখা চিঠি মুন্সীর মাধ্যমে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ও চিঠির উত্তর আসা না পর্যন্ত তাঁদের আটকে রাখলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 'প্রতাপ'

শৈবলিনীকে ফস্টরের বজরা থেকে সুন্দরী উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে এ বিষয়ে প্রতাপের শরণাপন্ন হলেন। সুন্দরীর বোন ও রূপসীর স্বামী প্রতাপ এখন চন্দ্রশেখরের সাহায্যে নবাবের কাছারিতে উচ্চপদে আসীন। চন্দ্রশেখরের গৃহত্যাগ ও শৈবলিনীর সংবাদ শুনে প্রতাপ বিস্মিত, ক্রুদ্ধ হলেন। সেজন্য প্রতাপ নিরুদ্দিষ্টদের খোঁজে মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ 'গঙ্গাতীরে'

এদিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেজন্য একটি অস্ত্রবোঝাই নৌকা পাট্‌নার অধ্যক্ষ ইলিস্‌-এর কাছে পাঠানো হবে। এই কাজে লরেন্স ফস্টর নিযুক্ত হলেন। ফস্টরের সেই অস্ত্রবোঝাই নৌকা তাড়াতাড়ি শৈবলিনীর বজরা ধরে ফেলল। এর পর দুটি নৌকাই যখন মুঙ্গেরে উপস্থিত হল তখন সেনাপতি গুরগণ খাঁ অস্ত্রবোঝাই নৌকাটিকে আটক করে রাখলেন। আমিয়ট নবাবের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল পেলেন না। এদিকে গভীর রাতে আর এক কাণ্ড ঘটল। ইংরেজের দুটি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটেই বাঁধা ছিল। ঘাটের কাছেই নদীতীরে ছিল দুর্ভেদ্য কসাড় বন। ফস্টরের নৌকায় প্রহরীরা ঘুমে ঢুলছিল। সেই সময় হঠাৎ সেই বনের মধ্যে থেকে নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে প্রহরীর প্রাণ গেল। প্রতাপ সে সময় বজরায় লুকিয়ে পড়ল। ফস্টর কসাড় বনে গুলি ছুঁড়তে গিয়ে নিজে গুলিবিদ্ধ হয়ে জলে পড়ে গেল। অন্যদিকে প্রতাপ বজরার ছাদে উঠে দড়ি কেটে দিল। বজরাটি ভাসতে ভাসতে নদীতীর থেকে গভীর জলে চলে গেল। নৌকার দাঁড়ি মাঝিরা প্রতাপ রায়ের নাম শুনে আর কোন প্রতিবাদ করল না। রামচরণ প্রতাপকে বিপদমুক্ত দেখে বন থেকে বেরিয়ে এল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ 'বজ্রাঘাত'

প্রতাপের ভৃত্য রামচরণ যেখানে একটি শিবিকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল সেখানে পূর্বের বজরাটি উপস্থিত হল। শৈবলিনী বজরা থেকে নেমে শিবিকায় উঠল। এরপর রামচরণ শিবিকাযোগে শৈবলিনীকে নিয়ে প্রতাপের মুঙ্গেরের বাসায় উপস্থিত হল, যা প্রতাপের নির্দেশের পরিপন্থী ছিল। গভীর রাতে প্রতাপ তার ঘরে ঢুকে দেখল তার শয্যায় শৈবলিনী শায়িতা। প্রতাপকে দেখে শৈবলিনী আনন্দে ও ভাবাবেগে মূর্ছিত হলেন। প্রতাপ বহু চেষ্টায় শৈবলিনীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল। এরপর শৈবলিনী প্রতাপকে জানাল, তাকে পাওয়ার আশাতেই সে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছে। কিন্তু শৈবলিনীর এই উক্তিতে প্রতাপের হৃদয় বিচলিত হল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ 'গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্‌'

প্রতাপের পলায়নের পর তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। সিপাই বকাউল্লা শৈবলিনীর শিবিকা অনুসরণ করে প্রতাপের বাড়ি দেখে গিয়েছিল

এবং সেই সংবাদ সে আমিয়টকে দিয়েছিল। আমিয়ট জন্সন্ ও গল্ষ্টন্ নামে দুই কর্মচারীকে বকাউল্লার সঙ্গে প্রতাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। তারা দরজা ভেঙে প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করে প্রতাপ ও রামচরণকে বন্দী করল এবং দলনীকে ফষ্টরের বিবি ভেবে তাকে ও কুল্সম্‌কে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শৈবলিনী সেই গৃহে একা পড়ে রইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ 'পাপের বিচিত্র গতি'

প্রতাপের ঘর থেকে সবাই চলে গেলে, শৈবলিনী একা চিন্তায় মগ্ন থেকে ভাবতে লাগলেন প্রতাপের কাছ থেকে যখন প্রত্যাখ্যাত হলেন তখন জীবন রেখেই বা লাভ কি? তবু বন্দী প্রতাপের কি হয় তা জেনে তার পক্ষে মৃত্যুবরণ করা দুঃসাধ্য। প্রতাপের কাছে লাঞ্ছনা ও তিরস্কার লাভ করে যখন তার হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত, তখন তার মনে হল বেদগ্রামের স্মৃতি। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হল। কিন্তু কলঙ্কের কথা ভেবে আত্মগ্লানিতে ছুরি বেব করে নিজের বুকে বিদ্ধ করতে উদ্যত হল। কিন্তু পারল না। মরাব আগে তার মনে হল সে তার কথাগুলি সুন্দরীকে বলে যেতে চায়। স্বামীর কথাও মনে হল। কিন্তু তিনি কি এই পাপিষ্ঠের কথা বিশ্বাস কববেন? এ প্রশ্ন চিন্তা করতে করতে শৈবলিনী ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতে নানা দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন। সকালে ঘুম ভাঙলে সামনে চন্দ্রশেখরকে দেখে তিনি ভীত ও স্তম্ভিত হলেন।

তৃতীয় খণ্ড ঃ 'পুণ্যের স্পর্শ'

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'রমানন্দ স্বামী'

চন্দ্রশেখরের গুরু রমানন্দ স্বামী শিষ্যকে কিছু মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। শৈবলিনীর চলে যাওয়ার পর চন্দ্রশেখরের জীবনে যে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল তা বিশেষ ভাবাদর্শে পূর্ণ করে তোলার জন্য গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশের মূল তাৎপর্য হল পরোপকারের মাধ্যমে জীবনের যথার্থ সুখ সম্ভব। সেজন্য চন্দ্রশেখর গুরুব উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'নূতন পরিচয়'

এদিকে দলনীর পত্রপাঠ করে নবাব তাকে আনার জন্য প্রতাপের বাড়িতে শিবিকা প্রেরণ করলেন। কিন্তু দলনী আগের রাতেই ইংরেজদের দ্বারা বন্দী হয়েছিলেন। তাই প্রতাপের ঘরে অবস্থিত শৈবলিনীকে দলনী ভেবে তাকে রক্ষীরা নবাবের কাছে উপস্থিত করল। শৈবলিনী তখন নবাবের কাছে দলনী, কুল্সম্, প্রতাপ ও রামচরণ কিভাবে ইরেজের হাতে বন্দী হয়েছিল তার বিবরণ দিলেন। এরপর শৈবলিনী নিজেকে প্রতাপের স্ত্রী রূপসী বলে পরিচয় দিয়ে তাঁকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। নবাব সেই সময় গুরগণ খাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'নূতন শখ'

নবাব গুরগণ খাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলেন আমিয়ট বন্দী প্রতাপ, দলনী প্রভৃতিকে নিয়ে নৌকাযোগে কলকাতা যাত্রা করেছে। নবাব উপলব্ধি করলেন গুরগণ খাঁ বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছেন। যেহেতু নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে গুরগণের সাহায্য দরকার তাই নবাব কিছু বললেন না। নবাব তখন মুর্শিদাবাদে তকি খাঁকে আদেশ পাঠালেন. ইংরেজের নৌকা যেন আটক করা হয় এবং বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে শৈবলিনী নিজেই প্রতাপের উদ্ধারের জন্য নবাবকে নৌকা, কয়েকজন রক্ষক ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র প্রার্থনা করলেন এবং নবাব তা দেওয়ায় তিনি সে বিষয়ে অগ্রসর হলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 'কাঁদে'

গঙ্গায় একটি বজরা বাঁধা ছিল। বজরার ভিতরে কয়েকজন ইংরেজ বসে খেলছিল। সে সময়ে হঠাৎ বাইরে নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল। তা শুনে আমিয়ট খেলা ছেড়ে বাইরে ছুটে এলেন। স্ত্রীলোককে কাঁদতে দেখে নৌকার কাছে এলেন। এই স্ত্রীলোকটি শৈবলিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ 'হাসে'

বজরার ভিতরে এসে আমিয়ট গলস্টনকে স্ত্রীলোকের কান্নার কথা বিবৃত করলেন। স্ত্রীলোককে প্রশ্ন করে কোন উত্তর না পেয়ে সকলেই তাকে পাগলিনী বলে ধরে নি... ক্ষুধার্ত ভেবে তাকে খানসামার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। খানসামা মুসলমান বলে অন্নগ্রহ... আপত্তি জানালে খানসামারা তাকে ব্রাহ্মণ বন্দী প্রতাপ রায়ের কাছে নিয়ে গেল। প্রতাপের আহার্য প্রস্তুতের জন্য হাতকড়া খুলে নেওয়া হল। সেই সময় প্রতাপের কানে কানে তাকে পালিয়ে যেতে বলল। সামনেই ছোট নৌকা বাঁধা ছিল। শৈবলিনী পাগলামির ভান করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপও তার উদ্ধারের চেষ্টাতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে নৌকার মধ্যে সোরগোল উঠল। শৈবলিনীর জলে ঝাঁপ দেবার সময় লরেন্স ফষ্টর তাকে দেখতে পেয়েছিল। তাই প্রতাপ চিৎকার করে জানাল সে শৈবলিনীকে উদ্ধার করে আনবে। একথা শুনে সকলে নিরস্ত হল। সেই সুযোগে প্রতাপ ও শৈবলিনী গঙ্গার প্রবল স্রোতে গা ভাসিয়ে বহু দূরে চলে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ 'অগাধ জলে সাঁতার'

প্রতাপ ও শৈবলিনী দুজনে গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিয়ে চলেছে, প্রতাপ পুরোনো দিনে শৈবলিনীকে যেভাবে ডাকত ঠিক তেমনি সোহাগ ভরা কণ্ঠে ডাকল—'শৈবলিনী-শৈ'। বহুদিন পরে সেই আদরের ডাক শুনতে পেয়ে শৈবলিনীর দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। চন্দ্রালোকিত গঙ্গার বুকে কতদিন পরে তাদের আবার একসঙ্গে সাঁতার দেবার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু এ সুখ ক্ষণিকের। কেননা প্রতাপ তাঁর হৃদয়ের সংযম হারায়নি। সে

শৈবলিনীকে তার হাত ছুঁয়ে শপথ করতে বলল—সে প্রতাপের চিন্তা আর কখনো মনে আনবে না এবং নিজের সব সুখ বিসর্জন দেবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ 'রামচরণের মুক্তি'

যে রাতে প্রতাপ বজরা থেকে পালিয়ে গেল সে রাতে তার চাকর রামচরণ সবার অলক্ষে বজরা থেকে অবতরণ করে পালিয়ে গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ 'পর্বতোপরি'

প্রতাপ ও শৈবলিনীর ছিপটি যখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে তখন নদীতীরবর্তী একটি নির্জন জায়গায় ছিপ ছেড়ে দিয়ে নেমে গেল। উদ্দেশ্য ছিল প্রতাপকে না জানিয়ে নিখোঁজ হওয়া, যাতে প্রতাপ তার খোঁজ করতে না পারে। সামনের পাহাড়ে সারাদিন অনাহারে লুকিয়ে থেকে শৈবলিনী রাতে পুনরায় পর্বতের উপরে উঠতে প্রবৃত্ত হল। যেহেতু সে প্রায়শ্চিত্ত করতে উদ্যত তাই তার কাছে কোন ক্লেশই ক্লেশ বলে মনে হল না। সেইসময় প্রবল বেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। চারদিক সূচীভেদ্য অন্ধকারে এমনভাবে ছেয়ে গেল যে, কিছুই আর দেখা গেল না। শৈবলিনী একটি প্রস্তরখণ্ডের উপরে বসে কাঁপতে লাগল। হঠাৎ শৈবলিনী সেই ঘন অন্ধকারে উপলব্ধি করল কে যেন তার গায়ে স্পর্শ করল এবং সে যেন তাকে দুহাতে তুলে নিয়ে পর্বতে উঠতে লাগল। কে তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে তা শৈবলিনী উপলব্ধি করতে পারল না। তখন পর্বতারোহণ জনিত শ্রান্তিতে, ঝড় জলে সে এমন অবসন্ন হয়ে পড়েছে যে প্রতিরোধ করবার সামান্য শক্তিটুকুও তার ছিল না। তবে বহনকারী যে লরেন্স ফস্টর নয় তা সে বুঝতে পারল।

চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'প্রতাপ কি করিলেন'

প্রতাপ একাধারে জমিদার ও দস্যু। তাই প্রতাপের প্রতাপ ছিল যথেষ্ট। এদিকে শৈবলিনীকে ছিপে দেখতে না পেয়ে প্রতাপ চিন্তিত হয়ে ঠিক করলেন সে বোধহয় জলে ডুবে মরেছে। এই মৃত্যুর জন্য সে লরেন্স ফস্টরকেই দায়ী করল। তাই রাগটা ক্রমে ফস্টর থেকে সমগ্র ইংরেজ জাতির উপর গিয়ে পড়ল। এজন্য প্রতাপ সিদ্ধান্ত নিল ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে সে নবাবকে সাহায্য করবে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে প্রতাপের যুক্তি ছিল—(এক) ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্বনাশ করেছে। (দুই) শৈবলিনীকে মেরে ফেলেছে। (তিন) ইংরেজরা তাকে কয়েদ রেখেছিল। (চার) ইংরেজ এরূপ অনিষ্ট আরও লোকের করেছে অথবা করতে পারে। (পাঁচ) নবাবের উপকার করতে পারলে প্রতাপ হয়তো দু-একটি বড় বড় পরগণা পেতে পারে।

এই সংকল্প অনুযায়ী প্রতাপ নবাবের সঙ্গে দেখা করে স্বদেশে ফিরে এল। শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনে রূপসী ও সুন্দরী দুঃখিত হল। এরপর চারদিকে রটনা হয়ে গেল যে,

"মুঙ্গের থেকে কাটোয়া পর্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছে।" একথা শুনে গুরগণ খাঁ চিন্তান্বিত হলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'শৈবলিনী কি করিল'

এদিকে অন্ধকারময় পর্বতগুহায় বসে শৈবলিনী জীবন্ত নরকভোগ করছে। এখন তার অর্ধচেতন অবস্থা। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে কি তার মুক্তির উপায় নেই? হঠাৎ গুহামধ্যে দৈববাণীর মত কে যেন বলে উঠল "আজ থেকে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।" এরপর সেই কণ্ঠস্বর শৈবলিনীকে কঠোর ব্রত পালনের বিধানগুলি শুনিয়ে দিল। শৈবলিনী সকাতরে জানতে চাইল চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তার দেখা হবে কেন। এই প্রশ্নের উত্তরে সেই কণ্ঠস্বর জানিয়ে দিল সাতদিন ফলমূল খেয়ে শৈবলিনী যদি দিনরাত স্বামীর চিন্তা করতে পাবে তবে স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'বাতাস উঠিল'

শৈবলিনী তখন অনন্যমনা হয়ে স্বামীর ধ্যান করতে লাগল। যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল চিত্তবৃত্তিগুলি কোন এক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করা। সেভাবে অনুশীলন করে শৈবলিনীব মনও ক্রমে স্থির হয়ে এল, যে কয়েকবার বিভীষিকা দর্শন করে অচৈতন্য হল। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে শৈবলিনী দেখল তার সামনে চন্দ্রশেখর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 'নৌকা ডুবিল'

শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর দেখে বুঝতে পারলেন তার মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। বিকারগ্রস্ত শৈবলিনীর মধ্যে মৃত্যুভয় ও নরকভয় জনিত শিহরণ দেখা দিল। তার কথা থেকেই চন্দ্রশেখর তাকে গুহার বাইরে একটি ঝরণার ধারে নিয়ে এলেন এবং তার পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু শৈবলিনীর উন্মত্ততা প্রশমিত না হয়ে বরং বেড়ে যেতে লাগল। চন্দ্রশেখর তার অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত তিনি চলে যেতে চাইলে উন্মাদিনী তার সঙ্গে যেতে চাইলেন এবং চন্দ্রশেখর তাতে আপত্তি করলেন না।

পঞ্চম খণ্ড ঃ 'প্রচ্ছাদন'

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'আমিয়ট-এর পরিণাম'

মহম্মদ তকি খাঁ-র উপর নবাবের আদেশ ছিল ইংরেজদের নৌকাগুলি মুর্শিদাবাদ পৌঁছলে সেগুলি আটক করতে হবে। নৌকাগুলি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হলে তকি খাঁ আমিয়ট-এর সঙ্গে দেখা করে তাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ইতিমধ্যে তকি খাঁ গোপনে পাহারা বসালেন যাতে নৌকাগুলি পালিয়ে যেতে না পারে। আমিয়ট তকি খাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করাই স্থির করলেন। কারণ যাদের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। দলনী ও কুল্‌সম্‌ নৌকায় বসে যে আলোচনা করছে তাতে তাদের

মনের গতির বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। দলনী নবাবের কাছে ফিরে যেতে উন্মুখ। কিন্তু কুল্‌সম্ শাস্তির ভয়ে নবাবের কাছে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক।

এদিকে নৌকাতে অসুস্থ ফষ্টর, দলনী ও কুল্‌সমকে তুলে দিয়ে আমিয়ট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। এই সংবাদ পেয়ে তকি খাঁ আমিয়টকে নৌকা ছেড়ে উঠে আসতে বললেন। কিন্তু আমিয়ট সেই আদেশ পালন করলেন না। এরপর যুদ্ধ শুরু হল এবং দু পক্ষে গোলা-গুলি চলতে থাকল। যুদ্ধে আমিয়ট, জন্‌সন্ ও গল্‌ষ্টন বীরের মতো মৃত্যুবরণ করলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'আবার সেই'

গোলা-গুলিতে ফষ্টর প্রাণে বাঁচলেও সে তখনও অসুস্থ ছিল। দলনী ও কুল্‌সম্-এব সঙ্গে সে যে নৌকাটিতে পালিয়ে যাচ্ছিল সেই নৌকাটিব পেছনে আরেকটি নৌকা দেখতে পেয়ে সে ভয় পেয়ে গেল। ফষ্টর ভাবল নৌকায় এ দুটি স্ত্রীলোকের জন্য হয়ত অন্য নৌকা পিছু নিয়েছে। তাই ফষ্টব দলনীকে নদীতীবে নামিযে দিল। কুল্‌সম্ নবাবের ভয়ে নৌকা থেকে নামল না। পেছনের নৌকাটিও দলনীকে ফেলে বেখে চলে গেল, তাকে তুলে নিল না। চারদিকে ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে নির্জন নদীতীরে দলনী একা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কোন এক দীর্ঘকায় পুরুষ তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'নৃত্য গীত'

স্বরূপচাঁদ জগৎশেঠ ও মহ্‌তাব চন্দ জগৎশেঠ নামে দুই ধনী ভাই প্রসাদতুল্য প্রাসাদে মুঙ্গেরে বসবাস করত। মীরকাসেমের রাজত্বে তাঁবা সুখে নেই, কারণ তাঁবা নজব বন্দী হয়ে বাস করছেন। নবাবের উচ্ছেদ সাধনই তাদেব উদ্দেশ্য। গুবগণ খাঁও তো তাই কামনা করেন। গুরগণ জানেন তাঁর সৈন্যবল আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। কারণ অর্থবলেরও প্রয়োজন আছে। সেজন্য শেঠ ভ্রাতাদের সাহায্য প্রয়োজন। এই চক্রান্তকে সফল করার জন্য শেঠদের নাচগানের এক মজলিসে গুরগণ খাঁ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। এই সুযোগে প্রতাপ রায়ের প্রসঙ্গ এল, কারণ প্রতাপ রায নবাবের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য বহু লাঠিয়াল সংগ্রহ করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 'দলনী কি করিল?'

নবাব তকি খাঁকে বলেছিলেন দলনীকে মুঙ্গেরে পাঠাতে। কিন্তু দলনীকে যখন ইংরেজের নৌকায় পাওয়া গেল না, তখন দলনী সম্বন্ধে একটি মিথ্যা চিঠি লিখে নবাবের কাছে পাঠালেন। চিঠিতে তিনি জানালেন, দলনী আর নবাবের প্রতি অনুরক্ত নয়, সে এখন মামিয়টের উপপত্নী এবং এক শয্যায় শয়ন করে। সেজন্য দলনী মু রে যেতে অনিচ্ছুক। অন্যদিকে প্রকৃত ঘটনা হল মুঙ্গেরে নবাবের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য দলনী উৎকণ্ঠিতা। সেজন্য সেই মহাকায় পুরুষ তাকে মুর্শিদাবাদে তকি খাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ 'সিদ্ধি'

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'পূর্বকথা'

শৈবলিনী প্রতাপকে ছেড়ে ছিপ থেকে যখন পালিয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই রমানন্দ স্বামী অলক্ষে থেকে তাকে অনুসরণ করছিলেন। অন্ধকারময় ঝটিকা বিক্ষুব্ধ রাতে পর্বতের উপরে, শৈবলিনীর জীবন যে বিপন্ন হতে পারে তা মনে করেই রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে শৈবলিনীকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত করেন। শৈবলিনীর যখন মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিল তখন রমানন্দ স্বামীই তাকে নিয়ে বেদগ্রামে যাওয়ার জন্য চন্দ্রশেখরকে আদেশ করেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'হুকুম'

নবাব তকি খাঁর মিথ্যা চিঠিকেও সত্য বলে ভাবলেন, কারণ ভাগ্য বিপর্যয়ে তাঁর বুদ্ধিবিভ্রম ঘটেছিল। তাই তিনি রেগে গিয়ে আদেশ দিলেন দলনীকে যেন বিষ খাইয়ে হত্যা করার ব্যবস্থা করা হয়। দলনীকে নবাবের সেই নির্দেশনামা দেখালে তিনিও আত্মবিসর্জনে সম্মত হলেন ও নিজের হাতে বিষগ্রহণ করে জীবন জ্বালার অবসান ঘটালেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'সম্রাট ও রবার্ট'

নবাব মীরকাসেম তখন উদয়নালাব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কারণ তিনি ইতিমধ্যে কাটোয়া ও গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। এই সময়ে হঠাৎ একদিন কুল্‌সম্‌ এসে তাঁর শিবিরে উপস্থিত হল। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করে সে নবাবের কাছে আসার অনুমতি লাভ করেছে। কুল্‌সম্‌ দলনীর শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শুনে নবাবকে মূর্খ ও হতভাগ্য বলে তিরস্কার করতে লাগল। কুল্‌সম্‌ নবাবের কাছে দলনীর সব বৃত্তান্ত অবগত করাল এবং গুরগণ যে দলনীর ভাই তাও জানিয়ে দিল। নবাব তকি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথাও উপলব্ধি করলেন। তাই তকি খাঁ, ফষ্টার, গুরগণ খাঁ, ব্রহ্মচারী ও শৈবলিনীকে তাঁর কাছে উপস্থিত করাতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর আদেশ পালনের জন্য চারদিকে লোক পাঠানো হল। নবাব দলনীর জন্য অনুশোচনায় মগ্ন হলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 'জন স্ট্যালকার্ট'

ফষ্টর পদচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হল। বিতাড়িত হয়ে সে স্ট্যালকার্ট নাম নিয়ে বিপক্ষ দলে যোগ দেবার জন্য মীরকাসেম-এর সেনাধ্যক্ষ সমরুর কাছে উপস্থিত হল। কিন্তু কুল্‌সম্‌ তাকে চিনে ফেলায় তাকে নবাবের কাছে ধরে আনা হল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ 'আবার বেদগ্রামে'

রমানন্দ স্বামীর আদেশ অনুযায়ী চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বেদগ্রামে নিয়ে এলেন। শৈবলিনীর মস্তিষ্ক বিকৃতি তখনো দূর হয়নি। কারণ সে সুন্দরীকে দেখে চিনতেই পারল

না। তার কথাবার্তা অসংলগ্ন হলেও একেবারে অর্থহীন নয়। প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দেখা করে গেল। গুরুর উপদেশ অনুযায়ী চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর উপর ঔষধ প্রয়োগ করলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ 'যোগবল না Psychic Force ?'

শৈবলিনীর এরূপ অবস্থার জন্য গুরুর নির্দেশে চন্দ্রশেখর তার উপর ঔষধ (কমণ্ডলুর জল) প্রয়োগ করলেন। একটু একটু করে কমণ্ডলুর জল শৈবলিনীর মুখে দিতে দিতেই সে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ল। তার সেই অভিভূত অবস্থায় চন্দ্রশেখর তাকে যেসব প্রশ্ন করলেন সে তার সবগুলিরই সঠিক উত্তর দিল। সেই উত্তরেব প্রেক্ষিতে চন্দ্রশেখর উপলব্ধি করতে পারলেন যে শৈবলিনী দৈহিক দিক থেকে পরিশুদ্ধা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ 'দরবারে'

নবাবের আদেশে তাঁর সম্মুখে ফষ্টর, তকি খাঁ, শৈবলিনী, কুল্‌সম ও চন্দ্রশেখর উপস্থিত হয়েছেন। ফষ্টর-এর কথায় দলনী যে সম্পূর্ণ নির্দোষ নবাব তা বুঝতে পারলেন। শৈবলিনীও যে নির্দোষ তাও ফষ্টর স্বীকার করল। এই সময়ে ইংরেজদের গোলা এসে নবাব শিবিরে পড়তে লাগল। চারদিকে ব্যস্ততা ও রণকোলাহল দেখা দিল। নবাব নিজের হাতে তকি খাঁকে বধ করে শিবিরের বাইরে এলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ 'যুদ্ধক্ষেত্রে'

শৈবলিনীর প্রাণরক্ষার জন্য রমানন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখর পলায়নপর নবাব সৈন্যের পেছনে নিরাপদ জায়গায় উপস্থিত হলেন। তখন শুধু প্রতাপের নেতৃত্বে একদল হিন্দু সৈন্য ইংরেজদের সঙ্গে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করছে। আর সকলেই তখন পিছু হটেছে। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে তার শৌর্য ও মহত্ত্বের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে দরবারের সব কথা তার কাছে বিবৃত করলেন। এখানে প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর কয়েকটি কথা হল। শৈবলিনী জানাল প্রতাপ থাকতে তার কোন দিন সুখ হয়নি। সুতরাং প্রতাপ যেন এ জন্মে তার সম্মুখে না আসে। কথাগুলি শোনামাত্র প্রতাপ কালক্ষেপ না করে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে গেল এবং যুদ্ধেই আত্মত্যাগ করল। এই আত্মত্যাগ যে শৈবলিনীর মঙ্গলের জন্য তা রমানন্দ স্বামীর কাছে প্রকাশ করে যান। তাই প্রতাপের এই মহত্ত্বকে রমানন্দ স্বামী প্রশংসা না করে পারেননি। .

পাঁচ

পরিচ্ছেদের নাম বিচার ঃ চন্দ্রশেখর

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসে পরিচ্ছেদ বিভাগ করে সেই পরিচ্ছেদগুলির নাম দিয়েছেন বিষয়কে সংহত ও পরিণামী ব্যঞ্জনা দানের উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের নাম এত মাধুর্যময় ও কাব্যগুণান্বিত যে, তা উপন্যাসের পূর্ণতা সম্পাদনে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমাদের আলোচ্য 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের বিষয়কে বিভিন্ন খণ্ড ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের পরিচ্ছেদ সংখ্যা পাঁচ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের আটটি করে, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের চারটি করে এবং ষষ্ঠ খণ্ডের পরিচ্ছেদ সংখ্যা হল আট। খণ্ড ও পরিচ্ছেদের বিভিন্ন নাম বিষয়বস্তুকে পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট ও তাৎপর্যবহ করে তোলার জন্য।

উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা' অংশে মূল কাহিনি শুরুর আগে পটভূমিকা নির্মাণ করা হয়েছে। শৈবলিনী ও প্রতাপের বাল্যপ্রণয়ের কাহিনি এখানে বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখন এই অংশটি 'পূর্বকথা' শিরোনামে মূল গ্রন্থের সঙ্গে ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থাকারে যখন তা প্রকাশিত হল তখন লেখক 'উপক্রমণিকা' নাম দিয়ে তা প্রকাশ করেন এবং তিনটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করেন। আসলে গ্রন্থের তিনটি চরিত্রকে অবলম্বন করে প্রেমের যে দুই রূপ বর্ণিত হয়েছে তার পূর্বাভাষ দেওয়ার জন্য এ ধরনের একটি উপক্রমণিকার প্রয়োজন ছিল, যা বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম রসবোধেরই পরিচায়ক।

উপক্রমণিকা'র প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'বালক-বালিকা'। এই নাম রাখার কারণ প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্য জীবনের পরিচিতি প্রদানই এর উদ্দেশ্য। এই সময়ে প্রতাপের বয়স পনের-ষোল এবং শৈবলিনীর বয়স আট। এই পরিচ্ছেদে নৌকার প্রসঙ্গ এনে ঔপন্যাসিক প্রতাপ-শৈবলিনীর ভবিষ্যৎ জীবনের একটি ইঙ্গিত দান করেছেন। কারণ এরূপ একটি নৌকায় কোথা থেকে একদিন চন্দ্রশেখর উপস্থিত হয়ে শৈবলিনীকে প্রতাপের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আবার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে'। এই পরিচ্ছেদে প্রতাপ ও শৈবলিনীর একসঙ্গে গঙ্গাবক্ষে প্রাণ বিসর্জন কামনায় নিমজ্জিত হওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রতাপ পরিকল্পনা অনুযায়ী ডুবল, কিন্তু শৈবলিনী বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় ডুবতে পারল না। দুজনের চারিত্রিক স্বরূপও এখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে। এজন্য নামটি সার্থক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'বর মিলিল'। এই নামের কারণ শৈবলিনীর দরিদ্রা মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তৎকালীন দিনে বিবাহ দেওয়া ব্যয়সাধ্য ছিল বলে তার মা-র পক্ষে সেই ব্যয় সংকুলান করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে শৈবলিনীর বর মিলে

গেল। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেই উপযাচক হয়ে তাকে বিবাহ করেন।

'উপক্রমণিকা'র পর প্রথম খণ্ড শুরু। এই প্রথম খণ্ডের নাম 'পাপীয়সী'। এই নামকরণ শৈবলিনীকে কেন্দ্র করে। কারণ শৈবলিনীর বিয়ে আট বছর হলেও প্রতাপকে তিনি ভুলতে পারেননি। বাল্যপ্রণয়ের অনুরাগ তাকে বিবাহিত জীবনে ব্যাকুল করে তুলেছে। তাই নীতিবাদী বঙ্কিম শৈবলিনীর এই স্বভাবকে এই নামে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'দলনী বেগম'। উপন্যাসটি যেহেতু ঐতিহাসিক রোমান্স তাই মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনির সমন্বয়ের জন্য দলনীর কাহিনি এসেছে, যেমনটি এসেছে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে। সেখানে নবকুমার-কপালকুণ্ডলার কাহিনির সঙ্গে মতি বিবির উপকাহিনি যুক্ত হয়েছে। দলনী চরিত্রটি ঐতিহাসিক না হলেও ঐতিহাসিক সজীবতা লাভ করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'ভীমা পুষ্করিণী'। এই নামকরণের কারণ বেদগ্রামে অবস্থিত এই পুষ্করিণীটির তীরে লরেন্স ফস্টর ও শৈবলিনীর সাক্ষাৎ এবং এখান থেকেই শৈবলিনীর ভবিষ্যৎ জীবনের বিপর্যয়ের সূত্রপাত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'লরেন্স ফস্টর'। এই নাম দেওয়ার কারণ ফস্টরের নির্লজ্জ কামুকতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে শৈবলিনীর অপহরণের ব্যাপারে ফস্টরকেই শুধু দোষ দেওয়া যায় না। কারণ এই অপহরণের ক্ষেত্রে শৈবলিনীরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। তাই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''বিদ্যুৎশিখা যেমন মেঘের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপে শৈবলিনীর অন্তর্গূঢ় জ্বালাময়ী প্রবৃত্তি ফস্টর-এর রূপমোহ দুঃসাহসিকতাকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে ও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাচক্রের যে পরিণতি তাহাতে উভয়েরই দায়িত্ব আছে; যে অগ্নি জ্বলিয়াছে তাহাতে উভয়েই ইন্ধন যোগাইয়াছে। শৈবলিনীর মনে গূঢ় পাপের অঙ্কুর না থাকিলে শুধু ফস্টর-এর পাপ ইচ্ছা প্রবল আগ্রহ তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আকর্ষণ করিতে পারিত না। আবার ফস্টর-এর দুঃসাহসিকতার অপ্রত্যাশিত আশ্রয় না পাইলে শৈবলিনীর মনের গোপন পাপ অন্তরেই চাপা থাকিত, প্রকাশ্য বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিত না।''

চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম 'নাপিতানী'। এই পরিচ্ছেদটির নাম নাপিতানী দেওয়ার কারণ সুন্দরী কিভাবে নাপিতানীর বেশ ধারণ করে ফস্টর-এর নৌকা থেকে শৈবলিনীর উদ্ধার সাধনে ব্রতী হয়েছিল তারই বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম 'চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন'। এই পরিচ্ছেদে রাজধানী থেকে চন্দ্রশেখরের প্রত্যাবর্তন ও তার পরে তাঁর মানসিক পরিবর্তনের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। তাই এই নাম।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'পাপ'। এই খণ্ডে পাপীরূপে শৈবলিনীর পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'কুলসম'। দলনী বেগমের পরিচারিকা কুলসম এই পরিচ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধার খবর সে-ই দলনীর কাছে ব্যক্ত করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'গুরগণ খাঁ'। মীরকাসেমের সেনাপতি গুরগণ খাঁ-এর নামে এই পরিচ্ছেদের নামকরণ। গুরগণ খাঁ ক্ষুদ্র সেনাপতি হয়েও কিভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিলেন তার বাস্তব চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। কেননা দলনী তার বোন হলেও কিভাবে তাকে করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল তার স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'দলনীর কি হইল'। এর কারণ দলনী দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে না পারায় তার জীবনস্রোত যে ভিন্নপথে প্রবাহিত হল, এই পরিচ্ছেদে তারই পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম 'প্রতাপ'। প্রতাপ রায়ের ক্রিয়াকলাপ এই পরিচ্ছেদের মুখ্য বিষয়। চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর কোন সংবাদ না পেয়ে সুন্দরী প্রতাপের শরণাপন্ন হল। প্রতাপ সুন্দরীর বোন রূপসীকে বিয়ে করেছে এবং চন্দ্রশেখরের, সহায়তায় নবাব সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতাপ যখন সুন্দরীর মুখে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হল, তখন তার ক্রোধ ও বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর উদ্ধাব চেষ্টায় অবিলম্বে মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করল।

পঞ্চম পবিচ্ছেদের নাম 'গঙ্গাতীবে'। এই পরিচ্ছেদে প্রতাপ কর্তৃক শৈবলিনী উদ্ধারের ঘটনা—যা গঙ্গার তীরে সংঘটিত হয়েছে। কাউন্সিলের নির্দেশে নবাবের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ইংরেজগণ প্রস্তুত হচ্ছে এবং সেজন্য ফষ্টারের সঙ্গে এক নৌকা বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র পাটনায় পাঠান হল। নৌকাটি পাটনায় নিয়ে যাওয়ার আগে ফষ্টর মুঙ্গেরে এসেই আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে ও সমস্ত সিদ্ধান্ত পাটনার ইলিস্ সাহেবকে জানাবে। ফষ্টর-এর দ্রুতগামী নৌকা পথিমধ্যে শৈবলিনীর বজরার দেখা পেল। এরপর অস্ত্রবোঝাই নৌকাটি বজবাসহ মুঙ্গেরে পৌঁছলে গুরগণ খাঁ তা আটক করলেন। গভীর রাতে প্রতাপ ও তার ভৃত্য রামচরণ অলক্ষে বজরার কাছে উপস্থিত হল। তাদের গুলির আঘাতে বজরার প্রহরী নিহত হল। ফষ্টরও গুলির আঘাত পেয়ে জলে পড়ে গেল। প্রতাপ জলের মধ্যে ছিল, সে চকিতে বজরার দড়ি কেটে দিয়ে তাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল। সুতরাং এই পরিচ্ছেদের সব ঘটনাই গঙ্গাতীরে হওয়ায় এই নাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম 'বজ্রাঘাত'। শৈবলিনীকে প্রতাপের প্রত্যাখ্যান শৈবলিনীর কাছে ছিল বজ্রাঘাতস্বরূপ। তাই এই নাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম 'গলষ্টন ও জন্‌সন'। পালিয়ে যাওয়া প্রতাপকে ধরবার জন্য এই পরিচ্ছেদে গলষ্টন ও জন্‌সন-এর কার্যকলাপ বর্ণিত হওয়ায় এই নাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদের নাম 'পাপের বিচিত্র গতি'। পাপের রীতিগত বৈচিত্র্য এই পরিচ্ছেদে চিত্রিত হয়েছে। শৈবলিনীর জীবনে পাপের প্রতিক্রিয়া এই পরিচ্ছেদে চিত্রিত হয়েছে। কারণ, পাপের রীতি হল সে আপাত মধুর প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং শেষে তাকে ঘোর আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত করে। প্রতাপ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শৈবলিনীর হৃদয়েও এই অনুশোচনার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডের নাম 'পুণ্যের স্পর্শ'। এই খণ্ডের বিষয়বস্তু হল শৈবলিনীর কৌশলে প্রতাপের মুক্তি, উভয়ের গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ এবং শৈবলিনীর কঠোর শপথবাক্য উচ্চারণ। মূলত এই খণ্ডে শৈবলিনীর মানসিক প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত হওয়ায় সমগ্র খণ্ডের নাম রাখা হয়েছে 'পুণ্যের স্পর্শ'।

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'রমানন্দ স্বামী'। এই পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখরের গুরু রমানন্দ স্বামীর পরিচয় ও শিষ্যের প্রতি তাঁর উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে যে অনুশীলন তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে কিম্বা 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র যে নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আলোচ্য পরিচ্ছেদে রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে সেই উপদেশ দিয়েছেন। এই তত্ত্বের পবম কথা হল, মানুষের জীবনে পরোপকার ছাড়া শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছুই নেই। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'আমার মন' প্রবন্ধেও তিনি একই কথা বলেছেন। মুঙ্গেরের মঠে সিদ্ধ পুরুয রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বমানন্দ স্বামীর উপদেশ চন্দ্রশেখর শিরোধার্য করে নেওয়ায় পরিচ্ছেদের এই নাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'নূতন পরিচয়'। এই নামের কারণ শৈবলিনী নবাবের কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে নিজেকে প্রতাপের স্ত্রী রূপসী বলে পরিচয় দিয়েছে। এই নতুন পরিচয়ে শৈবলিনী নবাবের কাছে অনুরোধ করেছে তাকে প্রতাপের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'নূতন শখ'। শৈবলিনী নতুন পরিচয়ে নতুন শখের কথা নবাবের কাছে প্রকাশ করায় পরিচ্ছেদের নাম। শৈবলিনীর ইচ্ছা ছিল নিজেই প্রতাপকে উদ্ধার করে। সেজন্য সে শখ করে নবাবের কাছ থেকে একটি ছিপ, কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও কয়েকজন রক্ষক চেয়ে নিল এবং নবাব তা দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম 'কাঁদে'। শৈবলিনী যেহেতু প্রতাপকে উদ্ধার করার বাসনা নিয়েছে, তাই ইংরেজদেরকে প্রতারণা করবার জন্য গঙ্গাতীরে এসে ছলনা করে কাঁদতে লাগল। তার সেই ক্রন্দন পরায়ণা মূর্তির উল্লেখ করে এই নামকরণ করা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম 'হাসে'। আগের পরিচ্ছেদে যেমন পাগলিনী শৈবলিনীকে কাঁদতে দেখা গিয়েছে, এ পরিচ্ছেদে তাকে হাসতে দেখা গেল। হাসির কারণ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে চলেছে অন্যদিকে সে পাগলিনী এই পরিচয় সাব্যস্ত করতে এই অকারণ কান্না ও হাসির দ্বারা ইংরেজদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পাগলিনী পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণ

কন্যা হিসেবে সে ব্রাহ্মণের তৈরি অন্ন ছাড়া অন্য অন্ন গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। প্রতাপের হাঁড়ি থেকে ভাত খাওয়ার ছলনায় প্রতাপের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। সে ভাত দেওয়ার আয়োজন করতে লাগল। সেইসময় প্রতাপের কানে শৈবলিনী ফিস্ ফিস্ করে বলল যাতে সে ঝাঁপ দিয়ে পালায়। প্রতাপ তাই করল। শৈবলিনীও ঝাঁপ দিয়ে দুজনে সাঁতার কেটে বহু দূরে চলে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম 'অগাধ জলে সাঁতার'। জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনী একসঙ্গে সাঁতার দিয়েছে তাই এই নাম। এই নামের দ্বারা প্রতাপ-শৈবলিনীব রোমান্সের স্বরূপকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই মিলিত সাঁতারের মাধ্যমে উভয়ের অতীত স্মৃতি জাগ্রত হওয়ায় নামকরণ সার্থক হয়েছে।

সপ্তম পবিচ্ছেদের নাম 'রামচরণের মুক্তি'। রামচরণের ইংরেজদের হাত থেকে পলায়নের জন্য পরিচ্ছেদের এই নাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদেব নাম 'পর্বতোপবে'। প্রতাপেব কাছ থেকে পলায়মানা শৈবলিনীর পর্বতারোহণের ক্লেশেব কথা বর্ণিত হওয়ায এই নাম।

চতুর্থ খণ্ডের নাম 'প্রাযশ্চিত্ত'। শৈবলিনী রমানন্দ স্বামীর নির্দেশে কঠোর সাধনায় তথা কৃচ্ছ্রসাধনায় ব্রতী হয়েছে। তাই খণ্ডেব এই নাম।

চতুর্থ খণ্ডেব প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'প্রতাপ কি করিলেন'। চন্দ্রশেখরের অনুরোধে প্রতাপের সৌভাগ্যলাভ ও ইংরেজ উচ্ছেদে নবাবকে সাহায্যদান এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হওয়ায় এই নাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'শৈবলিনী কি করিল'। এই পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ও স্বামী অনুধ্যান বর্ণিত হওয়ায় এই নামকরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'বাতাস উঠিল'। শৈবলিনী রমানন্দ স্বামীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে শৈবলিনী দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হয়ে চন্দ্রশেখরের মধ্যে প্রদীপ্ত ব্রহ্মচারীর রূপ দেখে চরিতার্থ হল। ফলে শৈবলিনীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় ব্যঞ্জনাভিত্তিক এই নাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম 'নৌকা ডুবিল'। এই তাৎপর্যপূর্ণ নামকরণের কারণ হল শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের ফলে যে অগ্রগতি দেখা দিয়েছিল তা বিপরীতমুখী হতে লাগল। অর্থাৎ শৈবলিনী যেভাবে আরোগ্যের পথে যাচ্ছিল, তা তিরোহিত হয়ে শৈবলিনীর অবস্থার অবনতি ঘটল।

পঞ্চম খণ্ডের নাম 'প্রচ্ছাদন' এই নামকবণের কারণ হল মূল কাহিনিকে প্রচ্ছাদিত রেখে উপকাহিনির বর্ণনা। কেননা এই উপন্যাসের উপকাহিনি দলনী বৃত্তান্ত এই খণ্ডে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তরতা শৈবলিনী প্রচ্ছন্ন হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'আমিয়টের পরিণাম'। ইংবেজ সৈন্য আমিয়ট নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারায় বলেই এই পরিচ্ছেদের এমন নাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'আবার সেই'। এই নামকরণের উদ্দেশ্য দুটি। পুনরায় ফস্টরের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে এবং দলনীর ভাগ্যবিপর্যয় এখানে আবার সূচিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'নৃত্যগীত'। এই পরিচ্ছেদে মুঙ্গেরের শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের অট্টালিকায় গায়িকা ও নর্তকীদের নাচ গানের বিলাসী আসরের বর্ণনা থাকায় পরিচ্ছেদের এমন নাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম 'দলনী কি করিল'। দলনী এখানে যে কাজ করেছে, তা তার করা উচিত হয়নি বলেই এই বিস্ময়প্রকাশ সূচক নাম। তকি খাঁর কু-মতলবের শিকার হয়েছে দলনী।

ষষ্ঠ খণ্ডের নাম 'সিদ্ধি'। রমানন্দ স্বামী তাঁর যোগবলে শৈবলিনীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে তাকে পুনরায় দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যোগবলের প্রভাবে সার্থকতা এসেছে বলে খণ্ডের নামকরণ করা হয়েছে 'সিদ্ধি'।

ষষ্ঠ খণ্ডেব প্রথম পবিচ্ছেদের নাম 'পূর্বকথা'। প্রতাপকে ত্যাগ করে শৈবলিনীর চলে আসার পর রমানন্দ স্বামী তাঁকে গোপনে অনুসরণ করছিল। সেই সময় পূর্বের প্রসঙ্গ (প্রতাপ-শৈবলিনীর সন্তরণ) আসায় পরিচ্ছেদের এই নাম।

পরিচ্ছেদের নাম 'হুকুম'। হুকুম শব্দের অর্থ হল আদেশ। নবাব ছলনায় ভুলে প্রিয়পত্নী দলনীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন এবং দলনীও একনিষ্ঠ স্বামীপ্রেমের পরিচয় দেখাতে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। তাই এই নামকরণ সার্থক।

তৃতীয় পবিচ্ছেদের নাম 'সম্রাট ও রবার্ট'। এখানে কুল্‌সম্‌ বিচারমূঢ় নবাবকে মূর্খ বলে তিরস্কার করেছে ও দলনী গুরগণেব সম্পর্ক প্রকাশ করেছে। তাই এই নাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম জন স্ট্যালকার্ট। লরেন্স ফস্টরের ছদ্মনাম অনুযায়ী এই পরিচ্ছেদের নামকরণ করা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম 'আবার বেদগ্রামে'। শৈবলিনী তাঁর স্বামীর সঙ্গে পুনরায় বেদগ্রামে ফিবে আসায় এই নাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম 'যোগবল না 'Psychic Force'?' শৈবলিনীর উন্মত্ত অবস্থা থেকে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার কারণ যোগবল না মনস্তত্ত্ব এই জিজ্ঞাসা থাকায় এমন নাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম 'দরবারে'। নবাবের দববারে বিচাবের জন্য সকলে উপস্থিত হয়েছিল, তাই এই নাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদের নাম 'যুদ্ধক্ষেত্রে'। প্রতাপ রায় এই পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে সুখী করার উদ্দেশ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে নবাবের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করতে সংকল্পবদ্ধ। তাই এই নামকরণ।

সুতরাং কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে খণ্ড ও পরিচ্ছেদ বিভাজন এবং তাদের নামকরণ যে তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের মুন্সিয়ানা সেখানে যে, বিভিন্ন পরিচ্ছেদের নামকরণের মাধ্যমে ঘটনার মধ্যে গতি ও নাটকীয়তা এনে কাহিনিরস দানা বাঁধার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং পাঠককেও নির্দিষ্ট রসাভিমুখী করতে সক্ষম হয়েছেন।

ছয়

গ্রন্থনাম বিচার ঃ চন্দ্রশেখর

উপন্যাসের নায়ক চন্দ্রশেখরের নামে এই উপন্যাসের নামকরণ। যদিও চন্দ্রশেখর নায়ক কিনা সে বিষয়ে মতান্তর রয়েছে, কিম্বা ইতিহাস অংশের নায়ক মীরকাসেমও উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে চন্দ্রশেখর নামকরণ সার্থক হয়নি—এ ধরনের বিতর্কও দানা বেঁধেছে, তবুও ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে উপন্যাসের নামকরণ যে যথার্থ হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে আদর্শবাদ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, সেই লক্ষ্যে যে নামকরণ করেছেন তা উপলব্ধি করলে নামকরণ বিষয়ে বিতর্ক আর থাকে না।

মূলত একটি প্রেমকাহিনিকে ঘিরে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠলেও সমান্তরালভাবে আর একটি ঐতিহাসিক কাহিনি মূল কাহিনির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। একটি কাহিনি শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখরকে নিয়ে, অন্যটি মীরকাসেম-দলনীকে নিয়ে। কাহিনির শুরু মীরকাসেমের অন্তঃপুরকে কেন্দ্র করে এবং সমাপ্তি প্রতাপের আত্মবিসর্জনে। কিম্বা প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমকাহিনি যা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কথাবস্তু, সেই দুটি চরিত্রের নামেও নামকরণ করা হয়নি। এসব দিক মনে রেখেও বলা যায়, চন্দ্রশেখর যেহেতু দুটি কাহিনির ক্ষেত্রে সংযোগকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং পরিবর্তনশীল ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন সেহেতু ঔপন্যাসিকও চন্দ্রশেখরকে পরহিতব্রত ধারী আদর্শ মানুষ হিসেবে উপন্যাসে মেলে ধরতে চেয়েছেন। সেদিক থেকে চন্দ্রশেখর নামকরণ সার্থক।

উপন্যাসে যে দুটি কাহিনি রয়েছে তা পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায় শৈবলিনী চরিত্র বা শৈবলিনীর কাহিনিই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু। একটি খণ্ড ছাড়া সব খণ্ডেই শৈবলিনী-কেন্দ্রিক কাহিনির যোজনা। এমনকি মীরকাসেম-দলনীর উপকাহিনিতেও শৈবলিনীর আধিপত্য। সেদিক থেকে শৈবলিনীর নামে নামকরণ করার যৌক্তিকতা রয়েছে। এমনকি উপন্যাসের সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র হল শৈবলিনী। এই শৈবলিনীর জন্যই দলনীর জীবনে করুণ পরিণতি সম্ভব হয়েছে। ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গেও শৈবলিনী যুক্ত হয়ে পড়েছে। কাহিনির আদি-মধ্য-অন্তব্যাপী শৈবলিনীরই প্রাধান্য। তবুও শৈবলিনীর নামে উপন্যাসের নামকরণ না হয়ে চন্দ্রশেখরের নামে হয়েছে, ঔপন্যাসিকের বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য।

আবার প্রতাপের আত্মবিসর্জন, বীরত্ব ও প্রেমের দিক থেকে চরিত্রভিত্তিক নামকরণের ক্ষেত্রে প্রতাপের নামও বিবেচ্য হতে পারত। প্রতাপের তুলনায় চন্দ্রশেখর অনেকটাই নিষ্ক্রিয়

চরিত্র। প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেম এবং প্রেমের ব্যর্থতা দিয়েই উপন্যাসের পটভূমি নির্মিত হয়েছে। শৈবলিনীকে প্রতাপ যথার্থই ভালোবাসে। সেই রোমান্টিক প্রেমের নায়ক প্রতাপ। শৈবলিনীর জন্য বিপদসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, শৈবলিনীর রোমান্টিক প্রেমের চিত্র উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপাদান। কিন্তু প্রতাপের নামে নামকরণ করা হয়নি, তার কারণ প্রতাপের প্রেম, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনি বর্ণনা ঔপন্যাসিকের আসল উদ্দেশ্য নয়।

'চন্দ্রশেখর' যেহেতু ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স, তাই ইতিহাস অংশের নায়ক-নায়িকার নামেও নামকরণ করা যেতে পারত— এমন প্রশ্ন আসাও অস্বাভাবিক নয়। ইতিহাসের আধারে এই কাহিনি গড়ে ওঠায় মূল কাহিনির মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। ইতিহাসের রথের চলমানতায় দলনী ও মীরকাসেমের জীবন আলোড়িত হয়েছে, আবার শৈবলিনী প্রতাপ চন্দ্রশেখরের কাহিনিও ইতিহাসের অমোঘ আকর্ষণে বেদগ্রাম ও পুরন্দরপুরের সঙ্কীর্ণ পরিধি অতিক্রম করে মুক্ত জীবনস্রোতের মধ্যে এসে মিশে গিয়েছে। এখানেও দুটি কাহিনিকে সংযোগের মূলে রয়েছে চন্দ্রশেখরের ভূমিকা। তিনি ভাগ্যনিয়ন্তার মতো শৈবলিনী ও দলনী বেগমের উপাখ্যানকে সমন্বিত করেছেন। তাই উপকাহিনির নায়ক-নায়িকার নামে নামকরণের যৌক্তিকতা নেই।

ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল দাম্পত্য প্রেমেব ও মানুষের পরহিতব্রতকে আদর্শ রূপে মেলে ধরা। সেদিক থেকে চন্দ্রশেখর-এর নামে নামকরণ যথার্থ। উপন্যাসের মধ্যে চন্দ্রশেখরই চরিত্রের বিশুদ্ধতায়, স্নিগ্ধতায় প্রতিটি মানুষের প্রতি ক্ষমার আদর্শে জ্ঞান তপস্যায় ও ধর্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল চরিত্র। চন্দ্রশেখরের আপাত নিস্পৃহতা বা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় না হওয়া তার চারিত্রিক দুর্বলতা নয়। বরং সবরকম বিঘ্ন-বিপদের মধ্যে চন্দ্রশেখর ধীর, প্রশান্ত ও মধুর। প্রশ্ন উঠতে পারে, চন্দ্রশেখরের তুলনায় প্রতাপের মহত্ত্বের কথা, তার আত্মবিসর্জনের কথা। কিন্তু চন্দ্রশেখরের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আদর্শ প্রতাপের থেকে কোন অংশে কম নয়। দুঃখের যন্ত্রণায় চন্দ্রশেখর পরিশুদ্ধ। হৃদয়বত্তা নেই বলে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাও খণ্ডন করেছেন ঔপন্যাসিক— "হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পোড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ তো ভস্ম হয় না।"

চন্দ্রশেখরের হৃদয়বত্তা তথা পরোপকারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। (এক) চন্দ্রশেখর অন্ধকার রাত্রে রাজপথে পরিত্যক্ত দলনী কুল্‌সমকে আশ্রয় দিয়েছেন। (দুই) ফষ্টর পরিত্যক্তা, অসহায়া দলনীকে নির্জন নদীপ্রান্তর থেকে রক্ষা করেছেন চন্দ্রশেখর। (তিন) তাঁর শত্রু-মিত্র ভেদ ছিল না। (চার) প্রতাপ যখন ফষ্টর বধে কৃতসংকল্প হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছেন তখন চন্দ্রশেখর বলেছেন, 'ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতি হিংসা করে; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।'—এই উক্তি চন্দ্রশেখরের মহত্ত্ব ও হৃদয়বত্তাকে প্রমাণ করে।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র যখন বিপর্যস্ত, পথভ্রষ্ট, তখন চন্দ্রশেখর শান্ত, স্থিতধীর মতো স্থির। চন্দ্রশেখরের আক্ষরিক অর্থ যেহেতু শিব, তাই শিবের মতোই চন্দ্রশেখর নীলকণ্ঠ। শৈবলিনীর সমস্ত দোষ ক্ষমা করে, তাকে সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ করে তুলে, শৈবলিনীকে দাম্পত্য জীবনের অভিমুখে চালনা করে, সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বিপদকে সামলে নিয়ে তিনি নীলকণ্ঠের মতো স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন উপন্যাসে।

একথা ঠিকই যে, শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখর প্রথমে উদাসীন ছিলেন। আর এই উদাসীনতা তাঁর শাস্ত্র-পাঠের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিজনিত। এমনকি শৈবলিনীও আবেগে বলে ফেলেছিলেন, 'আমি তাঁহার কেহ নহি, পুঁথিই তাঁহার সব'। এর উত্তর ঔপন্যাসিক দিয়েছেন সুন্দরীর মাধ্যমে—"যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্ল্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কি না, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কি না, বিধাতা তাকে সং গড়িয়া রাঙ্‌তা দিয়া সাজান নাই—মানুষ করিয়াছেন।" এখানে চন্দ্রশেখরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের অন্যতম উদ্দেশ্য দাম্পত্য প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা। তাই ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পর সুন্দরী শৈবলিনীকে বলেছিল,—"আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা ব্রাহ্মণের স্ত্রী, আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই।" শৈবলিনীও দাম্পত্য জীবনে অসুখী ছিল বলেই পুরানো প্রেমিকের প্রতি বারবার আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই দাম্পত্য প্রেমের স্খলন থেকে উত্তরণের চিত্র দেখানোর জন্য চন্দ্রশেখরের মহত্ত্বের প্রয়োজন ছিল।

শুধু মহত্ত্ব নয়, প্রেম ও বিবেক দিয়ে চন্দ্রশেখর নানান প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করতে পেরেছেন। প্রেম তাঁর হৃদয়ে ছিল বলেই তিনি শৈবলিনীর অভাবে বইগুলি পুড়িয়ে দিয়েছেন। এমন কি কামনার বশে যে স্ত্রী গৃহত্যাগিনী, যে স্ত্রী অন্যের প্রতি আকৃষ্টা, তাঁকে মোহবলে নয়, বিচারের দ্বারাই তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করেছেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের এক নারীকে স্খলন পতনের পর মেনে নেওয়া তাঁর চরিত্রের ঔদার্যকে প্রমাণ করে। তাই চন্দ্রশেখর শৈবলিনী সম্পর্কে বলেছেন, "যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইহাকে গৃহে লইব।" এই যে নৈতিক বীরত্ব তা প্রতাপের আত্মত্যাগকেও ম্লান করে দিয়েছে। এদিক থেকে চন্দ্রশেখর চরিত্রের নামে নামকরণ সার্থক।

বিশেষ করে চন্দ্রশেখরের দুঃখসহন ক্ষমতা, ক্ষমার আদর্শ, পরহিতব্রত ও নৈতিক বীরত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের অভীষ্ট মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শকেই মূর্তিমান করে তুলেছে। শৈবলিনী নিজেও চন্দ্রশেখরের এই রূপ ও আদর্শ দেখে অকপটে স্বীকার করেছে, "এই যে ললাট-প্রশান্ত, চন্দন চর্চিত, চিন্তারেখা বিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ?"

তাছাড়া চন্দ্রশেখর ইতিহাস ও উপন্যাস অংশের যোগসাধন করেছেন। তিনি মীরকাসেমের শিক্ষাদাতা, তিনিই প্রতাপকে নবাবের কাছে পরিচিত করিয়ে চাকরির ব্যবস্থা করিয়েছেন, তিনি সুন্দরীর বোন রূপসীর সঙ্গে প্রতাপের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া নবাবের কাছে চন্দ্রশেখরের লিখিত পত্রকে সূত্র করে দলনী ও শৈবলিনীর ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ তাঁরই আনুকূল্যে তিনি জমিদার হয়েছেন, প্রতিপত্তি হয়েছে। তাই সুন্দরীর কাছে উভয়ের নিরুদ্দেশের কথা শুনে কৃতজ্ঞতাবশত উভয়কে উদ্ধারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন।

সেদিক থেকেও চন্দ্রশেখরের গুরুত্ব যথেষ্ট। আসলে উপন্যাসের মূল আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের নামকরণ করেছেন। সে আদর্শ বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমের এবং পরহিতব্রতের। মানব ধর্মের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের নামকরণের মাধ্যমে নিজের অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকেই রূপ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানের মানুষ চন্দ্রশেখর—এই চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে দেখা মনুষ্যত্বের মূর্তি। প্রতাপও শেষ পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের পদধুলি গ্রহণ করে যেন ঔপন্যাসিকের ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, 'আপনিই মনুষ্য মধ্যে ধন্য'। উপন্যাসের নাম তাই মীরকাসেম নয়, দলনী নয়, প্রতাপ নয়, নয় শৈবলিনী—নাম চন্দ্রশেখর এবং তা যথার্থ।

সাত

গোত্রবিচার ঃ রোমান্সধর্মী উপন্যাস

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের গোত্রবিচারের ক্ষেত্রে একে যে ঐতিহাসিক রোমান্স বলা যায় সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' রোমান্সধর্মী হলেও গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনি। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইতিহাসকে পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তাই ইতিহাসের আবর্তে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপের কাহিনি গতিশীল হয়ে হৃদয়গ্রাহী হতে পেরেছে। মুর্শিদাবাদের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি শেষপর্যন্ত ক্ষুদ্র গ্রাম বেদগ্রাম ও পুরন্দরপুর-কে স্পর্শ করেছে। কাহিনিব মূলে যে জীবনসমস্যা তা ইতিহাসের পটে অভিনব রূপ লাভ করেছে। তাই 'চন্দ্রশেখর' একটি ঐতিহাসিক রোমান্স হয়ে উঠতে পেরেছে।

'রোমান্স' শব্দটি বিদেশী। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে রোমান্স রস বলে কোন রস নেই। স্থায়ীভাব বিস্ময়ের রসপরিণামের সঙ্গে এর যোগ আছে। এদেশের গল্পসাহিত্যে 'আখ্যায়িকা', 'কথা', রম্যকথার সঙ্গে রোমান্সের মিল দেখা যায়। 'বাসবদত্তা', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি রম্যকথা যেন জীবনের পটে আঁকা এক আশ্চর্য স্বপ্নমায়ার সুরম্য কল্পলোক। বিস্ময় ও সৌন্দর্য, চমক ও চমৎকারিত্বের সংযোগে সে যেন অদৃষ্টপূর্ব এক আনন্দলোক। সেই আনন্দ পটে ছায়াবাণীর মতো শোনা যায় অলৌকিক প্রেমের গুঞ্জরণ—পূর্বরাগ, বিরহ-মিলনের স্বপ্নময় কাহিনি। এ যেন মরলোকে গন্ধর্বলোকের গান।

রোমান্সেও মর্ত্যলোকের অমর্ত্যরাগ—'তার অনেকটা মায়া, অনেকটা ছায়া', যেন প্রাকৃতিক আলো-জলের সংযোগে সৃষ্ট আকাশের ইন্দ্রধনুচ্ছটা। জীবন থেকে তা বিচ্ছিন্ন নয়। জীবন-রসেই রোমান্সের পুষ্টি। রোমান্স অলীক আকাশকুসুম নির্মাণ করে না। কিন্তু পুষ্পিত বৃক্ষ যেমন, ধুলিমলিন মূলকে না দেখিয়ে শাখার পুষ্প প্রাচুর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রোমান্স তেমনই বস্তুরূপকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে জীবনের পুষ্প সমৃদ্ধিকে প্রকাশ করে দেখায়। সুন্দর-অসুন্দর, প্রেম-ঈর্ষা, ক্ষমা-ক্রোধ, বিনয়-দম্ভ—সবই এখানে সুর পঞ্চমে ধ্বনিত হয়। চেনা মহল অপেক্ষা অচেনা মহলের প্রতিই রোমান্সের ঝোঁক। সেখানেই চমক ও চমৎকৃতি নিজেদের সার্থকতা খুঁজে পায়। সেজন্যই নিকট অপেক্ষা দূর, বর্তমান অপেক্ষা অতীত বা ইতিহাসের প্রতি রোমান্সের মোহময় আকর্ষণ। অশ্রুতপূর্ব কাহিনি, অভূতপূর্ব ঘটনা, অ-দৃষ্টপূর্ব স্থান ও অচিন্তিতপূর্ব ভাব নিয়ে রোমান্সের বিলাস।

কিন্তু উপন্যাসের ধর্ম স্বতন্ত্র। প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজ, সংসার ও জীবন উপন্যাসের উপাদান। উপন্যাস 'মাটির কাছাকাছি'। তাই কল্পনা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ-রসের

জগতের প্রতি উপন্যাসের আকর্ষণ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নভেল ও রোমান্সের আলোচনা প্রসঙ্গে রোমান্সের যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, তার অনুসরণে বলা যায়—যেখানে আমাদের 'delight in seeing the near and familiar and familiar artistically rendered.' তাকেই আমরা অবিমিশ্র বাস্তবানুপন্থী নভেল বলতে পারি। উপন্যাসে আমাদের সমাজ ও সেই সমাজের সাধারণ মানুষ মূর্ত হয়ে ওঠে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ছবিগুলি নভেলের মধ্যেই সার্থকভাবে পাওয়া যায়। নভেল সাধারণত সমসাময়িক যুগের ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হয়, তাই সেখানে কল্পনা প্রকাশের অবকাশ কম। রোমান্সেও বাস্তবতা আছে, কিন্তু সেখানে বাস্তবতা কল্পনার রঙে রসে রঙিন হয়ে ওঠে।

পূর্বে রোমান্স বলতে অতিপ্রাকৃত ও অবিশ্বাস্য ঘটনাবলীর বর্ণনাই বোঝাত। 'Pleasure in the remote and unfamiliar'-কেই রোমান্স আখ্যা দেওয়া হত। আধুনিক যুগের বাস্তবতা রোমান্সের ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। রোমান্সের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল কাব্যময়তা। এই কাব্যময়তা ও কল্পনাপ্রয়োগ এবং অতীত দিনের উচ্ছ্বাসমুখর আবেগ সত্ত্বেও উপন্যাসের রোমান্স ধারা বাস্তববিরোধী নয়। রোমান্স রূপকথাও নয় আবার অতিবাস্তব উপন্যাসও নয়। রোমান্টিক উপন্যাসগুলি সহজ ও সাধারণ জীবন অপেক্ষা বৈচিত্র্যময় ও কল্পনারসসিক্ত জীবনের অসাধারণ ভাবোচ্ছ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সাধারণত রোমান্সস্রষ্টা ইতিহাস, প্রেম ও প্রকৃতির রাজ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন। কারণ সুদূর ইতিহাস চিররহস্যময়, প্রেম-জটিল ও বিচিত্র এবং সুন্দরী প্রকৃতিতে রয়েছে অপার বিস্ময়। বঙ্কিমচন্দ্রও 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস রচনায় এগুলির সুযোগ গ্রহণ করেছেন। ইতিহাস থেকে তিনি আহরণ করেছেন দুর্দম প্রবৃত্তির দুরন্ত উল্লাস, কুটিল চক্রান্তে প্রবৃত্তি নটীর নৃত্যরঙ্গ, গৃহস্থ মানুষের জীবন থেকে আহরণ করেছেন উজ্জ্বল প্রেমের মাধুর্য, প্রণয় বঞ্চিতের নৈরাশ্য ও আক্ষেপ; প্রকৃতিজগৎ থেকে সংগ্রহ করেছেন ফেনিল নীল গঙ্গার গভীর কল্লোল, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মাধুরী। এদিক থেকে দেখতে গেলে চন্দ্রশেখর উপন্যাসে রোমান্সের লক্ষণ প্রকট।

উপন্যাসের কাহিনি বিচার করলেও উপলব্ধি করতে পারব, বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক রোমান্স রূপে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে রোমান্সের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "The absence of central plot, and the prolongation rather than evolution of the story ; the intermixture of supernatural ; the presence and indeed prominence of love affairs ; ...... the variety of adventure arranged rather in fashion of a panorama than otherwise......... ." এদিক দিয়েও বিচার করলে চন্দ্রশেখর যে রোমান্স সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আলোচ্য উপন্যাসে দুটি কাহিনি। একটি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপের কাহিনি যা কাল্পনিক এবং অন্যটি দলনী-মীরকাশেমের কাহিনি—যা অনেকটাই ঐতিহাসিক। এই দুটি কাহিনির মূল উপাদান হল প্রেম। বাল্যপ্রণয় ও দাম্পত্য প্রেম এবং তার স্বরূপ নানাভাবে উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। ইতিহাসের উপাদানকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রেমের বিচিত্র স্বরূপ ও গতিকে চিত্রায়িত করবার প্রয়োজনে। চমকপ্রদ কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে নিপুণ রূপে ব্যবহার করতেও সক্ষম হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন, "রাষ্ট্রবিপ্লব প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে ঐতিহাসিক বিপ্লবের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা অসাধারণ শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারিয়াছে, ইহাদের ব্যক্তিগত তেজ এবং আসক্তির সংসক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাই রোমান্সের বৈশিষ্ট্য।" ইতিহাসের সঙ্গে বাস্তবের মিশ্রণ, রোমাঞ্চকর ঘটনার উপস্থাপন, কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং অসাধারণের অপূর্ব সমাবেশ চন্দ্রশেখর উপন্যাসকে ঐতিহাসিক রোমান্স অভিধায় অভিহিত করতে পেরেছে। বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

(ক) ইতিহাসের সঙ্গে বাস্তবের মিশ্রণ ঃ (অ) প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের সূত্র ধরে, সেই প্রণয় বাস্তবায়িত না হওয়ায় চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে বিবাহ এবং বিবাহের পর শৈবলিনীর প্রতি ফস্টরের আকর্ষণ ও মীরকাসেমের নির্দেশে চন্দ্রশেখরের গৃহত্যাগ ও তার পরবর্তী ঘটনা নিঃসন্দেহে বাস্তবজীবনের ঘটনার সঙ্গে ইতিহাস মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। (আ) লরেন্স ফষ্টর অনৈতিহাসিক চরিত্র হলেও সমকালীন ইংরেজের লোভ ও উদগ্র কামপিপাসা লরেন্সের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। সত্যকে বিকৃত না করেও বঙ্কিমচন্দ্র এই কল্পিত চরিত্রটির মধ্যে ইংরেজের ক্ষমতালোভ, স্বেচ্ছাচারিতা, অকুতোভয়, জাত্যভিমান প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছে। এই লরেন্স ফষ্টর শৈবলিনী অপহরণের মাধ্যমে গ্রামের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনকে ইতিহাসের তরঙ্গাবর্তে টেনে এনেছে। প্রতাপ যে ইংরেজ জাতিকে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে, তার কারণ ইংরেজদের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে। এমনকি রূপমুগ্ধ ফষ্টরকে আশ্রয় করেই শৈবলিনী প্রতাপকে লাভ করার জন্য কুলত্যাগ করেছিল। (ই) মীরকাসেম ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও, মীরকাসেমের ইতিহাসচর্চা ইতিহাস সম্মত হলেও, মীরকাসেমের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ ইতিহাস স্বীকৃত হলেও ইতিহাসের এই সূত্রের সঙ্গে দলনীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের বাস্তব ঘটনা অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। দলনীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেম ইতিহাসের রথের চাকায় পিষ্ট হয়েছে। কল্পনা এখানে সত্যাশ্রয়ী হয়ে অধিকতর বাস্তব (higher truth) রূপে পরিচিতি লাভ করেছে।

(খ) রোমাঞ্চকর ঘটনার উপস্থাপন ঃ রোমান্সরস সৃষ্টির জন্য চমকপ্রদ ঘটনা-সংঘটন এবং বিস্ময় ও চমৎকারিত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যেমন—(অ) গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশের শুরুই হয়েছে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে, কাব্যময় ভাষায়—

"ভাগীরথী তীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ নদী বৃক্ষ, দেখিয়া আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ--বালিকার নাম শৈবলিনী।" তারপর প্রতাপের গলায় শৈবলিনীর মালা পরানো, সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা গণনা, নৌকাগণনা সবই রোমান্সের পটভূমি। (আ) গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনীর সন্তরণ দৃশ্য, নিজেই ঘটক হয়ে শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখরের বিবাহ, শাস্ত্রানুশীলন সমাপ্তির পর অনেক রাতে 'মুক্ত বাতায়নপথে কৌমুদীপ্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে।' এ সমস্ত চিত্র রোমান্সের উপযোগী। (ই) প্রতাপের উদ্দেশ্যে শৈবলিনীর গৃহত্যাগ একাধারে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণ। একদিকে তাঁর অতৃপ্ত জীবন পিপাসা, অন্যদিকে অনির্দেশের প্রতি গমন—রোমান্সের সূচক। (ঈ) সুন্দরীর শৈবলিনীকে অনুসরণ করে নাপিতানীর ছদ্মবেশে ফস্টরের বজরায় পৌঁছানো, শৈবলিনীর পাগলিনীর মতো ইংরেজবাহিনীর কাছে অভিনয়, প্রতাপ কর্তৃক শৈবলিনীর উদ্ধার, প্রতাপ-শৈবলিনীর গঙ্গাবক্ষে দীর্ঘক্ষণ সন্তরণ এবং সন্তরণের সময় শৈবলিনীর উক্তি 'আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন', নবাবের সঙ্গে শৈবলিনীর প্রগল্‌ভ আচরণ বাস্তবধর্মী সামাজিক উপন্যাসের উপাদান হতে পারে না। সেকথা উপলব্ধি করেই এসব উপাদানের সাহায্যে রোমান্স সৃষ্টিতে তৎপর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

(গ) অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর সমাবেশ ঃ জ্যোতিষ গণনা, স্বপ্নবৃত্তান্ত, নরক দর্শন, রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন চন্দ্রশেখর উপন্যাসে। জ্যোতিষ গণনার ফলে দলনীর জীবনে নেমে আসে অশুভ পরিণাম, শৈবলিনীর মানসিক বিকার জনিত স্বপ্ন, শৈবলিনীর নরকদর্শন তথা স্বপ্নদর্শন, যোগবলসিদ্ধ রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক কার্যাবলী, অপ্রকৃতিস্থা শৈবলিনীকে কমণ্ডলুর জল পান করিয়ে তাকে রোগমুক্ত করা প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত ঘটনা রোমান্সেই সম্ভব, বাস্তবধর্মী উপন্যাসে তা বেমানান।

(ঘ) কল্পনার অবাধ বিস্তার ঃ 'চন্দ্রশেখর'-এ ইংরেজ কোম্পানির অধ্যক্ষতায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাসেমের ঐতিহাসিক সূত্র অবলম্বনে প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর-দলনীর কাহিনিতে অবাধ কল্পনার বিস্তার ঘটিয়েছেন। ঘটনার মুহুর্মুহু নাটকীয় গতি পরিবর্তন ও পরিণামী ঘটনার প্রতি ক্রমশ অগ্রগমন এই অবাধ কল্পনারই প্রতিফলন। ইতিহাসের আশ্রয়ে এ ধরনের কল্পনার বিস্তার ঐতিহাসিক রোমান্স হিসেবে চন্দ্রশেখর উপন্যাসকে চিহ্নিত করেছে। এই উপন্যাসে যেমন উপস্থাপিত হয়েছে নবাবী আমলের বাঙালীর ঐশ্বর্য, বীর্যবত্তা, জ্ঞানগরিমা, নবাবী আমলের ভগ্নদশার ষড়যন্ত্রময় মসীময় চিত্র,

নবাবের অসহায় অবস্থা, কোম্পানির কর্মচারীদের লুব্ধতা ও প্রভুত্বের স্বরূপ তেমনি বাংলার সামাজিক গার্হস্থ্য জীবন, প্রেম-প্রণয়, দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ, বাঙালীর বাহুবল, আত্মত্যাগ প্রভৃতি। সুতরাং অবাধ কল্পনা না থাকলে ইতিহাসের পটে এ ধরনের কাহিনিবিন্যাস গতিময়তা ও চমৎকৃতি লাভ করতে পারত না।

(ঙ) অসাধারণের অপূর্ব সমাবেশ ঃ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অসাধারণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। যেমন, শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে চন্দ্রশেখরের মতো মানুষের শৈবলিনীকে বিবাহ করা, ভীমা পুষ্করিণীতে গৃহবধূর বেশিক্ষণ সময় কাটানোয় গৃহস্বামীর প্রতিক্রিয়া না থাকা, শৈবলিনী কর্তৃক প্রতাপ উদ্ধার, দলনীর নবাবের পত্রকে বিশ্বাস করা, শৈবলিনীর নরকদর্শন, স্বপ্নদর্শন, শৈবলিনীর উন্মাদ অবস্থা প্রভৃতি অসাধারণ ঘটনা ও পরিবেশন নৈপুণ্য রোমান্সের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

(চ) অপূর্ব কাব্যময় ভাষা ঃ রোমান্স সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকের কাব্যময় গদ্যরীতি যে বিশেষ কার্যকর হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যেমন—(১) 'এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?' (ষষ্ঠ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। (২) 'সে মুখ শিশির নিষিক্ত পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল, কেশগুচ্ছ সকল আর্দ্র করিয়া, কেশগুচ্ছ সকল ঋজু করিয়া ঝরিতে লাগিল—কেশ, পদ্মাবলম্বী শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল।' (দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। (৩) 'ভাল, ঈশ্বর কেন এমন করেন? একজন কেন আর একজনের পথ চাইয়া পড়িয়া থাকে? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন?' (প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)।

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের কাহিনি হলেও 'চন্দ্রশেখর' ঐতিহাসিক রোমান্স। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক রোমান্সের সুদৃঢ়তা আছে, আছে বিচিত্র ও বিস্ময়কর কাহিনির অপূর্ব সমাবেশ। আবার সেই পটভূমিকায় বেদগ্রামের শান্ত নিস্তরঙ্গ গৃহস্থালীর চিত্রও ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্যে এই কাহিনিকে গড়ে তোলা হয়েছে তাতে পল্লীবাংলার গৃহাঙ্গন পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গৃহস্থবধূ গৃহসংসার ত্যাগ করে রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করেছে নবাবের বেগম। ইতিহাসের সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন সমগ্র দেশ আলোড়িত তখন অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপারও স্বাভাবিক হয়ে উঠে। এই আলোড়ন সত্ত্বেও বাংলার শান্ত সুন্দর জীবনযাত্রার ছন্দ পতন ঘটেনি। সেজন্যই দেখতে পাই নায়িকা শৈবলিনী শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে ফিরে এসেছে তার গার্হস্থ্য জীবনে। নিভৃত পল্লীর শান্তিময় গৃহাশ্রমের আদর্শকেই বঙ্কিমচন্দ্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করেছেন। তাই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস যে ঐতিহাসিক রোমান্স পদবাচ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

আট

চন্দ্রশেখর ঃ রোমান্সের অবয়বে মনস্তত্ত্ব

'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমের সমাজভাবনার ফলশ্রুতি এবং তা ঐতিহাসিক রোমান্স। রোমান্সের বহিঃরূপদান এবং অন্তঃরূপদান 'চন্দ্রশেখরে' বর্তমান। অর্থাৎ চমৎকার ঘটনা সন্নিবেশ, রহস্যের প্রতিপাদন, কৌতূহলের উদ্দীপনা, সুন্দরের সঙ্গে অজানা ও অসাধারণের সংযোগ, অভাবনীয়ের আকস্মিক আবির্ভাব, বাস্তবের সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের সমন্বয় সাধন, সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের সংযোগসাধন, স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত কম্পিত এক অতীত যুগের চিত্রাঙ্কন এবং বাস্তবাতীতের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসে রোমান্সের বাস্তবতাকে সুদৃঢ় করেছে। জীবনসত্যকে লঙ্ঘন করে বঙ্কিম উপন্যাস রচনা করেন নি। তার উপন্যাসে মানবজীবনের গভীরতর সত্যই সংগৃহীত ও পরিকল্পনার রসে সঞ্জীবিত। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে মহাজগৎ তার আভাস পাই বঙ্কিমের উপন্যাসে।

ফষ্টর ও শৈবলিনীর যোগাযোগ বিশেষত পুকুরঘাটের আলাপ, এককথায় অবিশ্বাস্য। নাপিতানীরূপে সুন্দরীর অভিযানের মধ্যে মেলে নিছক এক ডিটেকটিভ গল্পের কাঠামো। দলনী ও গুরগণের প্রচ্ছন্ন ভাইবোনের সম্পর্ক ও সেই সম্পর্কের বনিয়াদে রাষ্ট্রজগতে অঘটন ঘটানোর পরিকল্পনা একমাত্র রোমান্সেরই সামগ্রী। গঙ্গায় প্রতাপ ডুবল, সামনেই অপেক্ষামান উদ্ধারকারী চন্দ্রশেখর। এ ঘটনা রোমান্সেই সম্ভব। নিশীথে দলনী বেগমের বৃক্ষতলে অবস্থান, অকস্মাৎ ব্রহ্মচারীরূপে চন্দ্রশেখরের আবির্ভাব সমস্তই রোমান্স। মুঙ্গেরের ঘাটে ফষ্টরের বাঁধা দুটি নৌকার একটিতে শৈবলিনী। রাত্রি দ্বিপ্রহর। তীরে কসাড় বন থেকে একব্যক্তি কাকে নিরীক্ষণ করছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়। কোথা থেকে সে এল কোন প্রয়োজন নেই সে সংবাদে। সবই Adventure। ফষ্টরের নৌকা থেকে দলনী স্বেচ্ছায় গঙ্গাতীরে নেমে পড়ল। অচিরেই বুঝল তার ভুল। পিছনের নৌকা নিজেদের নয়। নৌকা চলে গেলে সে রইল একাকিনী। গঙ্গাতীরে পরিত্যক্তা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে সে প্রান্তর মধ্যে সহসা এক দীর্ঘকায় পুরুষকে একা বিচরণ করতে দেখল। তিনি রমানন্দ স্বামী। যে দৃশ্য রোমান্স রসে সঞ্জীবিত। এই রমানন্দ স্বামীর আবির্ভাব না ঘটলে দলনীর পরিণামচিত্র কি হত বলা যায় না। আসলে উপন্যাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে রোমান্সের নিগড়েই লেখক বাঁধতে চেয়েছেন।

রোমান্সেরই অবয়বে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মনস্তত্ত্বসূত্রকে অঙ্কন করেছেন। যদিও এই দুই শ্রেণীর দুই পদ্ধতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা অনেক সময়েই সম্ভব হয়নি। বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপের বাড়ীতে যখন শৈবলিনী প্রত্যাখ্যাতা হল তখনই তাকে ভাবনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে

নিক্ষেপ করেছেন লেখক। আবার প্রণয়ীকে উদ্ধারে উদ্দীপ্ত কর্মচাঞ্চল্যে সে ভাবনা ভুলেছে। কিন্তু গঙ্গার বুকে শপথ করার পরে সে গভীরতর চিন্তা ও পাপবোধে নিমজ্জিত। মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনি গঠনের উদ্দেশ্যে বিন্যাসের এই রীতি লেখক অনুসরণ করেছেন। সন্দেহ নেই অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক কাহিনির পরবর্তী রাবীন্দ্রিক নিদর্শনের তুলনায় এই কৌশল অনেকটা প্রাথমিক ধরনের। অর্থাৎ ১৯০৩ সালে প্রকাশিত 'চোখের বালি'তে চরিত্রের আঁতের কথা টেনে বার করে দেখানোর যে রীতির পূর্ণতা লক্ষ করা যায় তা এখানে অকল্পনীয়। কিন্তু কালে রীতির বদল হয় এবং বঙ্কিম মিশ্ররীতি পর্যন্ত এগিয়ে ছিলেন বা এগুতে রাজী ছিলেন। তাই কালগুণে বেশি পাবার চেষ্টা অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক রীতিকে আদ্যন্ত অনুসরণ করে একমাত্র করে তোলার কথাও ওঠে না। তবে নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের এই প্রয়াস মহতী। এখন সংক্ষেপে মুখ্য পাত্রপাত্রীদের ক্ষেত্রে এই রীতি কতদূর শিল্প সার্থক হয়েছে তা দেখা যেতে পারে।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, এ উপন্যাসের আগেই 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) উপন্যাসে বঙ্কিম কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের অন্তর নামক বস্তুর উপর বিধৃত সজীবত্বকে লক্ষ করেছিলেন।

বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রধান প্রধান পাত্রপাত্রীদের ক্ষেত্রেই এই মনস্তত্ত্বমূ‍ং ক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য রীতি বর্তমান। বলাই বাহুল্য, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ অবকাশ অবশ্য তাতে ব্যাহত হয়েছে। চন্দ্রশেখরের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখা যায়, বেশি বয়সে গৃহকর্মের শৃঙ্খলার জন্য সে শৈবলিনীকে বিবাহ করেছে সত্য। কিন্তু সে যে কিভাবে শৈবলিনীর জীবনকে বিড়ম্বিত করেছে, তারও উত্তর নিজে রেখেছে আত্মসমীক্ষণে ..... "আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব। .... আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেইজন্য ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি কি করিব। ....তবে কি এই নিরপরাধিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে?" কিংবা দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্ত্রী বিরহে বিবাগী চন্দ্রশেখর যখন বলেন, "আমার মত পথে পথে নিশাজাগরণ করে, এমন হতভাগ্য কে আছে? নিঃসন্দেহে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণের পদ্ধতির লক্ষণ এই সূত্রে গোচরে আসে। কিন্তু আমরা চরিত্রের ক্রমোন্নয়নকে সামনে তুলে ধরলে দেখতে পাই ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের চঞ্চল ঘটনার অগ্রগমন উপন্যাসের নায়ককে লঙ্ঘন করেছে।

এই সূত্রে বিচার্য অন্য মুখ্য পুরুষ চরিত্র প্রতাপ রায়। চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে খুব সংক্ষেপে হলেও প্রতাপের মনের মধ্যে যে ভাবনা উঁকি মেরেছিল, তা উল্লেখ্য। অর্থাৎ যে রাত্রে ছিপ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল শৈবলিনী, সে রাত্রির প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর ভৃত্য রামচরণকে ফিরে আসতে দেখে সে যেমন আনন্দিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি শৈবলিনীর ফিরে না আসাতে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছিল। যদিও আমাদের অজানা নয়, যে প্রতাপ রায়

অতি সৎ হয়েও সততার শরে বিদ্ধ হয়েছিলেন। তবু তার অন্তর ভাবনা ভোলার নয়। সে প্রথমে মনে করল, "আমার দোষ কি! আমি ধর্ম ভিন্ন অধর্মপথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে তাহা অনিবার্য কারণ নহে।" আসলে এ আত্মভাবনা উপন্যাসের নব নিরীক্ষা পদ্ধতির কথাই মনে করায়।

ঘটনা থেকে, উৎক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে বা বিশেষ মুহূর্তে পাত্রপাত্রীর মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে, সেই প্রতিক্রিয়া উপস্থাপিত করা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে শৈবলিনীর দ্বন্দ্বমথিত জীবনের বিবরণে এই পদ্ধতি কতটা মনোবিকলন মূলক সে আলোচনার পাশে রাখলেও বলতে হয়, ঘটনার ঘনঘটার মধ্যেও তার উৎকণ্ঠা প্রকাশের সময় মানসিক অবস্থার চিত্র স্বতঃপ্রকাশিত। বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে শৈবলিনী চিত্তের অস্থিরতায় যে আলোকপাত বঙ্কিম করেছেন তা মূল্যবান।

প্রতাপের নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়ে শৈবলিনী আপন মনে চিন্তা করতে শুরু করেছে। প্রতাপের আশায় সে আত্মহত্যা করতে পারেনি, পরন্তু যে প্রতাপ তাকে পাপিষ্ঠা বলে তিরস্কার করেছে সেই প্রতাপকেই ধরে নিয়ে গেলে আবার সে উদ্বিগ্ন হয়েছে। "যা হৌক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে, তাহা জানি না— সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম", তার লাভ যে কি এই গৃহত্যাগে তাও জানে সে ; "...... অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।"

আমরা জানি, শৈবলিনীর এই মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যথাযথ অবকাশ সৃষ্টি করেননি লেখক। বোধ হয় লেখকের সেই ইচ্ছাও ছিল না। তবে এই তিন প্রধান চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতিকে সামনে রেখে একথা বললে অসঙ্গত হয় না যে, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস রোমান্সের জারকরসে জারিত হলেও তার বিভিন্ন অলিন্দেই মনস্তাত্ত্বিক আবেদনের আহ্বান উপেক্ষণীয় নয়। তবে এই উপন্যাস যে মনস্তাত্ত্বিক রূপ পেতে পারত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নয়

চন্দ্রশেখর ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইতিহাসের প্রসঙ্গ আছে, আছে বাংলার নবাব মীরকাসেমের সময়কার ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র, তবুও এই উপন্যাস বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। তার কারণ এখানে ঐতিহাসিক রস সৃষ্ট না হয়ে রোমান্স রসই গুরুত্ব পেয়েছে। এমনকি স্বয়ং ঔপন্যাসিকও উল্লেখ করেছেন, ''আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।'' (রাজসিংহ উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন)।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান তিন ধরনের—(ক) ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র, (খ) অনৈতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র, (গ) কল্পনা। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কাজ হল, ইতিহাসকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করবেন এবং ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করবেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—''ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোন বিবাদ নাই; কারণ স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ মাত্র।'' এদিক থেকে বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ-ই তাঁর একমাত্র বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাস ছিল তাঁর একটি প্রিয় বিষয়। এই ইতিহাসপ্রিয়তা তাঁকে যেমন স্বদেশের ইতিহাস সন্ধানে অনুপ্রেরিত করেছে, জীবনকে তথ্যনিষ্ঠ করে তুলেছে, তেমনই আবার এই ইতিহাস চেতনা তাঁর উপন্যাসগুলিকে রোমান্সের গাঢ় রঙে অনুরঞ্জিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস ইতিহাস-বোধে উদ্দীপ্ত। 'চন্দ্রশেখর' কল্পনাপ্রধান হলেও, বলয়গ্রাসের মতো এর মধ্যবিন্দুকে স্পর্শ করেছে ইতিহাস এবং সে কারণে 'চন্দ্রশেখর' বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস না হয়ে ঐতিহাসিক রোমান্স রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

'চন্দ্রশেখর' ঐতিহাসিক উপন্যাস না হলেও ইতিহাসের একটি বিশেষ ভূমিকা এতে রয়েছে। কারণ ইতিহাসের প্রতি বিশেষ করে বাঙালীর ইতিহাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। বঙ্গদর্শনের প্রথম দিকের কতকগুলি সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই

ইতিহাস জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তিনি এও জানতেন যে, 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্থান ইতিহাসের শ্রেণীতে নহে, সাহিত্যেব শ্রেণীতে।" তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন।

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করে সেই প্রেক্ষিতে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের বিচারে প্রয়াসী হওয়া যেতে পারে। এই শ্রেণীর উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল— (ক) ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান প্রধান ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করবে—যার প্রতি পাঠকের বিশ্বাস পূর্বসঞ্জাত। (খ) প্রধান প্রধান চরিত্র হবে ইতিহাস সমর্থিত, কেননা ইতিহাস এখানে নিয়ন্ত্রীশক্তি। (গ) কাল্পনিক চরিত্র ও কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটবে কাহিনি বয়নেব ক্ষেত্রে—তবে তার মধ্যে ঐতিহাসিক সম্ভাবনা থাকবে। (ঘ) ইতিহাসের প্রবল বেগ মানবজীবনেব মধ্যে প্রবল গতিসঞ্চার করবে। (ঙ) যে যুগের কাহিনি গ্রহণ করা হবে সে যুগের tone and temperament of the age প্রকাশিত হবে। (চ) ভাবে ও ভাষায় নির্দিষ্ট দেশকালের সুব ও ধ্বনি শোনা যাবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি 'চন্দ্রশেখব' উপন্যাসেব মধ্যে কতখানি বয়েছে, তা দেখা যেতে পারে।

প্রথমেই এ বিষয়ে লেখকেব জবানবন্দী গ্রহণ করা যেতে পারে। ১৮৭৫-এ প্রকাশিত চন্দ্রশেখর গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, "ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাব উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচব প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গলার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 'সয়ের মতাক্ষরীণ' নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে; ঐতিহাসিক বিষয়ে কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়াছি।"

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইতিহাসেব যে পটভূমি গ্রহণ করা হয়েছে, তা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের বাংলাদেশেব। সিবাজদ্দৌলার পতনের পর তখন বাংলায় ইংরেজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। কিন্তু তখনো নামে মাত্র বাংলা, বিহাব, উড়িষ্যার নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন মীরকাসেম। মীরকাসেমের সঙ্গে ইংরেজদের সদ্ভাব না থাকায় মাঝে মাঝে সংঘর্য চলছিল। এই সংঘর্ষেরই পরিণতিতে মীরকাসেমের পতন ও এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা। সংক্ষেপে এই হল উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি। এই পটভূমি উপন্যাসের মূল আখ্যানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত হয়নি।

এবার আসা যেতে পারে, উপন্যাসে কিভাবে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন ইতিহাস প্রসঙ্গকে কতখানি ব্যবহার করেছেন, সেই আলোচনায়। 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, একমাত্র 'রাজসিংহ' বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত সব উপন্যাসই বাংলার ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত। এসব উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগপর্যায়ের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। রচনার কালক্রমে ইতিহাসের কালক্রম রক্ষিত হয়নি এবং তা রক্ষা করাও সম্ভবপর ছিল না। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ছিল পরাধীন

বাংলার ইতিহাসের মধ্যে। যেমন, তুর্কিবিজয়ের অব্যবহিত পরের ইতিহাস 'মৃণালিনী'তে, পাঠানের পরাজয় ও মোগলের অভ্যুদয়কালের পট 'দুর্গেশনন্দিনী'তে, মোগল শাসনের আর এক অধ্যায় 'কপালকুণ্ডলা'তে, 'সীতারাম'-এ অস্তগমনোন্মুখ মোগল শাসনের স্বাধীনতাকামী বঙ্গীয় ভূস্বামীর কাহিনি, 'আনন্দমঠ'-এ ইংরেজদের হাতে মুসলমান শাসনের হস্তান্তরের ক্রান্তিকালের ইতিহাস, 'দেবী চৌধুরাণী'-তে ইংরেজ শাসনকালে স্বদেশী ডাকাতদের আলেখ্য এবং 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে ইংরেজ কোম্পানির অধ্যক্ষতায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাসেমের বৃত্তান্ত।

ইতিহাসের উপাদানগুলি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে কতখানি রয়েছে এবার সে আলোচনায় প্রয়াসী হওয়া যেতে পারে।

(১) ইংরেজদের সঙ্গে উদয়নালার যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

(২) গুরগণ খাঁ (ইতিহাসের গরগিন খাঁ), আমিয়ট (শুল্ক ব্যবস্থায় ইংরেজের সঙ্গে বাঙালি ব্যবসায়ীদের সমতা বিধানের জন্য কলকাতা কাউন্সিল আমিয়ট ও হে নামে দুজন সাহেবকে মুঙ্গেরে নবাবের কাছে পাঠিয়েছিলেন), তকি খাঁ, শেঠভ্রাতৃদ্বয়, ওয়ারেন হেস্টিংস, আমিয়ট, মীরকাসেমের সুইস বা জার্মান সৈনাধ্যক্ষ সমরু (ডাইস্ সম্বর) প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্র। উপন্যাসে গুরগণ খাঁর যে ব্যক্তিগত কাহিনি আছে, 'তিনি জাতিতে আরমানি, ইস্পাহান তাহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে তিনি পূর্বে বস্ত্র বিক্রেতা ছিলেন'— তাও গোলাম হোসেনের সয়ের মতাক্ষরীণ মতে সত্য।

(৩) মীরকাসেমের জ্যোতিষচর্চা মতাক্ষরীণ মতে সত্য। এমনকি পরাজিত নবাবের ফকিরী গ্রহণের কথাও ইতিহাসে উল্লিখিত।

(৪) উপন্যাসের ইতিহাস অংশের নায়ক 'সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীরকাসেম খাঁ, বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্র চিত্রণে আংশিকভাবে ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। গোলাম হোসেনের বিবরণ অনুযায়ী মীরকাসেমের চরিত্র ভাল-মন্দয় মিশ্রিত। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তিনি কখনো কখনো কোম্পানির নির্দেশকে লঙ্ঘন করেছেন। তাই উপন্যাসে নবাবের মুখে শোনা যায়, "ইংরাজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই; সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা' কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর। কেন আমি তাহা কবিব?"— এই উক্তি স্বাধীনতাকামী প্রজানুরঞ্জক দেশপ্রেমী নবাবের উক্তি, যা ইতিহাসের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনস্বপ্নের আলোকপাত। তবে এতে ইতিহাস লঙ্ঘিত হয়নি, কারণ প্রজাদের উপর ইংরেজদের অত্যাচারে নবাব চিন্তিত ছিলেন—তা ইতিহাস সম্মত।

(৫) নবাবী আমলের বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুরির চিত্রও বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচায়ক। কারণ ইতিহাসবিদ্ নিখিলনাথ রায়ের মতে, "পলাশী ও উদয়নালা এই দুই

স্থানেই বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুরী নবাবপক্ষের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল।" (মুর্শিদাবাদ কাহিনি)। কোম্পানির আমলে বাংলার নবাবের সিংহাসন যেন আগুন ও বারুদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংরেজদের স্বার্থলিপ্সা ও জঘন্য স্বেচ্ছাচারিতা এবং দেশীয় শেঠ সেনাপতিদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা নবাবকে স্বস্তিতে থাকতে দিত না। ইতিহাসেও পাই, মীরকাসেম কতকগুলি নৃশংস কাজ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন 'বিকৃত মস্তিষ্ক'। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্যের সুযোগ গ্রহণ কবেছেন। তাই মীরকাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপানে বধ কবিও।"

(৬) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে নবাবী আমলের বাঙালির ঐশ্বর্য, বীরত্ব ও গৌরব-গরিমা এবং সেইসঙ্গে নবাবী আমলে কোম্পানি কর্মচারীদের লুব্ধতা, প্রভুত্ব ও অত্যাচারের স্বরূপ। (ক) উপন্যাসে মুঙ্গেব দুর্গের অন্তঃপুর চিত্রাঙ্কনে 'রজত দীপে গন্ধ তৈলে জ্বালিত আলোক'. 'সুরঞ্জিত হর্ম্যতল', 'সুকোমল গালিচা', 'সুবর্ণ নির্মিত কলমদান', শেঠ ভাইদের প্রশস্ত অট্টালিকায় 'শ্বেতমর্মর বিন্যাস শীতল মণ্ডপ', 'শেঠদিগের কণ্ঠ বিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তাহার' বাংলার সমকালীন আভিজাত্যের কিছু নিদর্শন। (খ) প্রতাপের মাধ্যমে বাঙালির বীর্যবত্তার কিছু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'প্রতাপ জমিদার, দস্যুদলের নেতা, তাঁর সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে—দস্যু আছে'। এই লাঠিয়াল ও দস্যুদের প্রতাপে নবাব তটস্থ। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'বাঙ্গালির বাহুবল'-এর যে কথা লিখেছেন তা-ই প্রতাপের মধ্যে লক্ষ করা যায়। (গ) বাঙালির জ্ঞানতপস্যার নিদর্শন হলেন চন্দ্রশেখর।

(৭) পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবী আমলে নবাবেরা যে 'নামে মাত্র নবাব' বঙ্কিমচন্দ্র সেই ঐতিহাসিক সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। মীরকাসেমের উক্তিতে, 'কর্তা ইংরেজ ব্যাপারী তাহাদের গোলাম মীরকাসেম'। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ চরিত্রের স্বজাতিপ্রীতি, দাম্ভিকতা, সাহসিকতা উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে, যা ইতিহাস স্বীকৃত। যেমন, জনসন্ বলেছেন 'ভারতবর্ষীয় কপাট ইংরেজী লাথিতে টিকিবে না'। এটি অভিমানী ইংরেজের দম্ভোক্তি। তৃতীয়ত, মুর্শিদাবাদে আমিয়টের নৌকা আটক হলে 'স্থির প্রতিজ্ঞ ইংরেজরা ভীত হইল না'। তিনজন ইংরেজ অকুতোভয়ে সেই অগণিত যবনগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল,— ভীরুর মতো আত্মসমর্পণ না করে বীরের মতো মৃত্যুর মুখোমুখি হল। তাই আমিয়টের উক্তি, 'আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে। চতুর্থত, ইংরেজরা যে দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন, ইতিহাসের এই সত্যের প্রমাণ মেলে রমানন্দ স্বামীর উক্তিতে, "এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান, বলবান এবং কৌশলময় .... বোধ হয় ইহারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে"।

(৮) লরেন্স ফষ্টরের চরিত্র অনৈতিহাসিক হলেও ইতিহাসের পদধ্বনি এই চরিত্রে শোনা যায়। কেননা সমকালীন ইংরেজদের লোভ-লালসা, স্বেচ্ছাচার ও ক্ষুদ্রতাকে ফষ্টরের মধ্যে

বঙ্কিমচন্দ্র রূপ দিয়েছেন। তাই ফষ্টর চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত চরিত্র হলেও তা বাস্তবকে লঙ্ঘন করেনি। কেননা পলাশী যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল যে কোন উপায়ে এদেশের সম্পদ আত্মসাৎ করা। লরেন্স ফষ্টর এই ধরনের এক চরিত্র। দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা রাজ্যশাসনের জন্য দেশে যেভাবে কুঠি স্থাপন করত সেখানে তাদের লোভ-লালসার স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত হত। ঐতিহাসিক এই সত্যকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র ফষ্টরের চরিত্র এঁকেছেন। রৌপ্য ও রূপের নেশায় তারা গ্রামে যে যেত তার প্রমাণ মেলে পুরন্দরপুর গ্রামের কুঠিয়াল লরেন্স ফষ্টর বেদগ্রামে ভীমা পুষ্করিনীর তীরে গিয়ে স্নানরতা শৈবলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তৃতীয় ইংরেজ কর্মচারীদের নৈতিক স্খলন সম্বন্ধে ইংরেজ সরকার অবহিত হলে তাদের বদলির নির্দেশ দিতেন—এই ঐতিহাসিক সত্যের উপর ভিত্তি করে লরেন্স ফষ্টরের বদলির প্রসঙ্গ উপন্যাসে এসেছে। বদলির আগে তাই সে শৈবলিনীকে অপহরণের চক্রান্ত করেছে। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ‘‘এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য পারিলাম না নিরস্ত হওয়াই ভাল এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্যে অধর্ম আছে, অতএব অকর্তব্য। ...... লরেন্স ফষ্টর এই প্রকৃতির লোক।’’

তবে লরেন্স ফষ্টর অনৈতিহাসিক চরিত্র হলেও এই উপন্যাসে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তার-ই কৌশলে শৈবলিনী অপহৃতা হয়েছে, চন্দ্রশেখরের মতো জ্ঞানতপস্বী গ্রন্থরাশিতে অগ্নিসংযোগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ফষ্টরকে লক্ষ্য করে প্রতাপ ইংরেজ জাতিকে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ‘চন্দ্রশেখর’-কে ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপে রূপ দেবার চেষ্টা করেননি। তবে ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহারে নিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন এবং যুগের মূল সুরটি অনেকটা ফুটিয়ে তুলে কিছু ইতিহাস রসও পরিবেশন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেহেতু ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে বসেননি তাই উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে লেখক ঐতিহাসিক রণরঙ্গমুখর মুহূর্তকে আছড়ে দিয়েছেন ক্ষুদ্র পল্লী বেদগ্রামের এক সাধারণ পরিবারের উপর। ইতিহাসের বিরাট ব্যাপ্ত আখ্যায়িকা ও সমাজজীবনের ক্ষুদ্র কাহিনিকে মিলিত করেছেন যথাক্রমে চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনী-দলনী-কুলসম নামক কল্পিত চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে।

উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশে প্রথমে উপন্যাস অংশের প্রাধান্য দেখতে পাই। তবে উপক্রমণিকায় প্রথম পরিচ্ছেদে ইতিহাস অংশের উল্লেখ না থাকলেও সামান্য এক সহজ উক্তিতে ইতিহাস ও উপন্যাস অংশ একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। সেই উক্তিটি হল—‘স্থির হইল না কে মালা পরিবে’। এই স্থির না হওয়া, ইতিহাস অংশের মীরকাসেম ও গুরগণের ক্ষেত্রে সত্য। সত্য নবাব ও কোম্পানি বাহিনীর ক্ষেত্রে এবং সমান সত্য চন্দ্রশেখর প্রতাপ

ও শৈবলিনীর ক্ষেত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস অংশে প্রথম ইতিহাসের যোগসূত্র স্থাপন করেন জ্যোতিষ গণনার সূত্রে চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে। এই চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে প্রতাপের সঙ্গে ইতিহাস অংশের যোগ। রাজনৈতিক ঘটনার দুর্দান্ত প্রভাবে মীরকাসেমের বেগম দলনী যেমন ছিটকে পড়েছে চন্দ্রশেখর বৃত্তে তেমনি চন্দ্রশেখর গৃহিণী শৈবলিনী যুক্ত হয়েছে মীরকাসেমের প্রাসাদে অর্থাৎ ইতিহাস অংশে কিন্তু এই যোগাযোগে চারিত্রিক নিয়তিই যেন এক্ষেত্রে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণশক্তিকে পরাভূত করেছে। ইতিহাস অংশ এবং উপন্যাস অংশ সমান্তরাল গতিতে এই উপন্যাসে এগিয়ে চলেছে। রাজসিংহ উপন্যাসের মতো রণরঙ্গ মুখর ইতিহাসের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনি এখানে অনুপস্থিত।

এই প্রসঙ্গে উপন্যাসে ইতিহাসের সামান্য বিচ্যুতিও আলোচনার প্রয়োজন। দলনী কাহিনি ইতিহাসের নয়, উপন্যাসের বস্তু। কিন্তু তকি খাঁর কাহিনি ইতিহাসের সামগ্রী। উপন্যাসে তকি খাঁর অবিশ্বস্ততার কাহিনি ইতিহাসের সত্যকে লঙ্ঘন করেছে। ইতিহাসে আছে, তকি খাঁ বীর বিশ্বস্ত ও কর্মনিষ্ঠ। ইতিহাসের সত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "দুঃখের বিষয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তকি খাঁয়ের একটি জঘন্য চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক ও অনৈতিহাসিক।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, নবাবী আমল)।

এ ধরনের দু-একটি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন ইতিহাসের পটকে বিকৃত করেননি। অন্যদিকে এই উপন্যাসের কাহিনি যেহেতু ইতিহাসের নয়, তাই ইতিহাস এখানে নিয়ন্ত্রী শক্তি রূপে কাজ করেনি। সেক্ষেত্রে অদৃশ্য নিয়তি বা চারিত্রিক নিয়তিই উপন্যাসে বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের পটভূমিকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন এই কারণে যে, বিগত যুগের গৌরবোজ্জ্বল বাঙালি চরিত্রকে আধুনিক বাঙালির সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরা। সুগভীর প্রেম-প্রীতি ও আদর্শবোধকে সামনে রেখে ঐতিহাসিক ভিত্তির সাহায্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব এই উপন্যাসে প্রধান প্রধান চরিত্রে বাস্তবের রঙ ধরাতে সমর্থ হয়েছেন। ঐতিহাসিক ভিত্তির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছে প্রতাপের জন্য। শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রতাপকে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধের। শুধু তাই নয়, এই উপন্যাসে প্রধান প্রধান পাত্র-পাত্রীর আত্মবিকাশে ইতিহাসের গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। তাই তো এক রাজনৈতিক তথা ঐতিহাসিক আলোড়ন সত্ত্বেও বাংলার শান্ত সুন্দর জীবনযাত্রার জন্য নায়িকা শৈবলিনী শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে ফিরে এসেছে নিভৃত পল্লীর শান্তিময় গৃহাশ্রমের মধ্যে। আর এখানেই ইতিহাস শেষ পর্যন্ত রোমান্সে সমাপ্ত হওয়ায় উপন্যাসটি ঐতিহাসিক উপন্যাস না হয়ে ঐতিহাসিক রোমান্স রূপে পরিগণিত হয়েছে।

দশ

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের গঠনকৌশল ঃ কাহিনি ও উপকাহিনি

মানবদেহের গঠনপ্রকৃতি বা একটি গাছের শাখা-প্রশাখার মতোই উপন্যাসের কাহিনি ও উপকাহিনির সন্নিবেশ। মানবদেহের অঙ্গ গঠনের পূর্ণতা নির্ভর করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কুশলী যোজনায়, প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে প্রতিটি অঙ্গের সুসঙ্গত সামঞ্জস্যে। সমতা ও ঐক্য এবং উপাদানগুলির সুগভীর সখ্যই নির্মাণ সৌন্দর্যের ভিত্তি। মানবজীবনের ঘটনাগুলিকে উপন্যাসের ছকে ফেলে গ্রন্থিবদ্ধ করতে হয় ঔপন্যাসিককে। উপন্যাসের প্লটে থাকে কার্যকারণ-সম্পর্কিত ঘটনারাজি, আর গল্প হল ঘটনার সহজ বিন্যাস। ই.এম. ফস্টার-এর মতে—গল্প চলে সময়ের রাস্তায়, পরিচিত থেকে অপরিচয়ের রহস্যে, ঘটনা থেকে নতুনতর ঘটনায়। অন্যদিকে প্লট চলে কার্যকারণের অনিবার্যতার পথে। মনে রাখতে হবে, সার্থক প্লট শিল্পের দিক থেকে সংহত সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চায়। এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে কাহিনি-উপকাহিনির যোজনা শিল্পসম্মত। কাহিনিবয়নে ও ঘটনাবিন্যাসে এর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পভাবনার স্বাক্ষর রয়েছে।

W. H. Hudson প্লটের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "The Plot of a novel may be simple or compound, that is it may be composed of one story only, or of two or more stories in combination, and the low of unity requires that in a compound plot the parts should be wrought together into a single whole." ('An Introduction to the study of Literature') চন্দ্রশেখরের উপন্যাসের কাহিনি জটিল—একটি কাহিনি (প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর) এবং অন্যটি উপকাহিনি (মীরকাসেম-দলনী-গুরগণ খাঁ), একটি কাল্পনিক ও অন্যটি ঐতিহাসিক।

উপন্যাসের কাহিনিবিন্যাসে উপকাহিনির গুরুত্ব যথেষ্ট। উপকাহিনি যোজনার পেছনে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য হল—(১) উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব এক জীবনদর্শন বা জীবনভাবনা থাকে। সেই জীবনভাবনাকে স্পষ্ট রূপ দেবার জন্য মূল কাহিনির অনুষঙ্গে উপকাহিনির প্রয়োজন দেখা দেয়। (২) রোমান্স সৃষ্টির জন্য ইতিহাসের অতীতচারিতাকে তুলে ধরতে উপকাহিনির প্রয়োজন হতে পারে। (৩) মূল কাহিনিকে পরিপুষ্ট করার জন্য উপকাহিনির গুরুত্ব থাকে। (৪) মূল কাহিনিতে একঘেয়েমি দূর করার জন্য এবং পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য উপকাহিনির প্রয়োজন আছে। (৫) বৈপরীত্য সৃষ্টি করে মূল কাহিনিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য উপকাহিনির গুরুত্ব অপরিসীম। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে কাহিনি ও উপকাহিনির বিন্যাস উপকাহিনি যোজনার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান।

উপন্যাসের ত্রিভুজপ্রণয়ের গঠনটি খুব সরল। ঘরে এবং চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর চিত্ত নেই। কিন্তু প্রতাপ বিষয়ক হৃদয়োত্তাপও সম্পূর্ণ গহনচারী। এই অবস্থায় ফষ্টরের ভূমিকা দ্বারা বঙ্কিম দুটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন। পারিবারিক জীবনের সমস্যাকে ইতিহাসের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া এবং শৈবলিনীর নিস্তরঙ্গ বধূ জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে ছাইচাপা স্ফুলিঙ্গকে দাবদাহে জ্বালিয়ে তোলা। ফষ্টর প্রবলবেগে বাইরে থেকে আপত্তি না করলে শৈবলিনী ধীরে ধীরে একেবারে নিভে যেত। অথচ ফষ্টরের কাজ ফষ্টরেরই, তা শৈবলিনী চরিত্রের প্রতিক্রিয়ায় নয়। ফষ্টরের কর্ম মূলত বহিরাগত কিন্তু পরবর্তী পর্যায থেকে পর্যায়ান্তরে চরিত্রের অন্তর উদ্ঘাটনের কাবণ হিসেবে তা অপরিহার্য। বঙ্কিম বাইরের ঘটনার গুরুত্বকে স্বীকার করেন এবং তাকে নানা ভাবে অন্তব ঐশ্বর্য কাহিনী বয়নের প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেন—এটা তাঁর বিশেষ পদ্ধতিগুলির অন্যতম।

শৈবলিনীর প্রণয় কাহিনীতে ঘটনাবর্তের সংখ্যা বেশি নয়। যদিও সেগুলি অতি তীব্র। যেমন, ফষ্টর কর্তৃক শৈবলিনী হরণ, সুন্দরীর দেওয়া সুযোগ সত্ত্বেও তার পলায়নে অস্বীকৃতি, প্রতাপ কর্তৃক শৈবলিনী উদ্ধার, প্রতাপের বন্দীত্ব এবং শৈবলিনীর বুদ্ধিতে প্রতাপের মুক্তি, শৈবলিনীর উন্মাদ রোগ এবং যোগবলে রোগোপশম। [illegible] প্রতাপ-শৈবলিনীর একান্তে সাক্ষাৎ ও প্রলাপ—মুঙ্গেরে প্রতাপের গৃহে, গঙ্গার বুকে সাঁতার দেওয়া, উদয় নালার যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া। এগুলি ঠিক ঘটনা নয়, কিন্তু খুব বড় মাপের উত্তেজিত হৃদয়াবেগের প্রকাশ। এই অল্প কয়েকটি প্রসঙ্গের সাহায্যে কাহিনির আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতির পূর্ণরূপটি গড়ে তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। শৈবলিনীর প্রেম, প্রেমিককর্তৃক প্রত্যাখ্যান, পাপবোধ, উন্মাদরোগ, রোগশান্তি—গল্পটি এই সোজাপথে বিকশিত হয়েছে। এই সরল বৃত্ত গঠনে ঔপন্যাসিক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্যে তাকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। তবে তা প্লটের আদ্য সারল্য ভাঙতে পারেনি। ইতিহাসের সংযোগে এবং উপকাহিনির সম্পর্কে একে জটিল করে তুলবার চেষ্টাও ফলবতী হয়নি।

ফষ্টর কর্তৃক অপহরণের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আকস্মিক ঘটনা প্রতাপের চেষ্টায় তার উদ্ধার লাভ। এ জাতীয় আকস্মিক ঘটনার উপরে ঔপন্যাসিকের অতিনির্ভরশীলতা সাধারণ রোমান্সের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু চন্দ্রশেখরের একদিকে রোমান্স অন্যদিকে মনস্তত্ত্বের সূত্র। এই দুই কোটির দুই পদ্ধতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অনেক সময়ে লেখকের সম্ভব হয়নি। আবার প্রতাপের বাড়ীতে যখন শৈবলিনী প্রত্যাখ্যাত হল তখনই তাকে ভাবনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে নিক্ষেপ করেছেন লেখক। আবার প্রণয়ীকে উদ্ধারে উদ্দীপ্ত কর্মচাঞ্চল্যে সে ভাবনা ভুলেছে। কিন্তু গঙ্গার বুকে শপথ করার পরে সে গভীর . চিন্তা ও পাপবোধে নিমজ্জিত। মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনি গঠনের উদ্দেশ্যে বিন্যাসের এই রীতি লেখক অনুসরণ করেছেন। সন্দেহ নেই অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক কাহিনির পরবর্তী রবীন্দ্র নিদর্শনের তুলনায় এই কৌশল অনেকটা প্রাথমিক স্তরের।

যাই হোক, কাহিনি বিকাশের পথে এর প্রধান দুর্বলতা লক্ষণীয়। (১) শৈবলিনীর নরকদর্শন ও প্রায়শ্চিত্তের অংশটির অতিবিস্তার যাতে তাকে স্বাভাবিক আভ্যন্তর পাপভীতির ফলমাত্র মনে হয় না। নীতিবোধের আরোপ বলে ধারণা জন্মে। (২) উপন্যাসের শেষভাগে শৈবলিনীর দৈহিক সতীত্ব প্রমাণের জন্য লেখকের ক্লিষ্ট চেষ্টা অনেকটা অবান্তর কাহিনি বিস্তার ঘটিয়েছে। ফষ্টরকে অকারণে গল্পের গায়ে জড়িয়ে রাখতে হয়েছে। সেইসঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী প্রায়শ্চিত্তে শৈবলিনীর প্রবেশ ও উন্মাদ রোগগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রণয়-সমস্যার শক্তি নিঃশেষিত। অর্থাৎ চতুর্থ খণ্ডে প্রবেশ করেই সমস্যা শেষ হয়েছে, কিন্তু আরও দীর্ঘকাল প্রায় তিনটি খণ্ড জুড়ে কাহিনি বিস্তার চলেছে। ত্রিভুজের অপর বিন্দু চন্দ্রশেখরের পরিণতি দেখানোই লেখকের শেষ উদ্দেশ্য হয়ে দেখা দিল। তার জন্য আবশ্যক শৈবলিনীর অন্তর শুদ্ধি, রোগমুক্তি, দৈহিক পবিত্রতার নিশ্চিত প্রমাণ। দীর্ঘস্থান জুড়ে লেখক সেই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। অর্থাৎ প্লটকে অভিপ্রায় অনুযায়ী পরিণতি দিতে হয়েছে—প্লট ও উদ্দেশ্য অঙ্গাঙ্গী হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসের শেষে আবার বঙ্কিম রীতির সেই বিশিষ্টতা আকস্মিক বিস্ফোরণের ঘনীভূত নাট্যরস। শৈবলিনীর দীর্ঘ প্রায়শ্চিত্ত ও যোগচিকিৎসার পরেও নিজের হৃদয়কে বশে রাখা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। এই অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি উপন্যাসের নৈতিক মেরুদণ্ডকে চূড়ান্ত আঘাত দিয়েছে। প্লট গঠনে লেখকের আত্মিক সংকটের নিদর্শন হিসেবে আসলে এখানে গণ্য করা উচিত।

আবার দলনী কাহিনি উপন্যাসের উপকাহিনি। উপক্রমণিকা সহ মোট চল্লিশ পরিচ্ছেদে বিধৃত উপন্যাসের পঁচিশটিতে শৈবলিনী ও নয়টিতে দলনীর কথা। ছটি পরিচ্ছেদে শৈবলিনী ও দলনীর দুজনের কাহিনিই আছে। এ অংশগুলি দুই কাহিনির প্রত্যক্ষ যোগসূত্র। এ যোগ বহিরঙ্গ, একেবারেই আভ্যন্তর নয়। দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে মূল কাহিনি চন্দ্রশেখর দলনীকে প্রতাপের ঘরে স্থান দিয়েছে। এর ফলে সপ্তম পরিচ্ছেদে দলনী-শৈবলিনী ভ্রমে বন্দী হয়েছে। অধ্যায়টি মূলত প্রতাপের বন্দী হওয়ার কাহিনি। স্থানগত ঐক্য, এদের কাছে এনেছে। এই দুটি অধ্যায় দলনীর কাহিনিবৃত্তের পক্ষেও প্রয়োজনীয়। সপ্তম পরিচ্ছেদ শৈবলিনীর কাহিনির পক্ষেও অপরিহার্য। তবুও এদের মধ্যে কোন অঙ্গাঙ্গী যোগ নেই। ব্যাপারগুলি আকস্মিকের মালা। চিত্তবৃত্তিগত যোগ দূরের কথা, কার্যকারণ সম্পর্কও দুয়ের মধ্যে নেই।

আসলে দুই কাহিনির যোগাযোগ তৈরিতে ছটি অধ্যায়ে যে নৈকট্য ঘটানো হয়েছে তা একেবারে ব্যর্থ। একসঙ্গে বন্দী হলেও দলনী সম্পর্কে প্রতাপ সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না। শৈবলিনী দলনীর দেখা হয়নি। নবাবের সঙ্গে শৈবলিনীর সাক্ষাতের বিবরণ কৃত্রিম। লেখক এই দুই কাহিনিকে জড়িয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ঐ একই উদ্দেশ্যে দলনীর

ভাগ্যগণনা বা সতীত্ব প্রমাণের জন্য চন্দ্রশেখরকে বেদগ্রাম থেকে কখনও মুর্শিদাবাদে, কখনও উদয়নালায় ডেকে আনা হয়েছে; এর কোনো অপরিহার্যতা ছিল না। চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপের প্রণয়ঘটিত মূল সমস্যার সঙ্গে দলনীর কোনো বন্ধন নেই। উক্ত পরিণয় ত্রিভুজে ভিতরের কোনো বিন্দু সে হয়ে উঠতে পারেনি। 'কপালকুণ্ডলা'য় মতি মূল কাহিনির তৃতীয় বিন্দু এবং উপকাহিনির কেন্দ্র। 'বিষবৃক্ষে'র হীরা মূল প্রণয় ত্রিভুজের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু ঈর্ষায় ও প্রতিহিংসায় সে মূল কাহিনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখানে উপকাহিনি আসলে একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র কাহিনি। ঘটনাচক্রে শৈবলিনীর জীবন ও সমস্যার সঙ্গে তার কতকগুলি স্থানে যোগাযোগ ঘটেছে এই মাত্র। দেখা যাচ্ছে উপন্যাসে উপকাহিনি নাটকের ন্যায় মূল বৃত্তান্তে উদ্ভূত ও প্রত্যাবৃত্ত হবে, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে বদ্ধ হবে—এরূপ নীতি তিনি সর্বত্র পছন্দ করেননি।

আলোচ্য উপন্যাসে একটা ঐতিহাসিক কালসীমা—যুগগত বিপর্যয় এই দুই কাহিনিকে বাইরে থেকে বদ্ধ করেছে এবং ভিতর থেকে মানুষের প্রেমের শক্তি সৌন্দর্য ও যন্ত্রণাভোগের মিল-অমিলে মিশ্রিত সুর দুটি কাহিনিকে ঘিরে বেজে উঠেছে। কিন্তু বলতেই হবে এর ফলে উপন্যাসের প্লটে কতটা বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি এসেছে, ততটা জটিলতা আসেনি। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই ত্রুটির কথা এভাবে নির্দেশ করেছেন, "চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ঘটনা বিন্যাসের নানা কৌশলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু ঘটনার আকস্মিক সামঞ্জস্যের প্রতি জোর দেওয়ায় শেষের দিকে আখ্যায়িকার গতি যেন মন্থর হইয়া আসিয়াছে। দলনী যে নিষ্পাপ এবং শৈবলিনী যে ফষ্টরের উপপত্নী নহে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার সকলকে একত্র করিয়াছেন। .... যে উপন্যাসে শুধু কাহিনিকে আশ্রয় করে তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থশেষে যে রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে তাহা পাঠকের নিকট হইতেও গোপন রহিবে। কিন্তু এই উপন্যাসে সেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। পাঠকের অজ্ঞাত কিছুই ছিল না; নবাব, রমানন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখরের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে যাইয়া গ্রন্থকার পাঠককে ভুলিয়া গিয়াছেন।"

এগার

'চন্দ্রশেখর' ঃ গঙ্গার ভূমিকা

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে তিস্তা নদীর ভূমিকা এবং 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে গঙ্গা নদীর ভূমিকা কাহিনি বয়নে, চরিত্র চিত্রণে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী 'বঙ্কিম-সরণী' গ্রন্থে তাই লিখেছেন, ''চন্দ্রশেখর গঙ্গাপ্রবাহিনী কাহিনী। গঙ্গার ধাতুতে তার কাব্যশরীর গঠিত ও পুষ্ট, গঙ্গাকে বাদ দিলে সূত্রহীন পুষ্পের মতো অসংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো আলগা হয়ে পড়ে যায়। চন্দ্রশেখরে গঙ্গাই কাহিনী, কাহিনীই গঙ্গা''। উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা গঙ্গাতীরেই কাহিনির সূচনা, গঙ্গা প্রবাহে কাহিনির পুষ্টি, গঙ্গাগর্ভে কাহিনির পরিণতি, প্রতাপ-শৈবলিনী কাহিনি সম্পর্কে এই উক্তি সত্য। দলনী বেগমের কাহিনির পরিণাম নির্ধারিত হয়েছে গঙ্গা-প্রবাহে। উপন্যাসের অকুস্থল বেদগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের গঙ্গাতীরেই অবস্থিত; অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে গঙ্গাগর্ভে। তাই উপন্যাসে গঙ্গা নদীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে।

'কপালকুণ্ডলা' যেমন 'নিশীথ-রাত্রির কাব্য' তেমনি 'চন্দ্রশেখর' 'গঙ্গাপ্রবাহিনী কাহিনী'। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে যেমন রাত্রির একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে, উপন্যাসের বেশিরভাগ ঘটনাগুলি যেমন রাত্রিতে ঘটেছে, তেমনি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের কাহিনি এবং মীরকাসেম-দলনী-ফষ্টরের কাহিনির বেশির ভাগটাই গঙ্গাবক্ষে সংঘটিত হয়েছে। গঙ্গার গতিময়তা ও সৌন্দর্যকে কাহিনি সৃষ্টিতে ও চরিত্রের মনস্তত্ত্ব রূপায়ণে ঔপন্যাসিক কাজে লাগিয়েছেন। বলা বাহুল্য গঙ্গা নদী উপন্যাসে কখনো আলম্বন বিভাব, কখনো উদ্দীপন বিভাব হিসাবে কাজ করেছে।

গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশের প্রথম পরিচ্ছেদের ('বালক বালিকা') প্রথম লাইনেই রয়েছে গঙ্গার উল্লেখ—''ভাগীরথীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্যজলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল।'' এরপর ঐ পরিচ্ছেদে নৌকা গণনার কথা এসেছে, তাও গঙ্গাবক্ষে। এর মধ্যে রয়েছে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত। উপক্রমণিকা অংশের যাবতীয় পরিচ্ছেদে গঙ্গার প্রসঙ্গ এসেছে। প্রতাপ-শৈবলিনী পরামর্শ করে গঙ্গাস্নানে গেল। তারপর ''গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল''। প্রতাপ বলিল—''আয় শৈবলিনী! সাঁতার দিই।'' এই সাঁতার আগামী দিনে জীবন নদীতে যে সাঁতার দিতে হবে, তার-ই ইঙ্গিত। এমনকি দুই কিশোর-কিশোরীর রোমান্টিক প্রেমের উচ্ছলতাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য গঙ্গার রূপকেও বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকার রূপ দিয়েছেন—''বর্ষাকালে-কূলে কূলে গঙ্গার জল-জল-দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া উৎক্ষিপ্ত করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল।'' রোমান্স সৃষ্টির ক্ষেত্রে জলের গুরুত্ব বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করতে পারেননি। তাই গঙ্গাকে দুই কিশোর-কিশোরীর যৌবন

জলতরঙ্গের নির্বাধ লীলাচাঞ্চল্য অপরূপ রূপ লাভ করেছে। উপক্রমণিকা অংশের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ('বর মিলিল') নৌকা করে চন্দ্রশেখর যাচ্ছিলেন। তিনি ডুবন্ত প্রতাপকে উদ্ধার করে বাড়িতে রেখে এলেন। এখানেও মূল কাহিনির সঙ্গে এই সূত্রে চন্দ্রশেখর যুক্ত হয়ে গেলেন এবং শৈবলিনীর সঙ্গে বিবাহও হল। সুতরাং উপক্রমণিকা অংশের তিনটি পরিচ্ছেদেই রয়েছে গঙ্গার ভূমিকা—কাহিনি বয়নে ও চরিত্র চিত্রণে।

প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সুন্দরী নাপিতানীর ছদ্মবেশে গঙ্গায় বজরা থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে গঙ্গা-ই দুটি কাহিনির যোগসাধন করল। এর পূর্বে অবশ্য লরেন্স ফষ্টর কর্তৃক অপহৃতা শৈবলিনীর বজরায় গঙ্গায় মুঙ্গের যাত্রা-তেও রয়েছে ঐ নদীর ভূমিকা। গঙ্গার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও শৈবলিনী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এখানে উদঘাটিত হয়েছে। শুধু গঙ্গার প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, শৈবলিনীর অদৃষ্টের চিত্রও চিত্রিত হয়েছে। গঙ্গা এখানে মানবভাগ্যের সূচীপত্র। কারণ ফষ্টরের সঙ্গে শৈবলিনী নৌকা ভাসিয়েছিল প্রতাপকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু নদীর যে এত রূপান্তর, ভাগ্যের যে এত ভাবান্তর, তা শৈবলিনী কেন কেউ-ই জানত না।

দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম পরিচ্ছেদেব নাম-ই হল 'গঙ্গাতীবে'। এখানে প্রতাপ কর্তৃক শৈবলিনী উদ্ধার গঙ্গাবক্ষে সংঘটিত হয়েছে। লেখকের বর্ণনা এইরকম— "আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; নগরমধ্যে আলো জ্বলিতেছে--গঙ্গাকূলে শত শত বৃহত্তরণী-শ্রেণী, অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে--কল কল ববে অনন্তপ্রবাহিনী গঙ্গা ধাবিত হইতেছে।" দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেও রয়েছে গঙ্গার ভূমিকা — 'সেই নৈশ-গঙ্গাবিচারিণী তরণী মধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিল-শৈবলিনী"।

তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নদী ও শৈবলিনী প্রতাপকে উদ্ধার করেছে। প্রতাপকে উদ্ধাবেব জন্য গঙ্গার চরে বসে শৈবলিনীর কান্না। তারপর সুকৌশলে প্রতাপের কাছে যাওয়া, প্রতাপকে মুক্ত করা ও গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই গঙ্গা-ই প্রতাপ-শৈবলিনীকে একত্রিত করেছে। এই অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে গঙ্গা প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনে রোমান্সের পরিবেশ তুলে ধরেছে এবং তার মাধ্যমে চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্তা জাগ্রত হয়েছে।

গঙ্গায় এই সন্তরণ দৃশ্যের মাধ্যমে নায়কের হৃদয়ে স্বভাব-প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির বৈপরীত্য সূচনা করে, স্বভাব প্রকৃতির ছন্দে নিজের জীবনকে মিলিয়ে নেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে। নীল গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দেওয়ার ইচ্ছা প্রতাপের চিত্তকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ করে তুলেছে। এর ফলে শৈবলিনীর চোখে 'তারা সব নিবিয়া গেল', চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীল জল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল।' শেষপর্যন্ত দুজনে 'চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে—'পাপজীবনের ভার' (তির্যক প্রেমের বোঝা) নামিয়ে দিল। কাহিনির গতি অন্য পথে ঘুরে গেল—জল থেকে স্থলে। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত, প্রতাপের আত্মবিসর্জন—এই

দ্বিতীয় সন্তরণ দৃশ্যের-ই পরিণাম। তা যেমন জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য তেমনি তা আদরও বটে। মোহের দিক থেকে দৌবাত্ম্য এবং চিত্তশুদ্ধির দিক থেকে আদর।

চতুর্থ খণ্ডের কাহিনিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গঙ্গার ভূমিকা লক্ষ করা যায়। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রতাপ শৈবলিনীর জন্য চিন্তিত হয়েছেন, রামচরণ ফিরে আসার পর। তাই প্রতাপ শৈবলিনীর খোঁজে ''গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে।'' অর্থাৎ গঙ্গা-ই প্রতাপের মনে শৈবলিনী সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করেছে। চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে নদীর কথা এসেছে। যেমন, ''শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস্--গঙ্গায় প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্।'' এখানে শৈবলিনীর অবচেতন মনের আবিষ্কারে গঙ্গা-র ভূমিকা রয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের তুলনা প্রসঙ্গে শৈবলিনীর মনে সমুদ্র ও গঙ্গার প্রসঙ্গ এসেছে। শৈবলিনী যে প্রতাপকে ভুলে চন্দ্রশেখরকে ভালোবেসেছে তার প্রসঙ্গে নদীর তুলনা এসেছে— ''শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র পোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।''

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে মুর্শিদাবাদে গঙ্গাবক্ষে ইংরেজদের নৌকাগুলির আগমন দিয়ে কাহিনির শুরু। তকি খাঁও প্রহরী নিযুক্ত করলেন যাতে ইংরেজের নৌকা খুলে না যায়। একটি নৌকায় দলনী ও কুলসম ছিলেন। তাঁরা মুক্তির প্রতীক্ষায় আকুল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও গঙ্গায় ফষ্টরের নৌকার প্রসঙ্গ এসেছে। যখন রামচরণের গুলি খেয়ে লরেন্স ফষ্টর গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তার কথা এসেছে। আবার, ফষ্টর কিভাবে সুস্থ হয়ে দ্রুত নৌকা চালিয়ে বিপদমুক্ত হতে চেয়েছিল, সেই কাহিনি স্থান পেয়েছে। ফষ্টরের মানসিক চিত্তচাঞ্চল্যের খবর এখানে প্রতিফলিত হয়েছে—'ফষ্টর দ্রুতবেগে কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, সৈদাবাদ, রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। যে কোন নৌকা পশ্চাতে আইসে, মনে করে, যবনের নৌকা আসিতেছে। দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কোন মতেই সঙ্গ ছাড়িল না।'' এই পরিচ্ছেদেই নৌকা দলনীকে ত্যাগ করে চলে গেল। ফলে দলনীর জীবনে অশুভ পরিণামের ইঙ্গিত দেখা দিল।

ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে গঙ্গার প্রসঙ্গ এসেছে পূর্ব ঘটনা ও ভাবী ঘটনার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য। রমানন্দ স্বামী গঙ্গাতীরে গিয়ে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পেলেন। চন্দ্রশেখরও নৌকায় বাড়ি ফিরে এলেন। সপ্তম পরিচ্ছেদে ফষ্টরের উক্তিতে শৈবলিনী প্রসঙ্গ এসেছে, যেখানে গঙ্গার কথা আছে। শৈবলিনী ফষ্টরের নৌকায় কেন ছিল নবাবের জিজ্ঞাসার উত্তরে ফষ্টর বলেছে ''আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে হরণ

করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে; সে আমার শত্রু।''

সুতরাং 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কাহিনি বয়নে গঙ্গার পাঁচটি তীরবর্তী স্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—কলকাতা, বেদগ্রাম, মুর্শিদাবাদ. মুঙ্গের, পাটনা। এই পাঁচটি স্থান দিয়ে যেমন গঙ্গার ধারা প্রবহমান তেমনি চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কাহিনিও ওই পাঁচটি জায়গাকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ, গঙ্গার প্রবাহ মিশে গেছে। গঙ্গায় যেমন বহু নদী এসে মিলিত হয়েছে তেমনি উপন্যাসের কাহিনি ও উপকাহিনি একসূত্রে মিলিত হয়েছে। গঙ্গার জলে যেমন বহু ঘটনা সংঘটিত হয়, বহু উদ্দেশ্যে মানুষ গঙ্গাকে যেমন ব্যবহার করে তেমনি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে গঙ্গার দ্বারা নানা ধরনের কার্যসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাকে কেন্দ্র করে মূল চরিত্র চন্দ্রশেখব, প্রতাপ ও শৈবলিনীর মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। এজন্য প্রমথ নাথ বিশী ঠিকই লিখেছেন, ''চন্দ্রশেখর কহিনির দুটি মূল অংশে, মীরকাশিম-দলনী প্রেমোপাখ্যানে এবং শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখর প্রেমোপাখ্যানে সামাজিক ও ধর্মীয় দুস্তর ব্যবধান ঘুচে যাওয়া সম্ভব হয়েছে গঙ্গার হস্তক্ষেপে, তরল অথচ সুদৃঢ় ডোরে গঙ্গা এ দুটি কাহিনীকে বেঁধে এক করে দিয়েছে। আবার আকাশের নীলিমা কালিমা ঘনিমা ও ছায়াতপ যেমন গঙ্গার জলতলে প্রতিফলিত হয় তেমনি পাত্র-পাত্রীর হৃদয়ভাবের প্রতিফলনে গঙ্গার রূপেরও ভাবান্তর ঘটেছে।''

ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্যও গঙ্গাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমের যে আদর্শ উপন্যাসে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে গঙ্গার প্রতীকী ব্যঞ্জনা কার্যকরী হয়েছে। আমাদের দেশের প্রচলিত উপকথায় গঙ্গা হল পুণ্যের প্রতীক। গঙ্গা আমাদের সমস্ত পাপ-কলুষ ধুয়ে মুছে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের পরিশুদ্ধির জন্য গঙ্গাকে ব্যবহার করেছেন সুকৌশলে। বিশেষ করে প্রতাপ-শৈবলিনীর মধ্যে রোমান্সের পটভূমি গড়ে তোলার জন্য গঙ্গা নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে গঙ্গার পৌরাণিক মহিমাকে ঔপন্যাসিক গুরুত্ব না দিয়ে পাত্র-পাত্রীর জীবনে তার প্রভাবকে কার্যকারণ পরম্পবায় মেলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বার

আদর্শবাদ, নীতিতত্ত্ব ঃ 'চন্দ্রশেখর'

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র একটি নৈতিক আদর্শকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হবার পর তিনি সেসময়ে নানাভাবে সমাজে ও সাহিত্যে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলম ধরেছিলেন। তাঁর বেশিরভাগ রচনার মধ্যে তাই আদর্শ ও নীতির পরিচয় রয়েছে। এমনকি সমস্যামূলক পারিবারিক, সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে চেয়েছেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য সৃষ্টি ও নীতিশিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এতে একদিকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যপিপাসু কবি-কল্পনার পরিচয় রয়েছে, তেমনি পরিচয় রয়েছে আদর্শবাদের। শৈবলিনীর চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর কবিকল্পনার যেমন চরম স্ফূর্তি, তেমনি রমানন্দ স্বামীর পরিকল্পনায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নৈতিক আদর্শের চরম রূপ। তবে সৌন্দর্যের দাবী অপেক্ষা নীতির দাবীকেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্য দিয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট হল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার পটভূমি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নাগরিক সমাজের প্রতি বেশিরভাগ মানুষ আকৃষ্ট হতে লাগল, শহরে শিল্পায়নের ফলে গ্রাম থেকে মানুষ নগদ টাকার লোভে চলে আসতে লাগল শহরে। নগর কলকাতায় বুদ্ধিজীবীরা এক স্থির আদর্শের সন্ধানে ব্যাপৃত হল। শুরু হল তাদের তীব্র জীবনাগ্রহ। কলকাতার মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে কেন্দ্র করে এই যে জীবনাকাঙ্ক্ষার অঙ্কুরোদগম্ হল, তার অবশ্যম্ভাবী ফল হল ব্যক্তিচিন্তার প্রাধান্য, স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা। প্রথা ও সংস্কারধর্মী আন্দোলন, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও রক্ষণশীলতা, ব্রাহ্ম সমাজের উদারতা ও গোঁড়ামি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাত ও রূপান্তর, প্রগতিশীল ভাবধারার অভাব, সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার প্রাধান্য প্রভৃতি ছিল এই সময়কার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য। এই প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ ও নৈতিকতাবোধ আলোচনা করা যেতে পারে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নীতি ও আদর্শবাদের প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন। অবশ্য তাঁর বেশিরভাগ সাহিত্যকর্মে আদর্শবাদের প্রাধান্য। শিল্পের মুখ চেয়ে তিনি আদর্শকে ক্ষুণ্ন করেননি। নীতির স্বর্ণশৃঙ্খলে তিনি সৌন্দর্যকে বেঁধেছেন। বিশেষত বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল থেকেই এই নীতিবাদ যেন তাঁর জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। বঙ্গদর্শন প্রকাশের সূচনায় এ কথাটি স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছিল, জাতির উন্নতি ও দেশের মঙ্গল বঙ্গদর্শনের কাম্য— "বাঙ্গালা সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপি-কৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক।" 'চিত্তোৎকর্ষ সাধন', 'চিত্ত শুদ্ধি জনন'-কে বঙ্কিমচন্দ্র

সাহিত্যসাধনা থেকে পৃথক করে দেখেননি। উত্তররামচরিতের সমালোচনা প্রসঙ্গে এ কথাটিই তিনি জোর করে বলেছেন, ''কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা''।

বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন, নবযুগের প্রকাশে পুরাতন মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই নীতি অনুসরণের পরিবর্তে নীতিভঙ্গের ঘটনায় তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন পুরাতন নীতিরই প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। তাঁর সৃজনী প্রতিভা সেই নীতিরই বাহক। এখানে তিনি শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস প্রকাশের সময় তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'একা-কে গায় ওই' প্রবন্ধে কমলাকান্তের জবানীতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ''প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। .....মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।''

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এই মনুষ্যপ্রীতির আদর্শই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'পরহিতব্রত'ই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নীতি। এই নীতির উপদেষ্টা সিদ্ধপুরুষ রমানন্দ স্বামী, শ্রোতা শিষ্য চন্দ্রশেখর, প্রযোক্তা প্রতাপ। পরোপকার, পরহিতৈষিতা, পরদুঃখ নিবারণের লক্ষ্যেই উপন্যাসের আদর্শ চরিত্রগুলি কল্পিত। ইতিহাসের পরপীড়ক ওয়ারেন হেস্টিংসও যে বঙ্কিমচন্দ্রের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তারও কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে হেস্টিংসের দয়া ও ন্যায়পরতা।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ তিনি যেমন পুরুষের দুর্বলতা ও নারীর সৌন্দর্য দেখিয়েছেন, 'চন্দ্রশেখর'-এ তেমনি তিনি দেখিয়েছেন নারীর পতন ও পুরুষের অবিচলিত শৌর্য। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, দাম্পত্য সম্পর্ক কত গভীর। সহজে এই সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। এমনকি স্বামী অথবা স্ত্রী একজনের পতনেও সে সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথের যখন পতন ঘটেছিল তখন সূর্যমুখী অসামান্য শৌর্য ও ক্ষমা প্রকাশ করে দাম্পত্য সম্পর্ককে অটুট রেখেছিলেন এবং পরিশেষে উভয়ের মিলনের মধ্যে সেই সম্পর্ক সার্থকতা লাভ করেছিল। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও শৈবলিনীর পতনে চন্দ্রশেখর অদ্ভুত সংযম ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং তার ফলেই তাঁদের মিলনের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য প্রেমের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

শৈবলিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য জীবনে নারীর জীবনাদর্শ কেমন হওয়া উচিত তা দেখাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর লেখনী ধরার কারণ হিসেবে 'বাঙ্গালীর নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন' অংশে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ''যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুয্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্যই লিখিবেন।'' তাই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সামাজিক দিক থেকে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন, শৈবলিনীর মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র

জানতেন হিন্দু নারীর কাছে গার্হস্থ্য ধর্ম অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম আর কিছুই নেই। কেননা, এই গৃহধর্মের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে সামাজিক বন্ধনও শিথিল হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন সামাজিক আদর্শ রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে বিসর্জন দিতে হয়। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর মাধ্যমে দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত প্রেমকে বড় করে তুলতে গিয়ে তার ঘর-সংসার কিভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পুনরায় গার্হস্থ্যধর্মে শৈবলিনীকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠাকেই তিনি বড় করে দেখিয়েছেন। শৈবলিনীর উচ্ছৃঙ্খল প্রেম শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য প্রেমের কাছে পরাজয় স্বীকার করল। বঙ্কিমচন্দ্র যেন সেই বাণীই পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, তাতে শিল্পের ন্যায় রক্ষা হোক বা না হোক।

গার্হস্থ্য প্রেমের একনিষ্ঠতাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য দলনীর পতিভক্তির একনিষ্ঠতাকে লেখক তার এই উপন্যাসে উজাড় করে দেখিয়েছেন। দলনীর পতিভক্তির একাগ্রতা তুলে ধরার জন্য লেখক স্বল্প পরিসরে চরিত্রটির মধ্যে কয়েকটি চিত্র এঁকেছেন। যেমন, (১) গুরগণ খাঁ যখন দলনীকে তার স্বামী মারা গেলে দ্বিতীয় নূরজাহান হতে পারবে এই প্রস্তাব দিয়েছিল তখন দলনী তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। (২) চরম বিপদের দিনেও স্বামীভক্তি থেকে দলনী বিচ্যুত হয়নি, স্বামী সন্দর্শনে যাওয়ার জন্য অনেক ক্লেশও বরণ করে নিয়েছিল। (৩) একনিষ্ঠ স্বামী ভক্তির জন্যই দলনী নবাবের মিথ্যা হুকুম উপলব্ধি না করতে পেরে বিষপানে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। আসলে শৈবলিনীর উচ্ছৃঙ্খল প্রেমের বিপরীতে দাম্পত্য প্রেমের স্বরূপকে চিত্রিত করার জন্য দলনীর প্রেমের স্বরূপকে মেলে ধরেছেন। একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণে হলেও শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার বিরুদ্ধে মৃণালকে উপস্থাপিত করেছিলেন।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ পরোপকার সম্বন্ধে বা প্রীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যেসব কথা উল্লেখ করেছেন, তা চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রতাপের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। প্রতাপ যখন শৈবলিনীর কাছে জানল, প্রতাপ থাকতে শৈবলিনীর সুখ নেই, তখন প্রতাপ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আসলে এর মধ্যে যতটা নৈতিক আদর্শবোধ আছে, হৃদয়বোধের ছিটেফোঁটাও তাতে নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ, 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "যে প্রণয়ী প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী।" প্রতাপ তাই প্রণয়ীর জন্য নিজেকে হত্যা করবে এটাই তো স্বাভাবিক, অন্তত শিল্পীর এই জবানবন্দী অনুযায়ী।

রমানন্দ স্বামীও চন্দ্রশেখরকে পরহিতব্রতের যে আদর্শের কথা শুনিয়েছেন, তাতেও আছে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই নীতি আদর্শ। রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে বলেছিলেন, "তুমি যে

পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ, অদ্য হইতে তাহা কার্যকর।" দলনীর ধর্মনিষ্ঠা ও কারণে বঙ্কিমচন্দ্র রমানন্দ স্বামীর দ্বারা চন্দ্রশেখরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'এই যবনকন্যা ধর্মিষ্ঠা, এক্ষনে বিপদে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহার পশ্চাদানুসরণ কর, যখনই পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপায় করিও।"

শুধু তাই নয়, উপন্যাসের নামকরণও আদর্শবাদের লক্ষ্যে। পরহিতব্রতধারী আদর্শ মানুষ হিসাবে সমগ্র উপন্যাসে চন্দ্রশেখর অনন্য চরিত্র। তিনি আদর্শনিষ্ঠায় অবিচল, শান্ত, স্থিতধী। দুঃখের আঘাতে তাঁর জীবন পরিশুদ্ধ, কখনও তিনি আদর্শবোধ ও ন্যায়নীতি থেকে ভ্রষ্ট হননি। সেজন্য তিনিই উপন্যাসের নায়ক এবং তাঁর নামে নামকরণ।

সুতরাং বিশুদ্ধ দাম্পত্য জীবনের আদর্শ, প্রীতিতত্ত্ব, পরহিতব্রতের নীতিবোধ প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের আদর্শ ও ন্যায়নীতিবোধগুলি নানাভাবে কাহিনিবিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। তাতে শিল্পের রসবোধ কোথাও কোথাও হানি হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

তের

অতিপ্রাকৃত উপাদান ঃ চন্দ্রশেখর

(যোগবল, জ্যোতিষ গণনা, স্বপ্ন, নরক)

রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'মণিহারা' প্রভৃতি গল্পে এবং শেক্‌সপিয়রের 'ম্যাকবেথ', 'টেম্পেস্ট' প্রভৃতি নাটকে অতিপ্রাকৃত উপাদানের ব্যবহার শিল্পসৌন্দর্যের পরিপোষকরূপে পরিগণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যেসব গল্পে অতিপ্রাকৃত উপাদানকে ব্যবহার করেছেন, তা মূলত চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে রূপ দেবার প্রয়োজনে। নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক অভাবনীয় ঘটনা সন্নিবেশের মাধ্যমে অতিলৌকিক জগতের উপযোগী পটভূমি সৃষ্টি করেন। কখনো কখনো চরিত্রের দ্বন্দ্ব বা কাহিনির একঘেয়েমি দূর করার জন্য অতিপ্রাকৃতের সমাবেশ ঘটে। বাস্তব সীমার মানুষও এই অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেন। শিল্পের উদ্দেশ্য কিম্বা রসপরিণতিকে বিঘ্নিত না করে অতিপ্রাকৃত উপাদানের ব্যবহার ঘটলে তা শিল্পের শিল্পমূল্যকে স্বতন্ত্র মাত্রা এনে দেয়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত উপাদান শিল্পের মূল উদ্দেশ্যকে কোথাও কোথাও যে বিঘ্নিত করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত উপাদানের ব্যবহার করেছেন। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাছে অতিপ্রাকৃত ঘটনার কোন বাস্তব স্বীকৃতি নেই। কেননা বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, প্রত্যেকটি ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, প্রত্যেকটি ঘটনাই কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ জীবনকে শুধু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন বলে মনে করেন না। জীবনের যাবতীয় ঘটনার পিছনে একটি অনির্দেশ্য অলৌকিক শক্তিকে তাঁরা স্বীকার করেন। সে শক্তিকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছাকে হেলায় নস্যাৎ করে তার প্রকাশ ঘটে। তা অদৃশ্য, গূঢ়, গুহাহিত কিন্তু তা মানবভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত। সে শক্তিকে অতিক্রম করার শক্তি মানুষের নেই। মানবজীবনে অপ্রাকৃত শক্তির এই খেয়াল-খুশি নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। বৈজ্ঞানিক, মনোবিজ্ঞানী বা শিল্পী নিজ নিজ পথে এর বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কাব্য সাহিত্যে এই অবর্ণনীয় শক্তি মানবভাগ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে কোথাও দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সৃষ্টি করেছে, কোথাও বা ভয়ঙ্কর এক করুণ পরিণাম সূচনা করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে নয়, কপালকুণ্ডলায় ভৈরবী দর্শন, 'বিষবৃক্ষে' স্বপ্নদর্শন, 'রজনী'তে সন্ন্যাসীর মহিমায় অন্ধ রজনীর দৃষ্টিশক্তি লাভ প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত ঘটনার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত উপাদানগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে, তা কতটা শিল্পসম্মত রূপ লাভ করেছে।

যোগবল ঃ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত ঘটনা হিসেবে যোগবলের ব্যবহার কাহিনি বিন্যাসে ও চরিত্রের পরিবর্তন সাধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। গীতা ও স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'-এ যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় মতে, যোগসাধনের ফলে যোগীরা অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করতে পারেন এবং সেই সিদ্ধির মাধ্যমে অলৌকিক কাজও সম্পন্ন করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাধনশাস্ত্রের এই অলৌকিক সিদ্ধি বা যোগবলকে উপন্যাসের প্রয়োজনে প্রয়োগ করে অদ্ভুত রোমান্স রস সৃষ্টি করেছেন।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে যোগবল-কে সম্মোহিনীবিদ্যা হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে। অথর্ব বেদেও এই সম্মোহন বিদ্যার (Mesmerism) উল্লেখ রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই যোগবলের দ্বারা তিনটি প্রয়োজন সিদ্ধ করেছেন। (এক) শৈবলিনীর উচ্ছৃঙ্খল মনকে স্বামিধ্যানে তন্ময় করা। (দুই) শৈবলিনীর উন্মাদ রোগ আরোগ্য করা। (তিন) শৈবলিনী ও ফষ্টরের গোপন কথাগুলিকে বের করে আনা।

যোগবলের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনি বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে যে ভারসাম্য আনতে চেয়েছিলেন সে কারণে রমানন্দ স্বামীর আবির্ভাব। রমানন্দ স্বামী তাঁর শিষ্য চন্দ্রশেখরকে যোগবলের দীক্ষা দিয়েছেন। শৈবলিনীর উপর এই যোগবলের প্রয়োগ ঘটিয়ে শৈবলিনীর মনে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনানোর পক্ষপাতী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। উপন্যাসের আখ্যায়িকার প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিদ্যার প্রয়োগকৌশল দেখিয়েছেন। শৈবলিনী আত্মকৃত পাপবোধে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছিল, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য পর্বতগুহা থেকে উত্থিত ধ্বনিতে সে বার বছর ব্রত গ্রহণ করতে আদিষ্ট হল। শৈবলিনী যখন স্বামিদর্শনের জন্য উম্মুখ হল, তখন অদৃশ্য মহাপুরুষ তাকে সংযতভাবে একাগ্রচিত্তে সপ্তাহব্যাপী স্বামী-ধ্যানের নির্দেশ দিলেন। শৈবলিনীর শেষপর্যন্ত স্বামী সাক্ষাৎ লাভ যোগক্রিয়ার ফল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

এমনকি শৈবলিনীর উন্মত্ততা থেকে আরোগ্যলাভও যোগবলের ফল। চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর পাগল হয়ে যাওয়ার ঘটনা বিবৃত। শৈবলিনীর উন্মত্ততাকে ভাল করানোর জন্য রমানন্দ স্বামীর মন্ত্রপূত ঔষধ পান করানো হল। ঐ ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে শৈবলিনীকে সম্মোহিত করে তার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ এবং ফষ্টরের নৌকায় বসবাসের সময় জাতিভ্রষ্টা হয়েছিল কিনা তা জেনে নেওয়া। তাই ঔষধ প্রয়োগের পর সম্মোহন নিদ্রায় অভিভূত অবস্থায় শৈবলিনী সব কথা অকপটে স্বীকার করল।

ষষ্ঠ খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে রমানন্দ স্বামী ফষ্টরের উপর যোগবল প্রয়োগ করে শৈবলিনী যে জাতিভ্রষ্টা হয়নি, তা জেনে নিতে সক্ষম হয়েছেন। শৈবলিনী ও ফষ্টরের এই জবানবন্দী থেকে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে গ্রহণের অন্তরায় দূরীভূত হয়েছিল।

যোগবলের অবতারণা উপন্যাসে কাহিনি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও সিদ্ধ করেছে। শৈবলিনী যে প্রতাপের স্মৃতি ভুলতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েও দৈহিক শুচিতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে, সেই বিষয় রমানন্দ স্বামী যোগবলের দ্বারাই অবগত হয়েছিল। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে চন্দ্রশেখরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শৈবলিনীকে পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা।

এখন প্রশ্ন হল, এই ধরনের অতিপ্রাকৃত ঘটনার দ্বারা শিল্পরসের হানি ঘটেছে কিনা। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, এইসব অলৌকিক অতিমানবিক বিষয়ের অবতারণায় উপন্যাসের শিল্পগুণ যে কিছুটা ব্যাহত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে এই ধরনের ঘটনাসন্নিবেশের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন না উঠলেও আধুনিক সমালোচকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে একথাও ঠিক, বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে বিবৃত করেছেন, তাতে অতিপ্রাকৃত ঘটনাও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে এ ধরনের রোমান্স সৃষ্টির ক্ষেত্রে যোগবলের ঘটনা অনেকটা কার্যকরীও হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ অনুযায়ী 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন, যোগবলের মতো ঘটনা তাঁকে সাহায্য করেছে। শৈবলিনীর মনকে স্বামীর প্রতি সংসক্ত করেছে যোগশক্তি, শৈবলিনীর উন্মত্ত অবস্থা থেকে আরোগ্যলাভের ঘটনাও ঐ শক্তির প্রভাবে। যোগশক্তির দ্বারা চরিত্রের অন্তর্নিহিত কথাকে প্রকাশ্যে আনানো সম্ভব হয়। উপন্যাসে দেখি শৈবলিনী ও ফস্টর যোগশক্তির প্রভাবে সম্মোহিত হয়েই অকপটে নিজেদের গোপনতম কথা প্রকাশ করেছে। এর দ্বারা রোমান্সের পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে Psychic Force-এর প্রসঙ্গ আসতে পারে। কারণ পাশ্চাত্যে যোগবলকে মনঃশক্তি বা Psychic Force বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণাকে মিশিয়ে ফেলেছেন। তাই তাঁর সংশয় প্রকাশিত হয়েছে—'যোগবল না Psychic Force ?'। পাশ্চাত্যে ইচ্ছাশক্তি (will Force) বা মনঃশক্তির (Psychic Force) বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছে। সম্মোহন (Mesmerism) মনঃশক্তিরই একটি দিক। যাদুবিদ্যায় যাদুকর সম্মোহনের দ্বারা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রতিকূল শক্তিকে অনুকূলে আনেন। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের মূল কথা হল, মানুষের সচেতন মনকে নিষ্ক্রিয় করে অবচেতন মনকে ক্রিয়াশীল করতে পারলে, অবচেতন মনের অনেক গোপন রহস্য বের করে আনা যেতে পারে এবং এর দ্বারা মানসিক ব্যাধিও সারিয়ে তোলা যায়। কিন্তু ভারতীয় যোগশক্তি এ থেকে ভিন্ন। যোগশক্তিতেও মনঃশক্তি কাজ করে। সম্মোহন এই যোগশক্তির একটি স্তর।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় যোগবলের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত অংশে ভারতীয় যোগের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। শৈবলিনীর বার

বৎসর ব্রত উপলক্ষে পর্ণকুটীরে বাস, মাটিতে শয়ন, ফলমূল ভোজন প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম ভারতীয় যোগের অঙ্গ। এইসব ক্রিয়াকর্মের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হলে চিত্তবৃত্তি একটি বিষয়ে নিবদ্ধ হয়ে স্থির হতে পারে। এই যোগসাধনা অবশ্য অধ্যাত্ম রাজ্যের উপাদান— ব্যক্তিচৈতন্য ও সমষ্টিচৈতন্যের যোগই ভারতীয় যোগ। তা আয়ত্ত করতে হলে নিয়ম চাই, চাই অনুশীলন। তাই চন্দ্রশেখর রমানন্দ স্বামীর নির্দেশে শৈবলিনীর উপর যোগবল প্রয়োগ করে তার রোগ যেমন জানিয়েছেন, তেমনি তাঁর মনের কথাও জেনে নিয়েছেন এবং একই উপায়ে ফষ্টরের কাছে শৈবলিনীর কথা জেনে নিয়ে কাহিনিতে দুটি সূত্রকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই বিষয় পাঠকের কাছেও বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে।

জ্যোতিষ গণনা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত ঘটনা হিসাবে জ্যোতিষ গণনা এবং অদৃষ্ট বিচারকে কাহিনি বিন্যাসে যুক্ত করেছেন। 'সীতারাম' ও 'মৃণালিনী' উপন্যাসে ভাগ্যগণনার একটি ভূমিকা আছে। তাছাড়া 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির লীলা আশ্চর্য রহস্যরস সৃষ্টি করেছে এবং পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাহিনি ও চরিত্রকে নিয়মিত করেছে। স্বামীগৃহে যাওয়ার সময় দেবীর পাদপদ্মে বিল্বপত্র দান ও পড়ে যাওয়াকে নিয়তি নির্দেশিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসেও অদৃষ্ট গণনা কাহিনি বিন্যাসে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আলোচ্য 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মীরকাসেমের জ্যোতিষ গণনা ইতিহাস সমর্থিত এবং সেই সূত্রে দলনীর ভাগ্য গণনা কাহিনি বিন্যাসে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই জ্যোতিষ গণনার প্রসঙ্গ আছে। এই জ্যোতিষ গণনাকে কেন্দ্র করেই ইতিহাস অংশের সঙ্গে মূল কাহিনির সাযুজ্য ঘটেছে। নবাব কিছু জ্যোতিষবিদ্যা জানতেন। দলনীর ভাগ্য গণনা করতে গিয়ে তিনি ভাল ফল পাননি। সেজন্য নির্ভুল গণনার জন্য ডাক পড়েছে চন্দ্রশেখরের। মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বেদগ্রামের সংযোগ হয়েছে এই সূত্রে। ঔপন্যাসিক প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে জ্যোতিষ গণনার প্রসঙ্গ এনে ভাবী ঘটনার যে পারম্পর্যগুলি তুলে ধরেছেন, সেগুলি হল— (অ) ইতিহাসের সূত্রকে রক্ষা করা অর্থাৎ ইতিহাসের সত্যকে তুলে ধরে মীরকাসেমের জ্যোতিষ গণনাকে কাহিনিতে সংস্থাপন করা। (আ) দলনীর ভাগ্য সম্বন্ধে পাঠককে পূর্ব থেকেই সচেতন করে রাখা, যার দ্বারা পরবর্তী কাহিনির অগ্রগতিতে দলনীর ট্র্যাজিক পরিণাম পাঠকমনে সহনীয় রূপ লাভ করতে পারে। এদিক থেকে জ্যোতিষ গণনা Dramatic Irony-র কাজ করেছে। (ই) কাহিনিতে ইতিহাস অংশের সঙ্গে মূল কাহিনিব যোগ ঘটানো। (ঈ) এই জ্যোতিষ গণনার জন্য চন্দ্রশেখরের বাড়ি থেকে চলে আসায় ফষ্টরের দ্বারা শৈবলিনীর অপহরণ সম্ভব হওয়া। (উ) নবাবের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধের সময় ও আগে

দলনীকে কোথায় রাখা হবে তাও জানার প্রক্রিয়া হিসেবে জ্যোতিষ গণনার ভূমিকা রয়েছে। (ঊ) চন্দ্রশেখর জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে দলনীর বিপর্যয় জেনেও রাজকর্মচারীকে বলেছেন, 'মহাশয়' আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।' এই দিকটি জেনেও চন্দ্রশেখরের তা প্রকাশ না করার মধ্যে নাটকীয় কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। (ঋ) শুধু তাই নয়, যে চন্দ্রশেখর দলনীর ভাগ্যগণনা করে বিপদ জেনেও প্রকাশ করেননি, সেই চন্দ্রশেখরের বাড়িতে ঘটনা পরম্পরায় নিয়তি নির্দেশিত পথে দলনীর আগমন দেখে মনে মনে ভাবলেন 'ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে'। এই প্রতিক্রিয়াতেই পাঠকও দলনীর বিপর্যয় সম্পর্কে চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে।

জ্যোতিষ গণনা প্রসঙ্গটিকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সূত্রে গ্রথিত না করে বিষয়টিকে দলনীর ভাগ্য বিপর্যয়ের সূত্রে গ্রথিত করায় দলনীর অস্বাভাবিক পরিণতি পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাই অতিপ্রাকৃত উপাদান হয়েও জ্যোতিষ গণনা প্রাসঙ্গিক সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

স্বপ্নবৃত্তান্ত ও উন্মত্ততা

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে স্বপ্নবৃত্তান্ত যেমন সাংকেতিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে, তেমনি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর স্বপ্ন ও উন্মত্তদশা শুধু সৌন্দর্য নয়, কাহিনির নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন ও হীরার উন্মত্তদশা রোমান্সের পরিপুষ্টি সাধন করলেও 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রমথনাথ বিশীও বলেছেন, ''অনেকের স্বপ্নদর্শন ব্যাপারটাতেই আপত্তিও নাকি বাস্তব নয়। উপন্যাস বা অন্য শ্রেণীর সাহিত্যকে যারা দৈনন্দিন জমা-খরচের খাতায় পর্যবসিত করতে চান তাঁদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, দিনের মধ্যে অন্তত আট ঘণ্টা অর্থাৎ জীবনের অন্তত এক তৃতীয়াংশ যখন নিদ্রায় কাটে তখন সে অভিজ্ঞতা সাহিত্যের সামগ্রী না হবে কেন? কুম্ভকর্ণকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসলে তার বারো আনাই তো স্বপ্নের উপাদানে গঠিত হত। কাজেই স্বপ্নকে সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলায় বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা দোষী মনে করি না। তবে স্বপ্নও একটা নিয়মের অধীন। অভিজ্ঞতাবহির্ভূত বস্তু স্বপ্নে দর্শন সম্ভব কিনা এক্ষেত্রে সেটাই বিবেচ্য। সে ভার বিশেষজ্ঞদের উপরে রইলো।''

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্বপ্ন যেহেতু মানবচৈতন্যেরই রূপ তাই স্বপ্নবৃত্তান্ত কোন অলৌকিক ঘটনা নয়। এখন প্রশ্ন হল, স্বপ্নবৃত্তান্ত উপন্যাসে অপরিহার্য ছিল কি না। সেই আলোচনায় আসার আগে অবচেতন মন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মানুষের মনের দু'ভাগ—চেতন ও অবচেতন। চেতন মনের ভাবনা ও ক্রিয়াগুলিকে বোঝা যায়, ধরা যায়, ছোঁয়া যায় কিন্তু অবচেতন মনের ভাবনা ও ক্রিয়াগুলি স্থূল চেতনায় ধরা-ছোঁয়ার

অতীত। চেতন বা অবচেতন অবস্থায় মানুষের মনের ভাণ্ডারে যে স্মৃতিগুলি সঞ্চিত হয়, মানুষের স্বপ্ন তারই প্রতিভাস। তাই স্বপ্নকে মিথ্যা বা অলৌকিক বলা যায় না, তা অবদমিত মানবচেতনার প্রকাশ। তাই বিভিন্ন সাহিত্যে স্বপ্নের ব্যবহার সাহিত্য সৌন্দর্যের আকর-রূপে বিবেচিত হয়েছে। যেমন, 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে বাসবদত্তার স্বপ্ন, 'রঘুবংশ' কাব্যে কুশাবতী নগরে অর্দ্ধরাত্রে কুশের স্বপ্ন-কাব্য শিল্পের অপূর্ব সৃষ্টি। কিম্বা 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডী ম্যাকবেথের 'Sleep Walking' দৃশ্য, কিংবা 'কিং লিয়ার' নাটকে লিয়ারের উন্মত্ত দশা নাট্যসাহিত্যে অমর হয়ে আছে অসাধারণ শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে তা যুক্ত বলেই।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চারটি স্বপ্নের প্রসঙ্গ রয়েছে। স্বপ্নগুলি শৈবলিনীর মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের দিক থেকে অর্থবহ। শৈবলিনীর দ্বন্দ্বময় চরিত্র বিশ্লেষণে স্বপ্নগুলির তাৎপর্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর স্বপ্ন প্রতাপের আক্রমণের প্রাক্কালে ফষ্টরের বজরায়। শৈবলিনী কেন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, ভীমা পুষ্করিণীর পরিবেশে পদ্ম, রাজহাঁস ও শূকরের রূপকে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বপ্নের বর্ণনা এরকম, ''সেই ভীমা পুষ্করিণীর চারিপাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থিশাখারাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত—শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছে। সরোবরের প্রান্তে যেন এক সুবর্ণশিল্পিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটা শ্বেতশূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী যেন উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু রাজহংস তাহার দিক হইতে মুখ ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছে। শূকর শৈবলিনী পদ্মাকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ফষ্টরের মুখের মত। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে চায়, কিন্তু চরণ মৃণাল হইয়া জলতলে বদ্ধ হইয়াছে—তাহার গতিশক্তি রহিত।'' এদিকে শূকর বলিতেছে, ''আমার কাছে আইস, আমি হাঁস ধরিয়া দিব।'' শৈবলিনী চরিত্রের যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জনিত বৈপরীত্য তা স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফষ্টর যে শৈবলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তাই তাকে শূকরের সঙ্গে তুলনা করে তার প্রতি ঘৃণার ভাব জাগ্রত করেছে। এমনকি, হাঁস ধরে দেবার স্বপ্নের সঙ্গে শৈবলিনীর মানসিকতারও মিল আছে। কেননা প্রতাপকে পাওয়ার জন্যই শৈবলিনী ফষ্টরের ফাঁদে পা দিয়েছিল। তাই একদিকে ফষ্টরের প্রতি ঘৃণা এবং অপরদিকে তাকে মাধ্যম করে প্রতাপকে পাওয়ার আশা—এই বৈপরীত্য স্বপ্নের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ঘটনা শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কিরণময়ীর উপেন্দ্রকে ভালোবাসা এবং প্রত্যাখ্যাতা হয়ে উপেন্দ্রর প্রিয়পাত্র দিবাকরকে নিয়ে পলায়নের মধ্যে বৈপরীত্যের কথাকে স্মরণ করায়।

চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শৈবলিনী আর একটি স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্ন প্রতাপের কাছে শপথ গ্রহণের পর ভীষণ নৈরাশ্যের মধ্যে দেখেছে। তখন শৈবলিনীর মনে

হয়েছে, 'সুখ, সৌন্দর্য, প্রণয়, প্রতাপ–এ সকলে শৈবলিনীর অধিকার নাই—আশা নাই, আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য'। শৈবলিনীর এ ধরনের মানসিক অবস্থায় গভীর অন্ধকারে, পর্বতগুহায় অসহায়া শৈবলিনীকে উদ্ধার করলেন এক মহাকায় পুরুষ। উদ্ধার করে রেখে গেলেন মহাঅন্ধকার পর্বতের গুহায়। সে সময়ের বর্ণনা এ ধরনের—"শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্দ্ধনিদ্রাভিভূত অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় রহিল। .....সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে শৈবলিনী দেখিল সম্মুখে এক অনন্ত বিস্তৃতা নদী।" এই স্বপ্নের মধ্যে শৈবলিনীর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাই তার মধ্যে পাপবোধ বিরাজ করছে। সেজন্য স্বপ্নের মধ্যে শৈবলিনী দেখেছে রক্তের নদী, গলিত শব, দণ্ডদাতা পুরুষ। অবশ্য এগুলি মূলত নীতিবাদী বঙ্কিমের সৃষ্টিমাত্র। কারণ শৈবলিনীকে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ ছকে ফিরিয়ে আনার প্রেক্ষাপট মাত্র। সেজন্য স্বপ্নের শেষে শৈবলিনী দৈববাণীর মতো লাভ করেছে বার বছর ব্রতের নির্দেশ।

চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শৈবলিনী যে স্বপ্ন দেখেছে তাতে দেখা যায় শৈবলিনী যোগনিরত অবস্থায় স্বামীধ্যানে মগ্ন। এই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তাঁর তন্ময়চিত্তে জেগেছে দিব্যদৃষ্টি। শৈবলিনী সেই দৃষ্টিতে চন্দ্রশেখরের ক্ষমা, মহত্ত্বকে উপলব্ধি করে তৃপ্তি পেয়েছে। তাই চপলা শৈবলিনী এই স্বপ্নের পর স্বামীর প্রতি অচলা নিষ্ঠায় ভেবেছে, 'ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা!" শুধু তাই নয়, এই পাপবোধ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আত্মধিক্কার, "কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম!" এই বোধ বা উপলব্ধি নিঃসন্দেহে শৈবলিনীর জীবনের রূপান্তরের প্রতীক। যেমন করে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে জেবুন্নিসার মধ্যে জেগেছিল। তাই শৈবলিনী যেমন চন্দ্রশেখরকে ভেবেছিল স্বপ্নে, তেমনি বাস্তবে জেবুন্নিসা মবারককে বলেছিল, "আমায় ক্ষমা কর। আমি ঐশ্বর্যের গৌরবে পাগল হইয়াছিলাম। আমি আজ শপথ করিয়া ঐশ্বর্য ত্যাগ করিলাম—তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আমি আর দিল্লী ফিরিয়া যাইব না।"

চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে শৈবলিনী যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা মূলত ভ্রান্তিদর্শন। কারণ শৈবলিনী এই স্বপ্ন দেখেছে জাগ্রত অবস্থায়। অবশ্য তা তার মনের বিকারও বটে। কারণ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে কথা বলার মাঝে মাঝে বলেছে, "আমি রাতদিন নরক-স্বপ্ন দেখি।" এর দ্বারা শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে তার মনের পাপবোধকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য করণীয় কি তাও চন্দ্রশেখরের কাছে জানতে চেয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, এই স্বপ্নবৃত্তান্ত উপন্যাসে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা কিম্বা এর দ্বারা উপন্যাসের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে কিনা? উত্তরে বলা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন, সেদিক থেকে

স্বপ্নদর্শনের বৃত্তান্ত যথাযথ। বিশেষ করে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে ও চন্দ্রশেখরের কাছে শৈবলিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পাদনের কারণে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বিশেষ কার্যকর হয়েছে। দিনের চিন্তা যদি রাতের স্বপ্ন হয়, তাহলে সেই স্বপ্ন পাঠককে চরিত্র সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করাতে পারে, যা করেছে শৈবলিনীর ক্ষেত্রে। শৈবলিনীর স্বপ্ন তাই একান্ত আত্মনিষ্ঠ ভ্রান্তি, যে ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে তার মানসিক গতি পরিবর্তনের এক নিখুঁত আলেখ্য। এই আলেখ্য রচনায় স্বপ্নবৃত্তান্ত যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উন্মত্ততা ঃ

উন্মত্ততা হল স্বপ্নের অনুষঙ্গ। দুই-ই অবদমিত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তবে স্বপ্নে জ্ঞানচৈতন্যের উপর মানুষের অধিকার থাকে। স্বপ্নের অপ্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে মানুষ মনে ধরে রাখতে পারে। কিন্তু উন্মত্ততায় সে জ্ঞান থাকে না, স্মৃতিও থাকে না। উন্মত্ততার লক্ষণ হল অস্বাভাবিক আচরণ ও অসংলগ্ন কথাবার্তা। বঙ্কিমচন্দ্র এই উন্মত্ততাকে চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে ভাসের 'প্রতিজ্ঞা' নাটকে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়নের উন্মত্তবেশ উদয়নকে রক্ষা করবার জন্য। শেকস্‌পিয়রের 'কিং লিয়ার' নাটকে লিয়ারের উন্মত্ততা আশাভঙ্গের শোচনীয় পরিণাম। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে কারারুদ্ধ সাজাহানের উন্মত্ততা নায়কের মানসিক সক্রিয়তার নিদর্শন রূপে বিবেচিত হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হীরার উন্মত্ততা তার আশাভঙ্গের পরিণামজনিত। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও শৈবলিনীর উন্মত্ততা তার কৃতকর্মের অনুশোচনার বহিঃপ্রকাশ রূপে চিত্রিত।

শৈবলিনীর উন্মত্ততার চিত্র আসলে নীতিবাদী বঙ্কিমের চিন্তাপ্রসূত। তাই পাপের পরিণামরূপ শৈবলিনীর উন্মত্ততার চিত্র শোচনীয় ও মর্মান্তিক। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর উন্মাদ অবস্থা দেখে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বলেছেন 'গুরুদেব! এ-কি করিলে?' সুন্দরীও শৈবলিনীর সেই অবস্থা দেখে কিছুক্ষণ নীরব ছিল। সুন্দরীর চোখের পাতা ভিজে ভিজে হয়ে গেল এবং শেষপর্যন্ত সে কাঁদতে লাগল। যে পাপীকে মানুষ ঘৃণা করে, এমনকি তার মৃত্যুকামনাও করে, তার উন্মত্ত অবস্থায় মানুষ কাতর না হয়ে পারে না। যদিও নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র পাপের ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখিয়েছেন, কিন্তু সহানুভূতির স্পর্শে সে পরিণাম করুণরস মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের কাহিনিবয়নে নাটকীয় শ্লেষ ব্যবহারের মাধ্যমে কাহিনির মধ্যে গতি আনার চেষ্টা করা হয়, যেমনটি করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। শৈবলিনীর উন্মত্ত অবস্থা উপন্যাসে একটি চমৎকার নাটকীয় শ্লেষ (Dramatic Irony) সৃষ্টি করেছে। একদিন প্রতাপকে উদ্ধার করতে গিয়ে শৈবলিনী ইচ্ছা করে 'পাগল'-এর অভিনয় করেছিল। কে জানত, এই

অভিনয় একদিন তার জীবনে নির্মম সত্যে পরিণত হবে? বঙ্কিমচন্দ্র সুদক্ষ শিল্পীর মতো এই নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি করে মানব ভাগ্যের উপর নিয়তির অমোঘ প্রভাব দেখিয়ে রোমান্সের রহস্যময়তাকে ব্যঞ্জিত করেছেন। উপন্যাসের গঠনকৌশলের দিক থেকে এই কৌশল বেশ সুন্দর। তাই শৈবলিনীর উন্মত্ততা করুণ ঠিকই কিন্তু তা সুন্দর। শিল্পীর কাজই তাই বিসদৃশকে সদৃশ করে, আপাত করুণের মধ্যে সুন্দরকে উপলব্ধি করা—যা করতে পেরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

নরকদর্শন ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রাকৃত উপাদান হিসেবে নরকদর্শন-এর ঘটনাকে যুক্ত করেছেন। শৈবলিনীর পাপবোধ থেকেই প্রায়শ্চিত্ত এবং সেই সূত্র ধরেই এসেছে নরকদর্শন। চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রথম নরক বর্ণনা আছে। সেই দৃশ্য ভয়ঙ্কর এবং বিকট। চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদেও শৈবলিনী পুনরায় নরক দর্শন করেছে।

জীবিত পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ধাবিত হয় তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র পাপিষ্ঠা শৈবলিনীকে নরকগামী করেছেন। প্রথমে জড় প্রকৃতির পীড়ন, পাথর, কাঁটা, অন্ধকার, তার উপর বৃষ্টি, বাতাস ও মেঘের তাণ্ডব। তারপর অপহৃত চেতনায় নরক দর্শন ও ভয়ঙ্কর নরক যন্ত্রণা ভোগ। সে নরক ভীষণ, নির্মম ও পৈশাচিক এবং তা অবশ্যই শৈবলিনীর মনের সৃষ্টি। সেই নরকভোগেও প্রায়শ্চিত্তের শেষ হল না। তারপর শুরু হল বার বছর ধরে ব্রতের নির্দেশ। এরপর শৈবলিনী প্রত্যক্ষ করলো এক অনন্তবিস্তৃতা, জনশূন্য, রুধিরের নদী। সেখানে অস্থি গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কাল প্রভৃতি ভেসে চলেছে। কুম্ভীরাকৃতি জীবগুলি গলিত শব ভক্ষণ করছে। শুধু তাই নয়, "রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতে বাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলেই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে।" এমন অবস্থায় শৈবলিনীকে সেই মহাকায় পুরুষ সেখানে বসিয়ে নদী পার হতে বললেন।

চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদেও নরকের বর্ণনা শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শৈবলিনী সাতদিন গুহায় থাকার পর আবার নরক দর্শন করেছে। এই দর্শন মনস্তত্ত্বসম্মত। শৈবলিনী মনে করলেন তার মৃত্যু হয়েছে, অথচ তার জ্ঞান আছে। আরও দেখলেন পিশাচে তার দেহ নিয়ে অন্ধকারে শূন্যপথে উড়ছে। "কত কৃষ্ণমেঘের সমুদ্র, বিদ্যুদগ্নিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। .....দেখিলেন, নক্ষত্রসুন্দরীগণ নীলাম্বরমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে, বলিতেছে—দেখ, মনুষ্যকীটের মধ্যে আবার অসতী আছে"। .....কিছুক্ষণ পরে, "অতি ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত, মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই।" পিশাচেরা বলিল "ঐ নরকের কোলাহল শুনা যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও...."।

শেষপর্যন্ত শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের চরণযুগল বন্দনা করে নরক থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, "তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।" এরপর শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচে গেল, হঠাৎ শৈবলিনীর মনে হল, "এ মৃত্যু নহে, জীবন; এ স্বপ্ন নহে প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল।" এভাবে শৈবলিনীর নরক দর্শনের ঘটনা সমাপ্ত হয়েছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে মিল্টন তাঁর Paradise Lost-এ নরকের এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন। এমনকি দান্তে তাঁর 'ডিভাইন কমেডি'তে (Divine Comedy) নরক বর্ণনা করেছেন। দান্তে জটিল অরণ্যে পথ হারিয়েছিলেন। তিনি সেখানে তিনটি জন্তুর সম্মুখীন হলেন। চিতাবাঘ লালসার প্রতীক, সিংহ পাশব বৃত্তির প্রতীক এবং স্ত্রী-নেকড়ে প্রতারণার প্রতীক। দান্তে তিন শ্রেণির পাপের কথা বলেছেন। এগুলি হল অচরিতার্থ লালসা (Incontinence), পাশবতা (Beastiality), ঈর্ষাজাত প্রতারণা (Fraud)। এদের স্থান নরকের নিম্নস্থানে। শৈবলিনীর মধ্যে যে নরক দর্শন, তা পাপবোধজনিত। এই পাপ অচরিতার্থ কামনা থেকে জাত।

শৈবলিনীর নরক দর্শনে তাই দেখা যায় মহাকায় পুরুষ তাঁর জ্বলন্ত লোহিত লৌহনির্মিত বেত দিয়ে শৈবলিনীকে প্রহার করতে লাগলেন। তারপর সেই ভয়াবহ নরক থেকে উদ্ধারের জন্য সে চিৎকার করে উঠলো। মহাপুরুষ তাকে প্রায়শ্চিত্তের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার নির্দেশ দিলেন। শৈবলিনী দেখতে পেল যে, এক অনন্তকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। শৈবলিনী তার মধ্যে দগ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন পাপীর মনে তার কৃতকর্মের অনুশোচনা আনতে। এই অনুশোচনার মাধ্যমে চরিত্রের মানসিক প্রতিক্রিয়াকে মেলে ধরতে চান। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন পাপী আত্মসচেতন হয়ে তার পাপ স্খালন করতে সচেষ্ট হবে। মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অষ্টম সর্গে নরকের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন চরিত্রের প্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরতে। রবীন্দ্রনাথও 'নরক বাস' নাট্যকাব্যে নরকের বর্ণনার মাধ্যমে জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে নরক বর্ণনার মাধ্যমে শৈবলিনীর আত্ম-অনুশোচনার পথ যেমন পরিষ্কার করেছেন তেমনি এর দ্বারা কাহিনিতে গতি আনার চেষ্টা করেছেন। তাই প্রমথ নাথ বিশী যথার্থই বলেছেন, "শৈবলিনী কর্তৃক দৃষ্ট নরক নিতান্তই গতানুগতিক, মৌলিকতাহীন, এখানেই লেখকের মুন্সীয়ানা। মানুষের মনের মধ্যে স্বর্গ-নরক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সংস্কার পুঞ্জীভূত তাতে মৌলিকতা নাই; কাজেই শৈবলিনীর অবচেতন মনের ক্রিয়ায় মৌলিকতার স্থান নাই; মৌলিক কিছু অঙ্কিত করলেই লেখক ধরা পড়তেন, পাঠকে বুঝতো এ অবচেতন মনের ক্রিয়া নয়, লেখকের সজ্ঞান মনের সৃষ্টি। লেখকের মুন্সীয়ানা অন্যত্র"।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত উপাদানের সহায়তায় কাহিনির গঠনকৌশল বা বর্ণনারীতির ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য এনেছেন তা প্রশংসনীয়।

চৌদ্দ

প্রকৃতির ভূমিকা

কাব্য-সাহিত্যে প্রকৃতি উদ্দীপন বিভাব হিসেবে কাজ করে। উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে বা চরিত্র চিত্রণে প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও প্রকৃতি বিচিত্র রঙ্গিনী, অঘটনঘটনপটীয়সী। 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রকৃতি মহাপ্রকৃতি পরাশক্তির প্রতীক। 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে তিস্তা নদীর ভূমিকা গল্পের বিন্যাসে অপরূপ রূপ লাভ করেছে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসেও চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রকৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সাংখ্যদর্শন মতে 'প্রকৃতি, সৃষ্টির প্রসূতি। বাহ্য প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—অন্তঃপ্রকৃতি বুদ্ধি, অহংকার, মন সবই প্রকৃতির সন্তান।' এই প্রকৃতি সন্তানদের নিয়ে প্রপঞ্চ সৃষ্টির লীলা। বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির রয়েছে নিবিড় যোগ। তবু বাহ্যপ্রকৃতি চিরমোহিনী, নৃত্যপরা নটিনীর মতো মোহিনী। সে রহস্যময়ী। তাই পরিচয় অন্তর্গূঢ় হলেও প্রকৃতি মানবজীবনে স্বপ্নমায়া। তাকে ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না। অতি পরিচয়ের মধ্যেও সে অপরিচয়ের মহিমা বিস্তার করে রহস্যকে জটিল করে তোলে। প্রকৃতি যেন দূরচারিণী মৃগতৃষ্ণিকা। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে চমৎকারিণী প্রকৃতির এই সৌন্দর্যবিস্ময় আশ্চর্য রোমান্স সৃষ্টি করেছে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও রোমান্স সৃষ্টিতে প্রকৃতির ভূমিকা অসামান্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি হৃদয়ভাবের উদ্দীপক, তা এক ধরনের উদ্দীপন বিভাব। কালক্রমে কাব্যে প্রকৃতিচেতনা আরও প্রসারিত হয়েছে। বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি এক সূত্রে বাঁধা পড়েছে। তাতে মানবহৃদয়েই শুধু প্রকৃতির ছায়া পড়ে নেই, প্রকৃতিতেও মানবহৃদয়ের ছায়া পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ''কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয় অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে এবং মনের অবস্থা বিশেষে বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি।'' প্রকৃতি বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র উভয় প্রকৃতির এই অচ্ছেদ্য যোগ দেখিয়েছেন।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে গঙ্গার ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিয়েছে। (পূর্বে তা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ আছে বারুণী পুষ্করিণীর নিসর্গ চিত্র। তেমনি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে আছে ভীমা পুষ্করিণীর বর্ণনা। গোবিন্দলাল-রোহিণী প্রণয় সম্পর্ক রচনায় যেমন বারুণী পুষ্করিণীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তেমনি শৈবলিনীর প্রতাপকে পাওয়ার জন্য লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের গূঢ় উদ্দেশ্যের পটভূমিকা রচনা করেছে ভীমা পুষ্করিণী। এই ভীমা পুষ্কবিণী কাহিনি বয়নে ও চরিত্রচিত্রণে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তাই লেখকের প্রশ্ন 'জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?'

আবার প্রতাপ-শৈবলিনীর রোমান্টিক প্রেমের পটভূমি রূপে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গাকে ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রতাপ-শৈবলিনীর যে দুটি সন্তরণ দৃশ্য তা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অনন্য হয়ে রয়েছে, তা দেখানো হয়েছে গঙ্গাবক্ষে। এই প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের কাহিনি যেন গতিচঞ্চল ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। নায়ক-নায়িকার চরিত্র তাদের প্রেমবিচিত্রা রচিত হয়েছে গঙ্গাবক্ষে প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত পটভূমিকায়।

প্রথম সন্তরণ দৃশ্যে—"বর্ষাকাল—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে।" এই প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতাপ ও শৈবলিনী "দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল।" প্রকৃতির এই লীলা নায়ক-নায়িকাদের জীবনে নির্বাধ যৌবন জলতরঙ্গের লীলা সংঘটিত করেছে।

দ্বিতীয় সন্তরণ দৃশ্যে নায়কের হৃদযে স্বভাব-প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির বৈপরীত্য সূচনা করে, স্বভাব প্রকৃতির ছন্দে নিজের জীবনকে মিলিয়ে নেবার প্রতিজ্ঞা করেছে। অনন্ত নীল সাগরে সাঁতাব দেওয়ার জন্য প্রতাপের মনকে স্থির প্রতিজ্ঞ করে তুলেছে। তার ফলে শৈবলিনীর 'চক্ষে তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিল বর্ণ ধারণ করিল। নী৹ জল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল।' শেয পর্যন্ত উভয়েই 'চাঁদের আ

ায় এই স্থির গঙ্গার মাঝে'—'পাপ জীবনের ভার' নামিয়ে দিল। আবার এখান থেকে কাহিনিরও পট পরিবর্তন হল—জল থেকে স্থলে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রকৃতি নারীর মতোই বিচিত্র স্বভাবের রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেজন্য উপন্যাসে দেখতে পাই, অন্ধকার নদীর ধীরপ্রবাহী বুকে নক্ষত্রের নরম ছায়া, কখনও পাই শান্ত নদীর সকালবেলার মনোমুগ্ধকর কলধ্বনি, কখনও বাতাসের দ্বারা আন্দোলিত গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গের উন্মত্ততা, কখনও আবার জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যার মনোরম রূপ। কাহিনির উপক্রমণিকা অংশে গঙ্গার তীরে আমগাছের ঘন ছায়ায় বালক-বালিকার খেলা ও নৌকা গণনা, আকাশের নক্ষত্র গণনা প্রভৃতি কাহিনি সূত্রকে সমন্বিত করতে সহায়ক হয়েছে। তাছাড়া বিক্ষিপ্ত নানান প্রাকৃতিক দৃশ্য, যেমন—নদীর ঘাটে মেয়েদের স্নান, জলভরা, বেদগ্রামের ভীমা পুষ্করিণীতে গ্রামের বউদের বৈকালিক সমাবেশ, দীঘির ধারে ঘন গাছপালার সারি, লতাগুল্মের আড়াল, তালগাছের মাথায় সূর্যের রক্তিম

বর্ণবিকাশ প্রভৃতি। পল্লী প্রকৃতি বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক কবিত্ব প্রকাশিত। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে এবং নরক বর্ণনার ক্ষেত্রে নিসর্গ প্রকৃতি বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পাহাড়, পর্বতগুহা, অন্ধকার পর্বতে ঝড় প্রভৃতির বর্ণনা কাহিনি ও চরিত্রের বিকাশে সহায়ক হয়েছে।

উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে সাংখ্য তত্ত্বাভিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্রের শাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতিচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে করাল প্রকৃতির নির্মম নিষ্ঠুর লীলা। প্রতাপ প্রত্যাখ্যাতা শৈবলিনীর দুর্ভাগ্যের প্রতিরূপ এই অন্ধকার রাত্রি। যে প্রকৃতি গত রাত্রিতে ছিল হাস্যময়ী, সুখদায়িনী—আজ সেই প্রকৃতিই 'অবিশ্বাসযোগ্যা' সর্বনাশিনী।

সুতরাং ভীমা পুষ্করিণী, গঙ্গা নদী, সন্ধ্যার আকাশ, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বত, পর্বতগুহা, ঝড়, বাতাস প্রভৃতি প্রকৃতির পটভূমি এনে উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনি বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণে যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তেমনি মোহময়ী ভাষার দ্বারা সেই প্রকৃতিকেও জীবন্ত রূপে চিত্রিত করতে পেরেছেন।

পনের

প্রেম-প্রীতি ভাবনা ঃ চন্দ্রশেখর

বঙ্কিমচন্দ্র ''চন্দ্রশেখর'' উপন্যাসে আদর্শ ও তির্যক প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। আবার প্রেমের পরিণামে আত্মত্যাগের রূপও চিত্রিত করেছেন। ফলে উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেম-প্রীতি ভাবনার একটি রূপ রূপায়িত হয়েছে। যার দ্বারা উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যেমন আলোকিত হয়েছে তেমনি কাহিনি বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছে।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ''প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। .... মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।'' 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এই মনুষ্যপ্রীতির আদর্শই প্রধান হয়ে উঠেছে। পরহিতব্রত তথা প্রীতিই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি। এর উপদেষ্টা সিদ্ধপুরুষ রমানন্দ স্বামী, শ্রোতা শিষ্য চন্দ্রশেখর, প্রযোক্তা প্রতাপ। পরোপকার, পরহিতৈষিতা, পর দুঃখ নিবারণের লক্ষ্যেই উপন্যাসের আদর্শ চরিত্রগুলি কল্পিত। আবার কুলত্যাগিনী শৈবলিনীর প্রতি প্রীতিবশে 'সুন্দরী' অসমসাহসে নাপিতানীর ছদ্মবেশে দুর্ধর্ষ ইংরেজের নৌকায় প্রবেশ করেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরহিতব্রতই এই চরিত্রগুলিকে মহত্ত্বের পদবীতে উন্নীত করেছে।

আলঙ্কারিকরা মনে করেন, জীবের জীবনে 'রতি' একটি স্থায়ী ভাব। কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতি মনের যে আকর্ষণ, তাই রতি। স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সখ্য, প্রণয় এই রতিব নানারকম প্রকারভেদ। কাব্য-সাহিত্যে নরনারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণজনিত প্রণয় প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রণয়েরও নানা রূপ— কোথাও প্রণয় রূপমোহ, ইন্দ্রিয়তা কামনার চরিতার্থতা; কোথাও প্রণয় জীবনের বিশ্রাম, শান্তি, আনন্দ। কোথাও এই প্রেম প্রণয়ের রূপ—ঋজু ও তির্যক।

'চন্দ্রশেখর' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভালবাসার অত্যাচার' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাতে তাঁর প্রেম সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়—''স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা ....যে প্রণয় প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগ ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী। বস্তুত প্রেম এবং ধর্ম একই পদার্থ। সর্বসংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্মনাম প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম যতদিন না সার্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।''

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে তাই লক্ষ করা যায় এই পরহিত রতি। এই নীতিই মঙ্গলের উৎস—কি ভোগে, কি কর্মে, কি প্রেমে। আলোচ্য উপন্যাসের প্রেম-প্রীতি ভাবনা এই সূত্রে বিচার্য। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, আদর্শ দাম্পত্যপ্রীতি সমাজবন্ধনের ও স্ফুর...

প্রীতিবৃত্তির সর্বব্যাপী বিস্তারের কারণ। এই বৃত্তি শুধু ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি মাত্র নয়, তা অনুরাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে। তবে ঔচিত্যবোধের সঙ্গে সংযমিত হলে এই প্রীতি পবিত্র জাগতিক প্রীতি ও ঈশ্বর প্রীতির সহায়ক হয় এবং তা মঙ্গলের নিদান হয়ে উঠে। তবে দাম্পত্যপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তা সংসর্গজ। শুদ্ধ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হলে নরনারীর ভিতর তা জন্মলাভ করতে পারে না।

চন্দ্রশেখরের প্রীতি মূলত গ্রন্থের প্রতি। এই প্রীতিকে দাম্পত্যপ্রীতির সংগে যুক্ত করতে পারলে তা আদর্শ হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই ঘটনার সংঘাত সৃষ্টি করে চন্দ্রশেখরের মতো জ্ঞানীর অন্তরে দাম্পত্য প্রেমের আসন পেতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, দাম্পত্য প্রীতি থেকেই সর্বব্যাপিনী প্রীতির বিস্তার। রূপ, মোহ, ভোগতৃষ্ণা, অনুরাগ এই প্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একে কার্যকরী ও দুর্দমনীয় করে তোলে। আবার সামঞ্জস্য না করতে পারলে তা পাশববৃত্তির নামান্তর হয়ে সর্বনাশের কারণ হয়। চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে রূপের প্রতি যে বেগবান মোহ জেগেছিল, তাতে তিনি যদি বাড়িতে ফিরে অতৃপ্তকাম শৈবলিনীকে কাছে পেতেন, তাতে অন্য ধরনের পরিণাম ঘটতে পারত। তাই কঠিন আঘাত দিয়ে এই সুতীব্র মোহের বেগকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চন্দ্রশেখর পরে আবার গুরুর নির্দেশে 'পরহিতব্রত'-কে গ্রহণ করেছিলেন বলেই শৈবলিনীকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। তিনি গুরুর কাছ থেকে জেনেছিলেন, 'যেই পরোপকারী, সেই সুখী—অন্য কেহ সুখী নহে'। তাই চন্দ্রশেখরের দুর্দম প্রণয় সামঞ্জস্যের পথে অগ্রসর হয়েছে। এই সামঞ্জস্যের পথ ধরেই চন্দ্রশেখরের মধ্যে এসেছে মহত্ত্ব। তাই শাস্ত্র ও লোকাচারের উপরে এখানে প্রধান হয়েছে চন্দ্রশেখরের হৃদয়ধর্ম, প্রেম, পরোপকার ব্রত। দাম্পত্য প্রীতিতে স্বামীর এই ভূমিকাই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত।

অন্যদিকে শৈবলিনীর প্রেম তির্যক ও জটিল। স্বকীয় ও পরকীয় প্রেমের সংঘাতে সে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। শৈবলিনী বাল্যে প্রিয়া, কৈশোরে জায়া, যৌবনে পুনরায় প্রিয়া এবং প্রেমের অপ্রাপ্তিতে শেষ পর্যন্ত জায়া। শৈবলিনীর মধ্যে প্রেমের দুটি রূপই (প্রিয়া ও জায়া) বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করেছেন এবং শেষপর্যন্ত জায়ারূপকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত প্রেম-ভাবনার অনেকটা পূর্ণাঙ্গ চরিত্র প্রতাপ। তাঁর মতে 'অসার্থপরতা'ই প্রেমের যথার্থ স্বরূপ। প্রণয়ীর মঙ্গলের জন্য নিজের সুখভোগ ত্যাগেই প্রেমের সার্থকতা। 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিনী'। 'স্মরজ অনুরাগ'কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেম থেকে পৃথক করে দেখেছেন। তাঁর মতে তা কাম বা পাশববৃত্তি। এই পাশববৃত্তি যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়জয়ে ও চিত্তসংযমে সুসামঞ্জস্য হয়, সেই পরিমাণে তা প্রেম হিসেবে সার্থক। সুতরাং ধর্মবোধযুক্ত সংযত প্রেমই প্রেম, দাম্পত্য প্রেমেই তার পরাকাষ্ঠা।

তবে দাম্পত্য প্রেমের বাইরেও প্রেম থাকতে পারে। বালক-বালিকার বাল্যপ্রণয়কেও প্রেম বলেছেন। কিন্তু সেই প্রেমে অভিসম্পাত আছে। তাই তাকে গ্রহণ করতে পারেননি। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অভিসম্পাতের রুদ্র রূপের দ্বারা তাকে খণ্ডিত করেছেন। এরই ভিতর দিয়ে চিত্তসংযম, ইন্দ্রিয় জয় ও পরোপকার বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করে তিনি প্রতাপের প্রেমকে আত্মবিসর্জনে মহনীয় করে তুলেছেন। প্রেমের পাত্রের হিতার্থে তিনি যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। উপন্যাসের সমাপ্তি প্রতাপের জন্য অনন্ত পুণ্য, অনন্ত সুখ, অনন্ত প্রণয়লোক প্রাপ্তির কামনা নিয়ে। এই সংসারে এই প্রণয়স্বর্গ রচনার স্বপ্নই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন। কিন্তু সংসার যে নিজেই অপূর্ণ। এখানে রূপ আছে, রূপের মোহ আছে, পাপ আছে, স্বার্থ আছে, ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট আছে; আদর্শকে রূপায়িত করার পথে আছে বহু বাধা বিঘ্ন। এই বিঘ্নকে জয় করে আদর্শ প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আত্মধ্বংসী সংগ্রাম করেন যে প্রেমিক, তিনিই ধন্য। প্রতাপ সেই সংগ্রামী প্রেমিক।

মীরকাসেমও প্রেমিক। দলনীকে তিনি ভালোবাসতেন। এমনকি দলনীর কবরের কাছে তাকে কবর দেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসেব বিভ্রান্তিতে সেই প্রেমের করুণ পরিণতি সংঘটিত হয়। অন্যদিকে দলনী একনিষ্ঠ প্রেমিকা। সে প্রেমেব পবিত্র কুসুম। দলনী একনিষ্ঠ প্রেমে আত্মত্যাগিনী। দলনীর প্রেমকে মাধুর্যমণ্ডিত করলেও বৃহত্তর স্বার্থে এ প্রেম অকিঞ্চিৎকর। আত্মসুখের আবেগে যার স্থিতি, বিষপাত্রই তার পরিণাম। প্রীতির এই দিক নীতিবেত্তা বঙ্কিমের সমাজ বিশ্লেষণের অনুসারী।

ষোল

শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ঃ যাথার্থ্য বিচার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে সামাজিক পাপ, পুণ্য, নীতি, তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন রচনায় সামাজিক আদর্শ নীতির একটি বিশিষ্ট রূপকে রূপায়িত করেছেন। কোথাও তা পাপের বিষময় ফল অঙ্কন করে (বিষবৃক্ষ), কোথাও অবৈধ প্রেমের পরিণামী চিত্র এঁকে (কৃষ্ণকান্তের উইল), চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের জয় ঘোষণা করার জন্য শৈবলিনীর তির্যক প্রেমজনিত পাপবোধকে স্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন।

পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হিন্দু শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান রয়েছে। সমাজে যেহেতু নর-নারীর হৃদয় ঘটিত অথচ সমাজ দ্বারা অনুমোদিত প্রেম যথার্থ নয়, তাই সেই প্রেমের পরিণাম ভয়াবহ। এমনকি স্বামী থাকা সত্ত্বেও অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি সমাজ বিগর্হিত। তাই সেই পাপের জন্য প্রয়োজন প্রায়শ্চিত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন। যেহেতু যে কোন অপরাধ শাস্তিলাভের যোগ্য, সেজন্য শৈবলিনীকেও শাস্তি পেতে হয়েছিল এবং তাই উপন্যাসে তার প্রায়শ্চিত্তের অবতারণা।

'কৃষ্ণকান্তের উইল-এ' রোহিণীকে বঙ্কিমচন্দ্র যে মানদণ্ডে দেখেছেন সেই একই নৈতিক দৃষ্টিতে শৈবলিনীকে বিচার কবেছেন। দুটি উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের জয় ঘোষণা কবতে গিয়ে তির্যক প্রেমকে অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। সেজন্য ব্যভিচারী রোহিণীর মৃত্যু ও পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি হল শৈবলিনী বিবাহিতা নারী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিল এবং তার এই কাজ সমকালীন সামাজিক রীতি-নীতিকে আঘাত করেছিল। সুতরাং তাকে স্বামীগৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন তার প্রেমিকের আত্মত্যাগ ও শৈবলিনীর প্রাযশ্চিত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত পর্বকে বিশদরূপে উপন্যাসে বর্ণনা দিয়েছেন। তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে এবং চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই প্রায়শ্চিত্ত পর্বকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একদিকে শৈবলিনীর স্বেচ্ছাকৃত প্রায়শ্চিত্ত এবং রমানন্দ স্বামী নির্দেশিত কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার ব্রত। শৈবলিনীর স্বেচ্ছাকৃত প্রায়শ্চিত্ত যদিও তার পাপের স্খালনজনিত হয় তাহলে রমানন্দ স্বামী নির্দেশিত ব্রত ও কৃচ্ছ্রসাধন স্বামীগৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সোপান।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন মনুষ্যবৃত্তির যথার্থ বিকাশের প্রধান অন্তরায় হল অসংযম, ইন্দ্রিয়শক্তি। তাই চিত্ত সংযম, ইন্দ্রিয় জয় মানব চরিত্রের আসল শক্তির উৎস।

শৈবলিনী যেহেতু ছিলেন রিপুতাড়িত অসংযমী ও অতৃপ্ত কামনার জন্য পথভ্রষ্টা, তাই তাকে পরিশুদ্ধা করার প্রয়োজন ছিল। 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসেও প্রফুল্লকে দেবী চৌধুরানীতে পরিণত হওয়ার জন্য ধর্মতত্ত্ব ও অনুশীলন তত্ত্বের ক্রিয়াকর্মে অনুশীলিত করেছেন। সেরকম শৈবলিনীকেও প্রায়শ্চিত্তের মুখোমুখি করিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন "মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ, সকলের এক-একটি বহ্নি আছে। সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে। .....জ্ঞানবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নি, রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, ইন্দ্রিয় বহ্নি—সংসার বহ্নিময়।" (কমলাকান্তের দপ্তর)

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যে ব্যক্তির চিত্ত সংযম নেই, ইন্দ্রিয়জয়ে যে অসমর্থ, সে আগুনে পুড়ে মরে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এই বহ্নিদাহ নানাভাবে দেখানো হয়েছে। 'বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গ'দের ভিতর শৈবলিনী বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'পাপিষ্ঠা'। এই পাপিষ্ঠাকে তিনি পুড়িয়ে মারেননি। অগ্নিদাহে পক্ষদগ্ধ পতঙ্গের মতো জীবিত রেখে তাঁকে ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ হিসেবে পার্বত্য গুহায় শৈবলিনীর অনশনে দুদিন কেটেছে। তারপর বিভীষিকাময় নরক দর্শনের শুরু। অস্পষ্ট আলোকে সে দেখেছে রক্তের নদী, পচা গলিত শব, স্রোতে বয়ে আসা কঙ্কালের মালা এবং অস্থিময় কুম্ভীরসমূহ। রমানন্দ স্বামীর কঠোর নির্দেশ তাকে রুধিরের নদী সাঁতার দিতে সাহায্য করেছে। কেননা এই নরক থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত উদ্‌যাপন। এই ব্রতের নিয়মগুলি হল— (অ) গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্মাণ করে তাকে ভূতলে শয়ন করতে হবে। (আ) ফলমূল পত্র ছাড়া অন্য কিছু ভোজন করতে পারবে না এবং তাও দিবারাত্রিতে একবার। (ই) তাকে জটাধারণ করতে হবে এবং দিনান্তে ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করে নিজের মুখে তার পাপকীর্তন করবে। (ঈ) যদি সপ্তাহকাল দিবারাত্র সে একমাত্র স্বামীর ধ্যান করে, অন্য চিন্তা মনে স্থান না দেয়, তবে সে তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। শৈবলিনী এই ব্রত পালন করার পর চন্দ্রশেখরের পৌরুষদীপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হন।

উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখর প্রতাপকে শৈবলিনী সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব।" লোকরঞ্জনের প্রসঙ্গ থাকায় একথা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে চন্দ্রশেখর সামাজিক অনুশাসনকে ভয় পেতেন এবং শৈবলিনীকে পুনরায় গ্রহণের ক্ষেত্রে তাই প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য লেখকের দিক থেকে তা চিত্তশুদ্ধি। এই চিত্ত শোধনের একটি পদ্ধতি হল প্রায়শ্চিত্ত। চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাই ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, "মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর —ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্যপথ বন্ধ কর—

মনের শক্তি অপহৃত কর–মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে–তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।" এভাবেই এক মন এক প্রাণ হয়ে শৈবলিনী স্বামীকে ধ্যান করতে শিখেছিল। এও প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ। এই প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে এসেছে যোগবলের প্রসঙ্গ।

এখন প্রশ্ন হল, শৈবলিনীর এই প্রায়শ্চিত্ত কতটা শিল্পসম্মত? বর্তমান দিনে শৈবলিনীর অপরাধ (স্বামী বর্তমানে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি) গর্হিত অপরাধ নাও হতে পারে, কিন্তু হিন্দু পুনরুজ্জীবনের কালে শৈবলিনীর অপরাধ ছিল সমাজ নীতি বহির্ভূত। তাই তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। কিন্তু শৈবলিনীর অপরাধ তো সাধারণ অপরাধ নয়, তাই সে অপরাধের বিচারের জন্য রাজদরবারের প্রয়োজন নেই। তার অপরাধ হৃদয়ের অপরাধ, ভালোবাসার অপরাধ। বাল্যে ও কৈশোরে সে যাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল তাকে সে বিয়ে হওয়ার পরও ভুলতে পারেনি। এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু উচ্চনৈতিক আদর্শের বেদীমূলে অনেক জায়গায় হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলিও বলি দিতে হয়। শৈবলিনী তা পারেনি বলেই সমাজনীতির দিক থেকে অপরাধী। অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অভিমত। শৈবলিনীর হৃদয় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল বলেই সমষ্টিগত কল্যাণকে তা আঘাত করেছিল। যে পারিবারিক ধর্ম হিন্দু সমাজ সংস্কৃতিকে যুগ যুগ ধরে বেঁধে রেখেছে, শৈবলিনী সেই ধর্মকে উপেক্ষা করেছিল। সেজন্যই প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে হৃদয়শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই নৈতিক আদর্শকে অটুট রাখার প্রেরণাতে রোহিণী ও কুন্দনন্দিনী প্রাণ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। কিন্তু শৈবলিনীর জন্য তিনি অন্যরূপ ব্যবস্থা করেছেন। তিনি দান্তের অনুকরণে শৈবলিনীর চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রতাপের মৃত্যুকে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের উপর 'কঠিন পরিহাস' বলে মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ও রমানন্দ স্বামীর যোগবলের প্রয়োগের পরও প্রতাপের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেননি। আসলে প্রতাপের আত্মত্যাগ পরহিতব্রত। অন্তত নীতিবাদী বঙ্কিমের দৃষ্টিতে তাই। সেজন্য শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তও নীতিবাদী বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত। বঙ্কিমচন্দ্র এই নৈতিক আদর্শকে অটুট রাখবার প্রেরণাতেই রোহিণী ও কুন্দনন্দিনীকেও শাস্তি দিয়েছেন। রোহিণী ও কুন্দনন্দিনী নিজের প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে এবং শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের পর প্রতাপ প্রাণ দিয়ে সেই প্রায়শ্চিত্তের ফলকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। যাতে আর কোনদিন শৈবলিনীর পদস্খলন না হয়, অন্তত সে সুযোগ না থাকে। যেহেতু শৈবলিনী প্রতাপকে জানিয়েছিল "তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।" প্রায়শ্চিত্তকে চিত্ত পরিশুদ্ধির উপায় বলে ভাবলে এবং কার্য-কারণসূত্রে তা বিধৃত হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ নিশ্চয় আছে। কিন্তু শিল্প বিচারে এই ঘটনা পাঠকের মনে প্রশ্নচিহ্ন রেখে যায়।

সতের

ট্রাজেডি বিচার ঃ "যে যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? যাকে পায় তাকেই বা চায় না কেন?"

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের পরিণতি মিলনান্ত হলেও উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির পরিণতি ট্রাজিক। উপন্যাসের প্রধান পাঁচটি চরিত্র—প্রতাপ, শৈবলিনী, চন্দ্রশেখর, দলনী এবং মীরকাসেম। তারা যা চেয়েছিল তা তো পায়নি, বরং তার পরিবর্তে যা পেল, তা তারা চায় না। তাই তাদের সেই পরিণতি ট্রাজিক। এই ট্রাজেডি মূলত অদৃষ্ট তাড়িত। প্রত্যেকেরই পরিণতি প্রেমের অচরিতার্থতাজনিত।

গ্রীক ট্রাজেডিতে ঘটনা ও চরিত্রের পরিণামের পেছনে থাকে অদৃশ্য নিয়তির অনির্দেশ্য ক্রিয়া। তাকে চোখে দেখা যায না, কিন্তু সমগ্র নাটকে তা-ই নিয়ন্ত্রী শক্তি। মানুষের শৌর্য, পৌরুষ, মহত্ত্ব ও বৃহত্ত্বকে তুচ্ছ করে কোন্ রন্ধ্র পথে দুর্জয় নিয়তির দুরন্ত ক্রোধ নেমে আসে এবং চিরার্জিত গৌরবকে অচিরে ধূলিসাৎ করে হৃদয়কে মুহূর্তে চকিত ও বিমূঢ় করে তোলে। গ্রীক নাটকের পাত্র-পাত্রী এই নিয়তির হাতের ক্রীড়নক। নিয়তির হাতে মানুযের নিরতিশয় লাঞ্ছনার শোচন সঙ্গীতই গ্রীক ট্রাজেডি। চন্দ্রশেখব উপন্যাসে পাঁচটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে রয়েছে এই শোচন-সঙ্গীতের সুর। বিষবৃক্ষের পরিণতিও এই ধরনের। ঝটিকাশান্ত ধরণীর শ্যামসৌন্দর্যে ঝড়ের ক্ষতচিহ্ন যেমন বিষাদময়, নগেন্দ্র-সূর্যমুখীব মিলনকেও সুখময় করে তোলেনি। সুখের মধ্যে জীবন-ট্রাজেডির এই কারুণ্য আবও গভীর এবং মর্মবিদারী; এ যেন সুনিবিড় ছায়ায় উদ্যত তীক্ষ্ণধার অসি।

শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের প্রবল প্রেম ছিল মহাবেগবতী নিরুদ্ধ নির্ঝরের মতো। কিন্তু এই প্রেম ত্যাগে পরিসমাপ্ত হলেও সেই পরিণতি ট্রাজিক। প্রতাপ প্রেমিক হলেও সংগ্রামী প্রেমিক। প্রতাপ যেদিন বুঝেছিল, জ্ঞাতিকন্যা বলে শৈবলিনীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়, তখন তিনি গঙ্গায় ডুব দিতে চেয়েছিলেন। সে যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন ঠিকই। কিন্তু কঠিন পরীক্ষায় তাকে আত্মবিসর্জন দিতে হল, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হল। মৃত্যুর পূর্বে রমানন্দ স্বামীর কাছে তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—"এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম।" অথচ এই প্রতাপ একদিন বিপন্ন শৈবলিনীকে ম্লেচ্ছের হাত থেকে রক্ষা করেছিল. প্রতাপ নিজে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আবার শৈবলিনীর প্রবৃত্তির কলুষ মূর্তি দেখে তাই তিনি নিঃশব্দে পালিয়ে গিয়েছেন। প্রবৃত্তি-তাড়িত মোহের সংসারে এ অতি কঠিন আত্মজয়, বজ্রকঠোর নীতি ও সংযমের পরিচয়। তবুও শেষপর্যন্ত তাকে সেই শৈবলিনীর জন্য মরতে হল। এই মৃত্যু তাই পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে ট্রাজিক।

দলনীর পরিণতিও ট্রাজিক। এই পরিণতি অদৃষ্টতাড়িত ও স্বাভাবিক। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা ও নির্ভরতা, স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় স্ত্রীর বিচলিত মনোভাব অতি পরিচিত স্বভাব। সেই স্বভাব-ই অদৃষ্টের পরিহাসে বড় নির্মম হয়ে দেখা দিল। দলনীর জীবনের ট্রাজেডি ক্রূর দৈবের নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো। কারণ নির্মম দৈব নিরীহকেও রেহাই দেয় না, দলনীকেও দেয়নি। অর্থাৎ প্রেমিকা দলনীর প্রেমের মধ্যেই এমন একটা ছিদ্র ছিল, যা তার নিষ্ঠা ও পবিত্রতা সত্ত্বেও শোচনীয় পরিণামের কারণ হয়ে উঠেছে। দলনী নিজেই বলেছে, 'আমি হাজার দাসীর মধ্যে একজন বৈ ত নই। .....আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন?'' অথচ দলনী তা-ই করেছিল। প্রেমিকা দলনী অন্তঃপুরিকা হয়েও স্বামীর অনুমতি না নিয়ে অসমসাহসে রাজপথে বের হয়েছিল। যাকে তিনি স্বামীর মঙ্গলকর মনে করেছেন, তা সত্যই দেশের নবাবের পক্ষে মঙ্গলকর কিনা তাও বিচার করে দেখেননি। দলনীব প্রেম একনিষ্ঠ ও পবিত্র হলেও আত্মসুখপরায়ণ। তাই তার পরিণতি ভয়াবহ।

আসলে দলনীর যে অন্ধ প্রেম পরের কথা ভুলে নিজের প্রিয়জনকেই শুধু রক্ষা করতে চায়, তা যতই একান্ত হোক, মহৎ নয়। আত্মসুখান্বেষী আবেগ, আবেগ-প্রসূত অসম তেজ ও স্পষ্টভাষণ দলনীর প্রেমকে মাধুর্যমণ্ডিত করলেও বৃহত্তর স্বার্থে এ প্রেম অকিঞ্চিৎকর। আত্মসুখের আবেগে যার স্থিতি, বিষপাত্রই তার পরিণাম। সুতরাং দলনীর জীবনে আছে শুধু বাইবের শক্তিব নির্মম প্রকাশ। নিয়তি তার পবিণামের জন্য যে ন আগে থেকেই প্রস্তুত করেছিল।

শুধু দলনী নয়, নবাব মীরকাসেমের জীবনেও ট্রাজেডির রূপ লক্ষ করা যায়। মীরকাসেমের পরিণতির মধ্যে রয়েছে তার স্বভাব। মীরকাসেমের প্রেম বিচারমূঢ় বলেই দুষ্টের রটনায়, বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। তাই. প্রেমের মাধুর্যে বঞ্চিত হয়ে সে কন্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভরতাই গভীর প্রেমের আশ্রয়। বেশির ভাগ প্রেমের মর্মান্তিক করুণ পরিণাম এই বিশ্বাসের বিভ্রান্তিতে। এ তো গেল ব্যক্তি মীরকাসেমের ট্রাজিক রূপ। সম্রাট মীরকাসেমও ট্রাজিক পরিণতির শিকার। সেনাপতি গুরগণ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, তকি খাঁর প্রতিকূল আচরণ ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নবাবের পরাজয় তার সম্রাট সত্তার পরিণতিকে সূচিত করে। অন্যদিকে দলনীর প্রেম ও আনুগত্য তাকে যে সাম্রাজ্যের অধিকারী করেছিল, তা থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন। সম্রাট সম্মান ও দলনীর প্রেম কোনকিছুই তার জুটল না। এদিক থেকে মীরকাসেমের পরিণতি ট্রাজিক।

শৈবলিনীর জীবনে যে পরিণতি তা তার স্বভাবপ্রকৃতি থেকে জাত। তার অশান্ত প্রবৃত্তির দুর্দম প্রেম-পিপাসা তার নিয়তিরূপে কাজ করেছে। দলনীর পরিণাম যেমন

ভয়াবহ, তেমনি ভয়াবহ শৈবলিনীর পরিণাম। দলনীর মৃত্যুতে তার জীবনের পরিণাম সমাপ্ত হলেও শৈবলিনীর জীবনে বেঁচে থাকার মধ্যে সমাজ অননুমোদিত প্রেমের কাঁটা তাকে আমৃত্যু বিদ্ধ করতে থাকবে, এই চিন্তা তাকে অবক্ষয়িত করেছে। প্রায়শ্চিত্তের পর চন্দ্রশেখরের গৃহে শৈবলিনীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা কাব্যিক দিক থেকে কল্যাণকর হলেও প্রতাপের মৃত্যু সেই কল্যাণবোধকে কি পীড়িত করবে না? চন্দ্রশেখরের পত্নীর জীবনের বাকী কয়দিন বাঁচার যে আনন্দ, সেই আনন্দকে কি নিরানন্দময় করে তুলবে না প্রতাপের আত্মবিসর্জন? শৈবলিনীর নরক দর্শনের পর তার পুনরায় সুখী পরিবারে ফিরে আসার স্বপ্ন কি সত্যিই নরক হয়ে উঠবে না? এই জিজ্ঞাসাগুলির মধ্যে রয়েছে শৈবলিনীর ট্রাজিক পরিণতির মূল সুর। জীবনের যে সুর-সঙ্গীত কেড়ে নিয়ে গেল প্রতাপ তা কি শৈবলিনীর পরবর্তী জীবনে কাঁটা হয়ে তাকে নিয়ত বিদ্ধ করবে না?

চন্দ্রশেখরের পরিণতিও ট্রাজিক। তার কারণ স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি তার নির্লিপ্ত আচরণ। জ্ঞান ও রূপের দ্বন্দ্ব থেকেই তার জীবনে নেমে এল করুণ পবিণতি। তিনি রূপের মোহে শৈবলিনীকে বিয়ে করেছিলেন, তখন তাঁর জ্ঞান ছিল সুপ্ত। কারণ তিনি জেনে শুনেই প্রতাপের প্রেমিকাকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ে করে তিনি তার জ্ঞানপিপাসাকে বড় করে তুলতে গিয়ে শৈবলিনীর প্রতি উপেক্ষা করলেন। এই উপেক্ষা থেকেই শৈবলিনীর বাড়ী থেকে চলে যাওয়া। তারপর সেই পদস্খলিতা শৈবলিনীকে গ্রহণ করতে হয়েছে রমানন্দ স্বামীর নির্দেশে। তখনও তিনি জানেন শৈবলিনী প্রতাপের কথা ভুলতে পারেনি। এমনকি প্রতাপের মৃত্যুও চন্দ্রশেখবকে উপলব্ধি করতে হল। শৈবলিনীকে নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবনের নীড় বাঁধার স্বপ্নও ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাঁর। পথের কাঁটা প্রতাপ রইল না ঠিকই, কিন্তু শৈবলিনীকে নতুন করে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সেই কাঁটা কি তাকে তিলে তিলে বিদ্ধ করবে না? কারণ চন্দ্রশেখর তো রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। চন্দ্রশেখরের মতো জ্ঞানী মানুষকেও সামাজিক বিধানে কলঙ্কিত স্ত্রীকে গ্রহণ করতে হল—এই পরিণতি কি সত্যিই করুণ নয়?

সুতরাং উপন্যাসের প্রধান পাঁচটি চরিত্রের পরিণতি ট্রাজিক। দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের সেই মহৎ বিনষ্টি যেমন ট্রাজিক তেমনি জীবিত তিনজনের পরিণতি ট্রাজিক এই কারণে যে তারাও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত এবং তাদের অসহায়তা তাদের কৃতকর্মের পরিণতি মাত্র। এই পরিণতি যতই অদৃষ্টতাড়িত বলে বলা হোক না কেন, তা আসলে তাদের নিজ নিজ স্বভাবেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ট্রাজেডি এই সূত্রেই বিচার্য।

আঠারো

সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান ঃ চন্দ্রশেখর

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "জেনে এবং না জেনে আমরা একদিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্যদিকে নিজের কালকে, রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে পরিতৃপ্তি সাধনা করা যায় সেখানে কোনো হিসাবের কথা চলে না।" ('পঞ্চাশোর্ধম্')। সুতরাং শিল্পী নিজের কালকে তাঁর শিল্পে যে প্রকাশ করেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সমকালীন সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ও উপাদানগুলি বাস্তবরূপে চিত্রিত হয়েছে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অষ্টাদশ শতকের সমাজভাবনা ও রাজনৈতিক রূপ উপস্থাপিত হয়েছে। তৎকালীন সামাজিক সমস্যা, দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ, সমাজে নারীর অবস্থান, সামাজিক বিধিনিষেধ, জাতিভেদ প্রথাব বিষময়তা, নবাবের সঙ্গে কোম্পানির, কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে এদেশীয় লোকের সম্বন্ধ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। মীরকাসেম ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে মতান্তরও তার কারণ, নবাব কর্তৃক যুদ্ধোদ্যম, নবাবকে কোম্পানির অপসারণের ইচ্ছা, জগৎশেঠদের নবাবের বিরুদ্ধাচরণ, উদয়নালার যুদ্ধ, তার পরিণাম ও নবাবের পলায়ন প্রভৃতি ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য।

চন্দ্রশেখরের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচবাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের উলমতাক্ষরীন্ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজী অনুবাদ আছে, ঐতিহাসিক বিষয়ে কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়াছি।" একথা সত্য এই কারণে যে, চন্দ্রশেখরের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে মীরকাসেম, গুরগণ খাঁ, সম্বর (বেগম সমরুর স্বামী), আমিয়েট, গলস্টন, জনসন, জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র।

মীরকাসেম যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়কে পটভূমিরূপে ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কাহিনি রচনা করেছেন। মীরকাসেমের রাজত্বকাল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ। মীরকাসেমের নবাবীলাভের কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশে এক ঘোর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং তার পরিণতিতে সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন। সিরাজদ্দৌলার পতনের পরেও এই বিশৃঙ্খলা সমগ্র দেশব্যাপী সুবিস্তৃত ছিল। সিরাজদ্দৌলার পর ইংরেজরা মীরজাফরকে নবাব করেছিল। কিন্তু তার অকর্মণ্যতায় বিরক্ত হয়ে তারা মীরকাসেমকে নবাব করল। মীরকাসেম নামে নবাব কিন্তু কাজে

ইংরেজরাই সর্বেসর্বা। এজন্য মীরকাসেম ইংরেজদেরকে সুনজরে দেখতেন না। তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন এবং সেখান থেকে ইংরেজদেরকে দমন করার পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

মীরকাসেম-এর সেনাপতি গুরগণ খাঁ ছিলেন নবাবের খুব কাছের ও নির্ভরযোগ্য লোক। কিন্তু গুরগণ নবাবের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মীরকাসেমের পতন ঘটলে তিনিই নবাব হয়ে বসবেন। শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে গুবগণের গোপন আলোচনায় এই ষড়যন্ত্রেরই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ঐ সময়টা ছিল সুযোগসন্ধানীদের যুগ। গুরগণ খাঁর উদ্দেশ্য ছিল নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে নিজের সুবিধা করে নেওয়া। এই যুদ্ধের পরিচয় রয়েছে উপন্যাসে। যুদ্ধের ফলে মীরকাসেমের পতন ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নবাব পদের অস্তিত্বটুকু লোপ পেয়েছে।

তাছাড়া ইংরেজদের সাম্রাজ্যলিপ্সা, উগ্র জাতীয়তাবোধ, কূটনৈতিক পারদর্শিতা, পরস্ত্রীলোলুপতা প্রভৃতি বিষয় সমকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে উপস্থাপিত করেছে উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই লিখেছেন, ''এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত। ফষ্টর অল্পকালেই সে রোগে আক্রান্ত হইযাছিলেন।''

উপন্যাসের এক জায়গায় সমকালীন ইংরেজদের রূপ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যকে উদঘাটিত করেছেন। ''এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই পরাভব স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই ভাল এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্যে অধর্ম আছে, অতএব অকর্তব্য। .....লরেন্স ফষ্টর এই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভ সম্বরণ করিলেন না—বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম শব্দ লুপ্ত হইয়াছিল।'' বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন ইংরেজদের ক্ষমতালোভ, স্বেচ্ছাচারিতা, জাত্যহঙ্কার, দেশীয় লোকদের প্রতি অবজ্ঞা ফস্টরেব মাধ্যমে অঙ্কন করেছেন। আবার রমানন্দ স্বামীর মাধ্যমে দেখিয়েছেন, ''এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্, বলবান্ এবং কৌশলময .....বোধ হয় ইহারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে।''

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে নবাবী আমলে বাঙালির ঐশ্বর্য, বীর্যবত্তা ও জ্ঞানগরিমা; নবাবী আমলের ভগ্ন দশায় চিত্রিত হয়েছে ষড়যন্ত্রের মসীময় চিত্র, নবাবের অসহায় অবস্থা, কোম্পানির কর্মচারীদের লোভ, হিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহার ছবি। বাংলার ধনসম্পদ, বাহুবল ও জ্ঞানচর্চার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মোহময় আকর্ষণ ছিল। প্রচলিত ইতিহাসে তিনি তার পরিচয় পাননি। আলোচ্য উপন্যাসে মুঙ্গের দুর্গের অন্তঃপুর চিত্রাঙ্কনে সুরঞ্জিত হর্ম্যতল', 'রজত দীপে গন্ধ তৈলে জ্বালিত আলোক', 'সুকোমল গালিচা',

'সুবর্ণনির্মিত কলমদান', শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশস্ত অট্টালিকায় 'শ্বেত মর্মর বিন্যাস শীতল মণ্ডপ', 'উজ্জ্বল স্বর্ণ-মুক্তা খচিত মসনদ', 'শেঠদিগের কণ্ঠবিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তাহার' প্রভৃতি সমকালীন বাংলার ঐশ্বর্য মহিমাকেই প্রকাশ করেছে।

আবার সমকালীন বাঙালির বীর্যবত্তার পরিচয়ও রয়েছে উপন্যাসে। প্রতাপের বীর্যবত্তা, উদ্যম, সাহস, অধ্যবসায় সমকালীন বাঙালির পরিচয়কেই প্রকাশ করে। ফষ্টরের বজরায় প্রতাপের তৎপরতা, তাঁর লগির আঘাতে 'তেলিঙ্গা সিপাহী'র দুরবস্থা; আর উদয়নালার প্রহসন যুদ্ধে প্রতাপের আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম সমকালীন বাঙালির বাহুবলের প্রকাশ। অন্যদিকে বাঙালির জ্ঞান তপস্যার নিদর্শন রয়েছে চন্দ্রশেখরের জ্ঞান চর্চার মধ্যে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য দর্শন, কল্প সূত্র, আরণ্যক ও উপনিষদ প্রভৃতি সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর অভিজ্ঞ ছিলেন।

সমকালীন যে সমস্ত রাজনৈতিক ও ইতিহাসসিদ্ধ ঘটনা উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে সেগুলি হল— (ক) মীরকাসেমের সঙ্গে ইংরেজদের উদয়নালার যুদ্ধ, (খ) মীরকাসেমের জ্যোতিষচর্চা, (গ) পরাজিত নবাবেব ফকিরী গ্রহণ প্রভৃতি। তাছাড়া নবাব মীরকাসেমের পরাজয়ের মূলে যে তাঁর সেনাপতি ও লোকেদের স্বার্থপরতা ও ভীরুতা, তা সমকালীন যুগের বাস্তব চিত্র। গুরগণ খাঁ আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার সমকালীন জীবনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তকি খাঁ।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সমকালীন নানা সামাজিক সমস্যা ও প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, সমাজ অননুমোদিত প্রেমের কথা। সমগ্র উপন্যাসে এই বিষয়টি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় সমাজ মেনে নেয়নি। আবার এই বাল্যপ্রণয়ের সূত্র ধরেই অতৃপ্ত ইচ্ছা থেকেই শৈবলিনীর গৃহত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। তারপর শৈবলিনীকে গৃহে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে পদস্খলিতা শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই সব ঘটনা সমাজ অননুমোদিত প্রেমের স্বরূপকে তুলে ধরার জন্যই ঘটেছে। অর্থাৎ সমকালীন সমাজে একজন গৃহবধূর পদস্খলন কোনমতেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে প্রায়শ্চিত্তের পর শৈবলিনীকে সমাজসংসারে পুনরায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ধর্মকেই জয়যুক্ত করেছেন। অন্যাসক্তা নারীকে সমাজে স্থান দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সুকঠিন হিন্দু সমাজধর্মের উপরে হৃদয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন। শৈবলিনীর আত্মশোধনের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নির্মম কঠোর সনাতন সমাজনীতিকে নয়, নব্যযুগের বিচারসহ সংস্কারমুক্ত নীতিকে গ্রহণ করে মানুষের হৃদয়ধর্মকে বড় আসন দিয়েছেন। চন্দ্রশেখর ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই সনাতনপন্থী হয়েও নবযুগচেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের উপর বিজয়ী হয়েছে মানবোচিত হৃদয়ধর্মের অনুশাসন। ঊনবিংশ শতকের নব্য-মানবতাবোধের স্বরূপ এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে যে প্রতিফলিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সমকালীন সামাজিক জীবনের যে অনুষঙ্গগুলি উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলি হল—

(ক) জ্ঞাতির মধ্যে নারী-পুরুষের বিবাহ অসিদ্ধ ছিল। তাই প্রতাপ শৈবলিনীর বিয়ে হয়নি। কারণ 'শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি'।

(খ) দরিদ্র বাড়ির মেয়ের বিবাহ কষ্টসাধ্য ছিল। তাই শৈবলিনীর বিবাহ সম্বন্ধে লেখকের উক্তি, "সৌন্দর্যের ষোলকলা পুরিতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে?"

(গ) বিবাহের ফলে কিম্বা সুন্দরী স্ত্রী থাকলে গৃহস্বামীর জ্ঞানলাভে বাধা ঘটে, এমন ধারণা ছিল। চন্দ্রশেখর এই ধারণা পোষণ করত। যেমন, 'দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্তই নিরুৎসাহ ছিলেন।' কিম্বা, 'চন্দ্রশেখর স্থির করিলেন, যদি বিবাহ করি, তবে সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না।' বিবাহে যে ঘটকের প্রয়োজন ছিল তার উল্লেখ আছে এই উক্তিতে—'চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন'।

(ঘ) গৃহবধূদের পুকুরঘাটে স্নান করতে যাওয়া, জলক্রীড়া, পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে আলাপচারিতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ ভীমা পুষ্করিণী তীরে শৈবলিনী সুন্দরীর স্নান ও আলাপচারিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

(ঙ) নারী যে ছদ্মবেশ ধারণ করে কার্যসিদ্ধি করতে পারত তার পরিচয় রয়েছে সুন্দরীর নাপিতানী ছদ্মবেশে ফষ্টরের নৌকায় অপহৃতা শৈবলিনীর কাছে যাওয়ার মধ্যে। শৈবলিনীও নবাবের কাছে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল।

(চ) নারীর জাতিভ্রষ্ট হওয়ার ভয় ছিল বলেই শৈবলিনীকে সুন্দরী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে বলেছে, 'ইংরেজ আমায় কেড়ে এনেছে—আর কি আমার জাতি আছে?'

(ছ) হিন্দু সমাজে যে ছুঁৎমার্গ ছিল, তার পরিচয় মেলে শৈবলিনীর উক্তিতে। শৈবলিনী খানসামাকে বলেছে, 'ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমাদের ছোঁওয়া খাব কেন?'

(জ) সামাজিক বিধিনিষেধ, ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য বোধ তখনকার সমাজে বদ্ধমূল ছিল। সুন্দরী যখন নাপিতানী ছদ্মবেশে শৈবলিনীর কাছে গিয়েছিল তখন শৈবলিনী সামাজিক বিধিনিষেধের উল্লেখ করেছিল। যেমন—শৈবলিনী সুন্দরীকে বলেছিল, 'যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয় তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখনও কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কেবল সুব্রাহ্মণপুত্রের বিবাহ দিবে?' আবার শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত, নরকদর্শন প্রভৃতির মধ্যেও ধর্মাধর্মবোধ ও পাপ-পুণ্য বোধের পরিচয় পাই।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক নানান প্রসঙ্গকে রূপায়িত করেছেন, শিল্পের খাতিরে।

উনিশ

নায়ক বিচার ঃ চন্দ্রশেখর

উপন্যাসে বা নাটকে নায়ক তিনিই হন, যিনি কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং doing ও suffering-ও তাঁরই। প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে সক্রিয় থেকে কিম্বা নিষ্ক্রিয় হলেও কাহিনির গতিদানে ও পরিণতিবিধানে নায়কের ভূমিকা থাকে অবিসংবাদিত। নায়ক বিচার জটিল হয়ে ওঠে তখন-ই যখন একাধিক ব্যক্তিত্ব কাহিনিকে নিয়ন্ত্রিত করে বা তাদের মিলিত প্রয়াসে কাহিনির গতি ও পরিণাম ত্বরান্বিত হয়। এই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে শিল্পীর উদ্দেশ্য প্রধান বিচার্য হয়ে ওঠে নায়ক বিচারের ক্ষেত্রে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে নায়ক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান দাবীদার তিনর্জন—প্রতাপ, চন্দ্রশেখর ও মীরকাসেম। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য বিচার করলে এই উপন্যাসে নায়ক অবশ্যই চন্দ্রশেখর। উপন্যাসে যে দাম্পত্য প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও পরহিতব্রতের মহিমা জ্ঞাপন করতে বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন, তা একমাত্র চন্দ্রশেখরের মধ্যেই লভ্য।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে গল্পাংশ দুটি আখ্যায়িকায় বিভক্ত—(এক) প্রতাপ-শৈবলিনী চন্দ্রশেখর কাহিনি। (দুই) মীরকাসেম-দলনী কাহিনি। এই দুটি কাহিনিতে প্রধান পুরুষ চরিত্র তিনটি—প্রতাপ, চন্দ্রশেখব ও মীরকাসেম। এই তিনজন-ই নায়ক হওয়ার যোগ্য এবং তিনজনই কাহিনিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এখন এই তিনজনের নায়কত্বের দাবী নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমেই প্রতাপের নায়কত্ব নিয়ে আলোচনায় আসা যেতে পারে। উপন্যাসে প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেম বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এবং তা-ই আকর্ষণীয় ঘটনা। কাহিনি শুরু হয়েছে উভয়ের ঘটনা দিয়ে। উপন্যাসে প্রতাপের প্রেমিকসত্তা শুধু বড় হয়ে ওঠেনি, প্রেমের জন্য সে আত্মবলিদান দিয়েছে। সে শুধু প্রেমিক নয়, সংগ্রামী প্রেমিক। তার শৌর্য, বীরত্ব ও সংগ্রাম নায়ক হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল প্রেমভাবনার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রতাপের মধ্যে আঁকতে। কারণ ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিনী'। তাছাড়া দাম্পত্য প্রেমের বাইরে যে প্রেম থাকে তা চিত্রিত করবার জন্য লেখক প্রতাপকে অবলম্বন করেছেন। শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের প্রবল প্রেম ছিল নির্ঝরের' মতো বেগবান। রমানন্দ স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুপথযাত্রী প্রতাপ তাই বলেছিল, 'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী। এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম জীবনবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।"

শুধু জীবনবিসর্জনই প্রতাপের প্রেমের মহত্ত্ব নয়, তার চেয়ে বড় হল সে প্রেমকে সমস্ত কলুষ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে। এই মহত্ত্ব ও সংগ্রাম একমাত্র প্রতাপ চরিত্রেই লক্ষ করা যায়।

এমনকি প্রতাপের কাহিনি দিয়ে যেমন উপন্যাসের কাহিনির আরম্ভ, তেমনি প্রতাপের আত্মবিসর্জনে কাহিনির সমাপ্তি। উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্ত্যব্যাপী প্রতাপ তার সক্রিয়তাকে কায়েম করেছে। কাহিনির মধ্যে গতিসঞ্চারের ক্ষেত্রেও প্রতাপের ভূমিকা যথেষ্ট। সুতরাং প্রতাপের নায়কত্বের ক্ষেত্রে মূল দাবীগুলি হল—

(ক) কাহিনির শুরু ও শেষ প্রতাপকে দিয়ে।

(খ) দাম্পত্য প্রেম ছাড়া অন্য প্রেমের স্বরূপ প্রতাপে'র মাধ্যমে চিত্রিত।

(গ) উপন্যাসের নায়িকা শৈবলিনীর প্রেমিক হল প্রতাপ।

(ঘ) কাহিনিতে সক্রিয়তা, পৌরুষ, বীরত্ব, পরার্থপরতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণের বিষয়ে প্রতাপ একজন যথার্থ নায়ক।

(ঙ) গ্রীক ট্রাজেডির নায়কের মতো প্রতাপ ভাগ্যহত।

(চ) প্রতাপের পরিণতি ট্র্যাজিক বীরের মতো।

কিন্তু প্রতাপ নায়ক নয় এই কারণে যে—(ক) ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল দাম্পত্য প্রেমের রূপকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া, প্রতাপের মধ্যে তার প্রকাশ সম্ভব ছিল না। (খ) প্রতাপের মৃত্যু হলেও তার মধ্যে শেষের suffering দেখানো হয়নি। (গ) ইতিহাস অংশের কাহিনির সঙ্গে প্রতাপের যোগ সামান্যই। সুতরাং তার বীরত্ব, প্রেম ও আত্মত্যাগ পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হলেও নায়কত্বের দাবিতে সে কিছুটা চন্দ্রশেখরের থেকে পিছিয়ে।

এরপর মীরকাসেমের নায়কত্বের দাবী নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। মীরকাসেম নায়ক হবার মতো গুণের অধিকারী। কারণ তিনি একাধারে সম্রাট ও প্রেমিক। তাঁর স্বাধীনচিত্ততা ও দৃঢ়তা। ইংরেজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তাঁর ভূমিকা নায়কোচিত। ইংরেজের সঙ্গে সংঘাতে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও আত্মমর্যাদা ও প্রজার কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু তাঁর অধীন সেনানায়ক ও শেঠ ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি পর্যুদস্ত হয়েছেন। এমনকি তিনি দলনী সম্বন্ধে খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে তাঁর যে পরিণতি, তাতে পাঠকের কাছে তা ট্রাজিক সংবেদন জাগিয়ে তোলে। তবুও বলা যায়, মীরকাসেম উপন্যাসের নায়ক নন। তিনি ইতিহাস অংশের ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রণ করলেও উপন্যাস অংশে তাঁর যোগ সামান্যই। উপন্যাসের সামগ্রিক ঘটনাধারায় তাঁর যোগ খুব কম। তাছাড়া দলনী সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তে যে মূর্খতার প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাঁকে উপন্যাসের নায়ক বলা যায় না।

সুতরাং চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নায়ক। কারণ তাঁর নামেই উপন্যাসের নামকরণ এবং তাঁর মাধ্যমেই ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। পরহিতব্রতধারী আদর্শ মানুষ হিসেবে সমগ্র উপন্যাসে চন্দ্রশেখর অনন্য। চরিত্রের বিশুদ্ধতায়, স্নিগ্ধতায়, প্রতিটি মানুষের প্রতি ক্ষমার আদর্শে, জ্ঞানতপস্যায় ও ধর্মনিষ্ঠায় চন্দ্রশেখর মনুষ্যধর্মের বিশেষ আদর্শ। শুধু পরোপকার নয়, দুঃখের আঘাতেও তিনি অবিচল থেকেছেন। প্রতাপের আত্মবিসর্জন মহৎ

সন্দেহ নেই কিন্তু চন্দ্রশেখরের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আদর্শও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। চন্দ্রশেখর সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। পরোপকার-এর জন্য তিনি শত্রু-মিত্র ভেদ ভুলেছেন। পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত বলেই অন্ধকার রাজপথে পরিত্যক্ত দলনী কুলসমকে আশ্রয় দিয়েছেন। আবার প্রতাপ যখন ফষ্টরবধে কৃতসঙ্কল্প হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে তখন তাকে চন্দ্রশেখর-ই বলেছেন, 'ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান তাহার দণ্ডবিধান করিবেন।'—এই যে শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান তা তাঁকে নায়কের মহিমায় অভিষিক্ত করেছে।

চন্দ্রশেখরের নামে গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেও রয়েছে নায়কত্বের দাবী। চন্দ্রশেখর যে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র তা উপলব্ধি করা যায় তখনই, যখন দেখি অন্যান্য চরিত্র যেখানে স্খলন-পতনের আবর্তে বিপর্যস্ত, সেখানে চন্দ্রশেখর ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বাতিঘরের প্রদীপের মতো স্থির। প্রতাপও শেষ পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের পদধূলি নিয়ে বলেছে, 'আপনিই মনুষ্য মধ্যে ধন্য'।

এমনকি শৈবলিনী সম্পর্কে চন্দ্রশেখরের আচরণ ও সিদ্ধান্তও তাঁর মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করে তোলে। তা না হলে অন্যাসক্তা স্ত্রীকে তিনি কেনই বা গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর হৃদয়ের ঔদার্যে স্ত্রীকে ক্ষমা করেছেন। তিনি জ্ঞানতপস্বী হলেও বিবেকী মানুষ। প্রেম তাঁর গাঢ়, গূঢ় ও গভীর। মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ তাঁর মধ্যে বর্তমান। মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানের আদর্শ। তাই তাঁর নামে নামকরণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এদিক থেকেও চন্দ্রশেখর নায়ক হওয়ার উপযুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শও চন্দ্রশেখর। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের নায়কের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের সেই স্বরূপকে আঁকতে চেয়েছেন। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, দাম্পত্য-প্রীতি সর্বব্যাপিনী-প্রীতির সোপান। এদিক থেকেও চন্দ্রশেখর নায়ক পদবাচ্য।

তাছাড়া চন্দ্রশেখর একাধারে জ্ঞানী, ব্রহ্মচারী, স্বামী ও প্রেমিক। তাঁর প্রেম প্রদীপ হয়ে সংযত, ক্ষমাসুন্দর, উজ্জ্বল প্রেমের পথকে প্রদীপ্ত করেছে। নায়কোচিত এই বৈশিষ্ট্য প্রতাপ ও মীরকাসেমের মধ্যে নেই।

কাহিনির প্রধান চারটি চরিত্রের উপর প্রতাপের দিক থেকে চন্দ্রশেখর নায়ক হওয়ার যোগ্য। শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে বিয়ে করেছেন। আবার তাঁর শাস্ত্রচর্চা ও স্ত্রীর প্রতি অবহেলার কারণে শৈবলিনী গৃহত্যাগ করেছে। এই গৃহত্যাগের পেছনে কার্যকারণ সূত্র হল চন্দ্রশেখরের নবাবের কাছে জ্যোতিষচর্চার জন্য যাওয়া। অর্থাৎ একই সঙ্গে মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনির সংযোগে চন্দ্রশেখরের ভূমিকা সর্বাধিক। দলনী বেগমের জীবনও চন্দ্রশেখরের দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সেজন্য অসহায় দলনীকে সাহায্য করার জন্য চন্দ্রশেখর এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রতাপের গৃহে দলনীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিপন্ন দলনীকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদে তকি খাঁর কাছে প্রেরণ

করেছিলেন। অবশ্য দলনীর উপকার করতে গিয়ে চন্দ্রশেখর দলনীর সর্বনাশের একটি কারণ হয়েছে।

প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনিকেও চন্দ্রশেখর নিয়ন্ত্রণ করেছেন। চন্দ্রশেখর-ই একই বৃন্তে দুটি কুসুমকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। তাদের জীবনে ভালোবাসার প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। প্রতাপের মৃত্যুর জন্যও পরোক্ষে দায়ী চন্দ্রশেখর। আবার শৈবলিনীর পদস্খলনের পর তাকে গৃহে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সদর্থক ও কার্যকরী মনোভাব দেখিয়েছেন চন্দ্রশেখর। এমনকি চন্দ্রশেখর যে স্ত্রীকে কত ভালোবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়, স্ত্রীকে ফষ্টরের অপহরণের পর হৃদয়-শোণিত তুল্য গ্রন্থরাজিকে পোড়ানোর মধ্যে। এই প্রেম তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত ছিল বলেই শেষপর্যন্ত তিনি শৈবলিনীকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন।

উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে যে ট্রাজেডির সুর ধ্বনিত হয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন চন্দ্রশেখর। প্রতাপের মৃত্যু নিঃসন্দেহে ট্রাজিক। কিন্তু চন্দ্রশেখরের পরিণতি আরও ট্রাজিক। কারণ চন্দ্রশেখর সেই স্ত্রীকে নিয়ে বাকী জীবন কাটাবেন, যে স্ত্রী তার প্রেমিককে বলেছিল, 'তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই'। অন্যাসক্ত নারীকে পুনরায় তাঁর গৃহে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চন্দ্রশেখর যতই মহত্ত্ব দেখাক না কেন, আসলে সেই মহত্ত্বের আড়ালে থেকে যায় জীবন যন্ত্রণার এক কাঁটা। প্রতাপের মৃত্যু শৈবলিনীকে আরও ব্যথিত করবে, আরও দোলায়িত করবে। আর সেই ব্যথা ও যন্ত্রণার নীরব সাক্ষী হতে হবে শান্ত, স্থিতধী চন্দ্রশেখরকে। এর থেকে দুঃখের আর কি হতে পারে। এই যে suffering—তা শুধুমাত্র চন্দ্রশেখরের।

তাই আপাতদৃষ্টিতে প্রতাপের পতন নায়কোচিত হলেও চন্দ্রশেখর যে যথার্থ নায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। উপন্যাসের পরিণতিতে তাই চন্দ্রশেখর নিঃসঙ্গ এক নায়ক, সেই পথে তার কোন সঙ্গী নেই। শাস্ত্রচর্চা ও মহত্ত্ব কিম্বা পরহিতব্রত কি পারবে এই নিঃসঙ্গতাকে কাটাতে? এই জিজ্ঞাসা থেকেই তাঁর চরিত্রের স্বরূপ আরও বেশি করে পাঠককে যন্ত্রণাকাতর করে তোলে বলেই তিনি উপন্যাসের নায়ক। সেজন্য সমালোচক সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, "'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নায়ক চন্দ্রশেখর শর্মা। উপন্যাসখানিতে দুটি আখ্যায়িকার ধারা; প্রতাপ ও শৈবলিনী এবং মীরকাশিম ও দলনী। প্রথমে কিছুটা পথ এ দুটি ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। শেষ পর্যন্ত সে সমান্তরাল রক্ষা করতে পারেনি। দুটিতে মিলে একটি হয়ে গিয়েছে, তার কারণ চন্দ্রশেখর শর্মা। .....এইভাবে চন্দ্রশেখরের মধ্যস্থতায় মৌলিক দুটি কাহিনি একটিতে পরিণত হল। কাউকে দিয়ে এ কার্য সম্ভব হত না। সম্ভব হয়নি। কাজেই গ্রন্থের নায়ক ও নাম চন্দ্রশেখর।" (বঙ্কিম সরণী)

কুড়ি

নায়িকা বিচার ঃ চন্দ্রশেখর

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দুটি কাহিনি। মূল কাহিনির কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র শৈবলিনী এবং উপকাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র দলনী। উপন্যাসের নায়িকা বিচারের ক্ষেত্রে এই দুজনের দাবী নানাকারণে সঙ্গত। শৈবলিনী প্রতাপের প্রেমিকা ও চন্দ্রশেখরের গৃহিণী। অন্যদিকে দলনী শুধু নবাব পত্নী নন, তিনি একজন একনিষ্ঠ প্রেমিকা ও আদর্শ রমণী। শৈবলিনী বাল্যপ্রণয়ে ব্যর্থ নায়কের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। দলনীও স্বামীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বেগাকুল হয়ে পথে বেরিয়েছে। শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরায় দাম্পত্য জীবনে ফিরে এলেও দলনী তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সেজন্য উভয়ের মধ্যে কে নায়িকা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

ইতিহাস অংশে দলনী উল্লেখযোগ্য চরিত্র। নায়িকা হওয়ার সমস্ত গুণাবলী তার রয়েছে। রূপে, গুণে, প্রেমে ও আদর্শে সব ক্ষেত্রেই তিনি যথাযথ এক ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী। মীরকাসেমের প্রতি দলনীর প্রেম ছিল ঐকান্তিক, তা নির্ভেজাল। দলনী স্ত্রী হয়ে চেয়েছিলেন তার স্বামী যেন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। আসলে দলনীর তীব্র, গতিময়, একমুখীন প্রেম-ই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে রসদ দান করেছে। আবার তা-ই তার করুণ পরিণতির জন্য পরোক্ষে দায়ী। রোমান্সের পটভূমি সৃষ্টির জন্য মীরকাসেমের সঙ্গে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণির বিরোধে দলনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দলনীর পরিণতিও মর্মস্পর্শী। প্রেমের একটি অতি পবিত্র, অতি কোমল, অতি সুন্দর কুসুম প্রিয়তমের আদেশ শিরোধার্য করে জগৎ থেকে বিদায় নিল। দলনীর প্রেম, দলনীর দুঃখ, দলনীর মৃত্যু শোচনীয় হলেও সুন্দর। তাই তার নাম নায়িকা পদের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই বিবেচ্য।

তবুও দলনী উপন্যাসের নায়িকা নয়। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে উপকাহিনির নায়িকা করেছেন এবং ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল দাম্পত্য প্রেমের স্বরূপকে তুলে ধরা, যা দলনীর মধ্যে চিত্রিত হবার অবকাশ ছিল না। বরং কপালকুণ্ডলার বিপরীতে যেমন মতিবিবিকে অঙ্কন করেছেন তেমনি শৈবলিনীর বিপরীতে দলনীকে উপস্থাপিত করে দাম্পত্য প্রেমের আদর্শকে স্থায়ী রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

শৈবলিনী রূপে-গুণে নায়িকা হবার উপযুক্ত। শৈবলিনী কখনও প্রিয়া, কখনও জায়া। বাল্যে প্রিয়া, কৈশোরে জায়া, যৌবনে পুনরায় প্রিয়া এবং প্রেমের অপ্রাপ্তিতে শেষ পর্যন্ত জায়া। এই যে চরিত্রের গতিময়তা তা নায়িকা চরিত্রের উপযুক্ত। শৈবলিনীর মধ্যে নারীর মোহিনী রূপ চিত্রিত। ঔপন্যাসিকের প্রধান উপজীব্য হল শৈবলিনীর মাধ্যমে দাম্পত্য প্রেমের স্বরূপকে তুলে ধরা। সেজন্য দাম্পত্য প্রেমের বিপরীতে সমাজ অননুমোদিত প্রেমের রূপকে অঙ্কন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের আসল লক্ষ ছিল বৈপরীত্যের মাধ্যমে নায়িকা শৈবলিনী চরিত্রকে রূপ দেওয়া। ঔপন্যাসিকের ইচ্ছার দিক থেকে শৈবলিনী যথার্থ নায়িকা।

শৈবলিনী রূপসী। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজে ঘটক হয়ে বিয়ে করেছিলেন। শুধু চন্দ্রশেখর নয়, শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিল ফষ্টরও। নবাব মীরকাসেমও স্বীকার করেছিলেন, তাঁর প্রাসাদে এমন সুন্দরী রমণী নেই। শুধু রূপের অধিকাবিণী নয়, ছদ্মবেশেও প্রতাপের সঙ্গে কিম্বা সুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনে তার বুদ্ধিমত্তার যে পরিচয় রয়েছে তাতে তাকে নায়িকার গুণসম্পন্না বলা যায়।

কাহিনি বিন্যাসের দিক দিয়েও শৈবলিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। উপন্যাসে যে ছয় খণ্ডে কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে, সেখানেও শৈবলিনীর স্বীকৃতি। একদিকে সমাজ অনুমোদিত প্রেমের রূপ অন্যদিকে দাম্পত্য প্রেমের রূপ—এই দুই রূপের প্রকাশে শৈবলিনী চবিত্রের উপযোগিতা যথেষ্ট। শৈবলিনী এই দুই ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এমনকি, রমানন্দ স্বামীর প্রয়োজনও ফুরিয়ে যেত যদি না শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হত। তাই শৈবলিনী নায়িকা হওয়ার যোগ্য।

আবার অন্যাসক্ত রূপে শৈবলিনীর রাগাতিশয়, চাতুর্য, কৌশল যেভাবে চরমে পৌঁছেছিল, তাতে শৈবলিনী নায়িকার মর্যাদা পেতেই পারে। কেননা, পরকীয়া প্রেমে সে কুলমর্যাদা লঙ্ঘন করে, কলঙ্কে ভয় পায না, নীতিব শাসন মানে না। এই প্রেমে শৈবলিনী অন্তঃপুরিকা হয়েও দুঃসাহসিকা' সেজন্য সে ফষ্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগেও পিছপা নয়। ইংরেজের নৌকায় বন্দী প্রতাপকে উদ্ধার কবার জন্য আমিয়টের বজরায় অনুসরণ করে পাগলামির ছলে প্রতাপকে নিয়ে শৈবলিনী গঙ্গাবক্ষে ভেসে বেড়িয়েছে। তার এই দুঃসাহসিকতার জন্য নবাব মীরকাসেমও বলেছে 'এ সামান্যা স্ত্রীলোক নহে'। প্রতাপও স্বীকার করেছেন, 'এ বাঘেব যোগ্য বাঘিনী বটে'। প্রিয়ার ভূমিকায় শৈবলিনী অশঙ্কিনী। এই গুণ নায়িকার-ই উপযুক্ত।

উপন্যাসে দলনীর আগমন শৈবলিনী চরিত্রকে সজীব করে তুলবার জন্য। শৈবলিনীকে প্রকাশেব জন্য দলনীর প্রয়োজন। শৈবলিনীর পাপিষ্ঠা স্বভাবেব জন্যই দলনীর পুণ্যবতী সত্তা, আবার শৈবলিনীর চরিত্রের জটিলতার বিপরীতে দলনীর সরল চরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। তাই শৈবলিনীই নায়িকা।

কারুণ্যের দিক দিয়ে শৈবলিনী চবিত্র নায়িকার উপযুক্ত। দলনীর পরিণামও করুণ, কিন্তু মৃত্যু সে কারুণ্যের উপর যবনিকা টেনে দিয়েছে। শৈবলিনীকে লেখক প্রাণে বিনাশ করেননি; নৈতিক শুদ্ধির বকযন্ত্রে ফেলে তার প্রিয়া সত্তাকে বিনষ্ট করে জায়ারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে বিষাদান্ত পরিণাম যেন আরও করুণ, আরও গভীর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। উন্মাদিনী অবস্থায় সুন্দরীকে সে বলেছে, 'কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আসবে, সে যেন আসে না—কোথা যেন এসেছি, সেখানে যেন আসি নাই—কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি না।'' জায়ারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েও এ বিভ্রান্তি থেকে শৈবলিনী মুক্তি পায়নি। এই যে অতৃপ্তির মধ্যে মিলন, তা যেন নতুন কোন বিপদের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে। এই suffering-এর জন্য দলনী নায়িকা নয়, শৈবলিনী-ই যথার্থ নায়িকা।

একুশ

পত্ররীতি ঃ চন্দ্রশেখর—বিষবৃক্ষ—চোখের বালি

বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনিবয়নের ক্ষেত্রে পত্ররীতির ব্যবহার করেছেন। তাঁর উপন্যাসের উপস্থাপন কৌশলের একটি বিশেষ দিক হল পত্র ব্যবহার। পত্র ব্যবহারের সাফল্য নির্ভর করে ঔপন্যাসিকের বোধশক্তি ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের উপর। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ঘটনার ক্রমবিকাশ এবং চরিত্র বিশ্লেষণে পত্র ব্যবহার রীতি ঔপন্যাসিকের মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে পত্রের গুরুত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও কাহিনির ধারাবাহিকতায় পত্র নাটকীয় রূপলাভ করেছে। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয়, রবীন্দ্রনাথও 'চোখের বালি'তে পত্ররীতির ব্যবহার করেছেন।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক রিচার্ডসন তাঁর 'পামেলা' উপন্যাসে পত্রমাধ্যম গ্রহণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা জগৎসিংহকে পত্র লিখেছেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে পত্রালাপ হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে পত্রের সাহায্যে পাত্র-পাত্রীর মানসিক অবস্থার পরিচয় দান করা হয়েছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ঔপন্যাসিব আঠারোটি পত্র সন্নিবেশ করেছেন। প্রত্যেকটি পত্রই ঘটনা বা চরিত্রে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের পত্রগুলি শিল্পকৌশলেব পক্ষে অপরিহার্য উপাদান। এইসব পত্র ব্যবহার স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত এবং শিল্পসম্মত। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের নিখুঁত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পত্রগুলির মধ্যে প্রকাশিত। এমনকি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশেও পত্রগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে পত্রকে ঘটনাসংযোগের বাহক হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন। এই উপন্যাসে পত্র বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। গুরগণ খাঁর কাছে দলনীর লিখিত পত্র সম্পর্কে লেখক নিজেই মন্তব্য করেছেন, ''এই পত্রকে সূত্র করে বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথলেন।'' দলনীর এই চিঠি গল্পের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। কুল্‌সম্ সহ দলনীর দুর্গ থেকে নিষ্ক্রমণ, দুর্গদ্বার নিরুদ্ধ হওয়ায় রাজপথে অসহায় অবস্থা ও চন্দ্রশেখর কর্তৃক প্রতাপের গৃহে আশ্রয়দান প্রভৃতি ঘটনা এই পত্রের পরিণামী ঘটনা।

অন্যদিকে নবাবের উদ্দেশ্যে লেখা দলনীর দ্বিতীয় পত্র কাহিনিকে জটিলতর করে তুলেছে। দলনীর চিঠি অনুযায়ী নবাব জানেন, দলনী প্রতাপের বাড়িতে আছে। তাকে আনার জন্য শিবিকা পাঠানো হল। কিন্তু শিবিকাবাহকেরা ভুলবশত দলনী ভ্রমে শৈবলিনীকে নবাবের কাছে হাজির করল। যার ফলে ঘটনার গতি অন্যদিকে প্রবাহিত হল। ইতিহাসের ঘটনা—ইংরেজ নবাবের বিরোধকে উদ্দীপিত করে তুলল। কারণ নবাব যখন জানতে পারল যে ইংরেজরা বেগমকে অপহরণ করেছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই নবাবের

প্রতিশোধলিপ্সা বেড়ে গেল। সেজন্য নবাব ইংরেজের প্রতি আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করল। এমনকি এই পত্রের দ্বারা আর একটি উদ্দেশ্যও চরিতার্থ হল। কেননা এই পত্র দলনীর মুর্শিদাবাদে তকি খাঁর কবলে পড়বারও সুযোগ সৃষ্টি করে দিল।

উপন্যাসে তকি খাঁর মিথ্যা চিঠি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলকাব্যে এই শ্রেণির পত্রকে কপট পত্র বলা হত। যেমন, ধনপতি যখন সিংহলে গেলেন, তখন দুর্বলার মন্ত্রণায় লহনা লীলাবতীকে দিয়ে ধনপতির নামেও খুল্লনার উদ্দেশ্যে কপট পত্র লিখিয়েছিলেন। যার দ্বারা সতীন খুল্লনার উপর অত্যাচার করার সুযোগ লহনার হাতে এসে গিয়েছিল। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে স্বার্থসন্ধানী তকি খাঁ নবাবের নামে মিথ্যা পত্র নবাবের কাছে নিয়ে গিয়ে চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। কেননা দলনী সম্পর্কে এই মিথ্যা সংবাদ নবাব মীরকাসেমকে উন্মত্ত করে তুলেছে।

এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন, "নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। ... এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সংবাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে— সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে— রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না। মীরকাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।" প্রেমিকের পত্রাদেশ প্রেমিকার মহান আত্মবিসর্জনের পথ মুক্ত করে দিল—'সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।'

এই চিঠিকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের জীবনে পূর্বনিমিত্তের ভয়ঙ্কর সূচনাও দেখিয়েছেন। নিজে ততটা বিশ্বাস না করলেও বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে বলেছেন, "দূরবর্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে। একথা যে সত্য এমত নহে; কিন্তু যে মুহূর্তে মুর্শিদাবাদ হইতে অশ্বারোহী দূত দলনীবিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল, সেই মুহূর্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল।" সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের এই বয়ান অনুযায়ী বোঝা যায় ঘটনাটি কাকতালীয় নয়।

'বিষবৃক্ষ' ও 'চোখের বালি'তে পত্ররীতি বিশেষ উপযোগী হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ' প্রেম-মনস্তত্ত্ব বিষয়ক উপন্যাস। প্রেম ও প্রবৃত্তির পরিণাম দেখানো এর অন্যতম লক্ষ্য। প্রবৃত্তিও যে অনেক সময় 'অনন্তকাল স্থায়ী প্রণয়'-এর রূপে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, নগেন্দ্রের রূপজ মোহ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বাত্রিংশতম পরিচ্ছেদে হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে প্রেম ও প্রবৃত্তির অন্তর্দ্বন্দ্বে উদ্ভ্রান্ত নগেন্দ্রের হৃদয় বিশ্লেষণে উপযোগী হয়েছে। আবার সূর্যমুখীর পত্রগুলিতে একদিকে যেমন নগেন্দ্রের অধঃপতনের ক্রমাভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে, অপরদিকে তেমনই তাঁর নিজের স্বামী-প্রীতি ও আত্মবিসর্জনের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

'চোখের বালি' উপন্যাসেও পত্ররীতি উপন্যাসের আঙ্গিককে সমৃদ্ধ করেছে। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত অনেকগুলি চিঠির মধ্যে বিংশ ও একবিংশ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত তিনটি চিঠি নায়ক-নায়িকার ভাগ্য নির্ধারণে ও কাহিনির মধ্যে গতিময়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আবার ৩৩ সংখ্যক পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত চিঠিটি উপন্যাসের তাৎপর্য এবং প্রয়োগ কৌশলের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিনোদিনীর চিঠিগুলি তাঁর রুচি, শিক্ষা-দীক্ষার পরিচায়ক। ৩৮ সংখ্যক পরিচ্ছেদে বিনোদিনীর বিহারীকে লেখা চিঠিটি ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শী বিচার শক্তির সমন্বয়ে নিটোল রূপ লাভ করেছে। পত্র-সাহিত্যের পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ এভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাপিয়ে গেছেন এই কারণে যে, চরিত্রের অন্তরঙ্গ রূপের বিশ্লেষণে ও স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের জন্যে। তাই চিঠির ব্যবহার উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাইশ

সন্তরণ দৃশ্য ঃ প্রতাপ ও শৈবলিনীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বর্ণিত দুটি সন্তরণ দৃশ্য নানা কারণে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে। প্রকৃতি চিত্রণে, ভাব-ব্যঞ্জনায়, রোমান্স রসের পরিবেশনে এবং সর্বোপরি চরিত্র চিত্রণের বৈশিষ্ট্যে এই দুটি সন্তরণ দৃশ্য শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নয়, সমগ্র উপন্যাস সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত যথার্থই বলেছেন, "জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গায় শৈবলিনী-প্রতাপের সাঁতারকে তাদের প্রণয়ের রোমন্টিক মুহূর্ত রচনার কাজে বঙ্কিম কবির ন্যায় ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতির সেই সাহচর্য তাদের বাস্তব জীবন ও বর্তমান ভুলিয়ে স্মৃতির ক্ষণিক স্বর্গে তুলেছে।" (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঃ শিল্পরীতি)।

উপন্যাসের দুটি সন্তরণ দৃশ্য—একটি উপক্রমণিকা অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, অন্যটি তৃতীয় খন্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। উপক্রমণিকা অংশের নাম 'ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে'। এই নামের পেছনে রয়েছে সন্তরণ দৃশ্যের প্রভাব। প্রতাপ ও শৈবলিনী পরস্পর যখন জেনেছিল উভয়ের বিবাহ সম্ভব নয়, তখন তারা গোপনে পরামর্শ করে দুজনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিচ্ছিল। প্রতাপ বলল, "আয় শৈবলিনী! সাঁতার দিই।" দুজনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করল। সাঁতারে দুজনেই পটু। তখন বর্ষাকাল। সাঁতারের উপযোগী পরিবেশ নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক—"বর্ষাকালে কূলে কূলে গঙ্গার জল দুলিয়া দুলিযা, নাচিয়া নাচিযা, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। ফেনচক্রমধ্যে সুন্দর নবীন বপুদ্বয় রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্ন যুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল। সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না—চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুইজনের কেহ শুনিল না চলিল। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল—শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে"।

এই পর্যন্ত যদি এই সন্তরণ দৃশ্যকে উপলব্ধি করি তাহলে দেখতে পাব, প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্য প্রণয় ভেঙে গেছে বলেই, সেই অতৃপ্ত কামনা থেকে উভয়ের মনে একসঙ্গে সাঁতার দেওয়ার মানসিকতা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া স্মৃতিটাকে ধরে রাখতে তারা চেয়েছিল গঙ্গায় সাঁতার দিতে। বিশেষ করে রোমান্সের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই দৃশ্যের প্রয়োজন ছিল। এই পরিচ্ছেদে সন্তরণ দৃশ্যের শেষে পাওয়া যায়, অন্য দৃশ্য। যেখানে দেখা যায় শৈবলিনী প্রতাপকে বলছে, " আর কেন, এইখানেই। প্রতাপ ডুবিল।"

অন্যদিকে, "শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল, মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।" এই শেষ অংশে শৈবলিনী ও প্রতাপের মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। কারণ দুজনের মধ্যে ভালোবাসা থাকলেও দুজনে অন্য ধাতুতে গড়া। প্রতাপ প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জন

করতে পারে, আর শৈবলিনী বেঁচে থেকে জীবনকে উপভোগ করতে চায়, সে জানে ভোগ ছাড়া ত্যাগের মূল্য মূল্যহীন।

সামগ্রিকভাবে এই সন্তরণ দৃশ্য যেন যৌবন জলতরঙ্গের নির্বাধ লীলা। প্রকৃতির অভিনয় হয়েছে নায়ক-নায়িকার জীবনে। প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবন যেন চলমান কালপ্রবাহে অবিশ্রাম গতিতে ছুটে চলার ইঙ্গিত দান করেছে এই পটভূমিকায়। আগামী দিনে তাদের জীবন যে কত গতিময় হয়ে উঠবে তা যেমন জানিয়ে দেয়, তেমনি প্রতাপের ডুব দেওয়াও উপন্যাসের সূচনায় পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। অবশ্য ডুব দেওয়ার স্থানের কাছেই ঔপন্যাসিক পান্সীতে চন্দ্রশেখরকে রেখেছিলেন, ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য। এই সূত্রেই চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে বিবাহ এবং পরবর্তী ঘটনার অগ্রগতি। সুতরাং এই সন্তরণ দৃশ্য যে উপন্যাসের কাহিনি বয়নে ও চারিত্রিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় সন্তরণ দৃশ্যটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছেদের নাম-ই 'অগাধ জলে সাঁতার'। নামটিও রূপক। কারণ প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবন তখন বহুদূর অতিবাহিত হয়েছে, এই জীবনের গভীরে কি সম্পদ আছে তারা তখন কেউ জানে না। সে যাই হোক, এই সন্তরণ দৃশ্যের পটভূমিকা এইরকম। প্রতাপকে উদ্ধারের জন্য শৈবলিনী যখন ছদ্মবেশে প্রতাপের নৌকায় উপস্থিত হল এবং ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণ করার জন্য সুকৌশলে প্রতাপের কাছে গি‍ কানে কানে পালিয়ে যাওয়ার কথা বলল ও ভান করে জলে পড়ে গেল, তখন তাকে বাঁচাবার নাম করে কয়েদী প্রতাপও সাঁতার দিতে থাকল। সেই সময়কার ঘটনাই সন্তরণ দৃশ্যের বিষয়।

দুজনে সাঁতার দিয়ে অনেক দূর গেল। কি সুন্দর দৃশ্য, যেন 'সুখের সাগরে সাঁতার'। সাঁতার দিতে দিতে প্রতাপের নানা চিন্তার উদয় হল। সেগুলি হল ঃ (ক) মানুষের ভাগ্যে সাঁতার নেই কেন? (খ) কেন মানুষ মেঘের তরঙ্গ ভাঙতে পারে না। (গ) কেমন পুণ্য করলে সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া যায়। (ঘ) সমুদ্র, গাছ-পালা, প্রকৃতি যেন স্নেহময়ী মা, সব সময় আদর করতে চায়।

অন্যদিকে শৈবলিনী ভাবল, "এ জলের ত তল আছে,—আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি।" শৈবলিনী নৌকার উপর যে রুগ্ন, শীর্ণ, শ্বেত মুখমন্ডল দেখেছিল, তার মনে তা জেগে উঠছিল। তাই শৈবলিনী কলের পুতলের মতোই সাঁতার দিচ্ছিল। উভয়ে সাঁতারে পটু হলেও, এই সাঁতারে প্রতাপেব মনে 'আনন্দসাগর' উছলিয়া উঠিতেছিল। সেইসময় প্রতাপ পুরোনো কথা ভুলে, শৈবলিনীর স্বার্থপরতার কথা চিন্তা না করে 'শৈ' নামে ডাকল। এই নামে শৈবলিনীর হৃদয় উথলে উঠল। কারণ এই নামে বাল্যকালে প্রতাপ শৈবলিনীকে ডাকত। বহুদিনের চেনা নাম, তাই তার সঙ্গে সুখসমৃদ্ধিগুলি যুক্ত। ডাক শুনে তাই শৈবলিনী আনন্দে চোখ বন্ধ করল। তারপর মনে মনে চন্দ্র-তারাকে সাক্ষী করে বলল, "প্রতাপ! আজও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

শৈবলিনীর এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটিব ভাবদ্যোতনা ও কাব্যময়তা উল্লেখযোগ্য কেননা, এক করুণ মধুর স্মৃতি শৈবলিনীকে স্বপ্নাবেশে ঢেকে দিয়েছে। যে খরস্রোতা হৃদয় প্রবাহিনীতে একদিন প্রেমের পূর্ণচন্দ্র হেসেছিল, আজ সেই প্রবাহিনী নৈরাশ্যের বালুচরে শ্লথগতি ও

ক্ষীণকায়া, তাই সেখানে পূর্ণচন্দ্রের খেলা শুধু বিষণ্ণতারই উদ্রেক করে। নৈরাশ্যের বেদনায় যে ভগ্ন হৃদয়ে বেঁচে রয়েছে, তার কানে আশার গুঞ্জন বড় অর্থহীন বলেই মনে হয়।

তারপর প্রতাপের শৈবলিনীকে প্রথম সন্তরণ দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া। প্রথম সাঁতারে প্রতাপ ডুবে ছিল, শৈবলিনী পারেনি। এখন শৈবলিনী তাই প্রতাপের মতো ডুবতে পারত, যদি না তাকে 'শৈ' নামে ডেকে প্রাণের উচ্ছ্বলতাকে না বাড়িয়ে দিত। কিন্তু শৈবলিনী প্রতাপকে নিয়ে তীরে উঠতে চাইলে প্রতাপ বলল, 'আমি উঠিব না। আজি মরিব।' প্রতাপ যখন ডুবতে দৃঢ়সংকল্প তখন শৈবলিনী বলল, 'কি চাও, প্রতাপ? যা বল তাই করিব।' প্রতাপ চায় শৈবলিনীকে দিয়ে শপথ করাতে। সে শপথ হল, 'আমার মরণ বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী'। কিন্তু শৈবলিনী যখন প্রতাপকে তার মতো দুঃখী কে আছে জানাতে চাইল তখন প্রতাপ শৈবলিনী একসঙ্গে দুজনে ডুবতে চাইল। শৈবলিনী মনে মনে চিন্তা কবল, সে নিজে মরতে পারে, কারণ তার মরার জন্য কারোর কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু তার জন্য প্রতাপ মরবে বা কেন? প্রতাপকে শৈবলিনী আবার জানাল 'আমার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব'? শুধু তাই নয়, প্রতাপের কাছে স্পষ্টভাবে জানাল, ''শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমাব সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।'' এরপর উভয়ের সাঁতার শেষ হল ও উভয়ে তীরে গিয়ে উঠল।

এই সন্তরণ দৃশ্য নায়কের হৃদয়ে স্বভাব-প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির বৈপরীত্য সূচনা কবে, স্বভাব-প্রকৃতির ছন্দে নিজের জীবনকে মিলিয়ে নেবার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেছে। ঊর্ধ্বস্থ অনন্ত নীল সাগরে সাঁতার দেবার অভিপ্রায় প্রতাপের মনকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ করে তুলেছে। আর তার ফলে শৈবলিনীর 'চক্ষে তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীল জল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল।' শেষ পর্যন্ত উভয়েই 'চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে— 'পাপ জীবনের ভার' নামিয়ে দিল। কাহিনির গতিপথ ঘুরে চলল ভিন্নপথে—জল থেকে স্থলে। বলতে দ্বিধা নেই, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত, প্রতাপের আত্মবিসর্জন কি এই সন্তরণ দৃশ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল নয়?

এখন এই সন্তরণ দৃশ্যের উপযোগিতাগুলিকে সূত্রাকারে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। (এক) প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিচারে এবং উপন্যাসের বাহ্য সৌন্দর্যের দিক থেকে এই দুই দৃশ্যের গুরুত্ব রয়েছে।

(দুই) কাহিনি বিন্যাসে গতিময়তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য এর প্রয়োজন ছিল। প্রথম সন্তরণের সঙ্গে দ্বিতীয় সন্তরণ দৃশ্যের কাহিনি সূত্র যথেষ্ট নিবিড় ও কার্য-কারণ পরম্পরায় গঠিত।

(তিন) অতীত স্মৃতি জাগরণে ও তারপর পরবর্তী ঘটনাধারার সঙ্গে যোগস্থাপনে সন্তরণ দৃশ্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

(চার) উপন্যাসটি যেহেতু ঐতিহাসিক রোমান্স, তাই রোমান্স সৃষ্টির জন্য ও কাব্যময় পরিবেশ গড়ে তুলবার জন্য এই দৃশ্য যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে।

(পাঁচ) ব্যঞ্জনার দিক থেকেও সন্তরণ দৃশ্যের গুরুত্ব যথেষ্ট। এই সাঁতার জীবন নদীতে সাঁতার। সমুদ্রের যেমন তল নেই, তেমনি জীবনেরও গভীরতা রয়েছে। প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবন যেন এই সমুদ্রের মতো, যার কোন তল নেই, অনির্দেশ্য।

(ছয়) বিশেষ করে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে এই সন্তরণ দৃশ্য দুটি উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সন্তরণ দৃশ্যই পরিষ্কার করে দেয়, প্রতাপ সংগ্রামী প্রেমিক। সে প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত। তাই সে ডুবতে ভয় পায় না। প্রথম সন্তরণ দৃশ্যে সে ডুবেছিল এবং দ্বিতীয় সন্তরণ দৃশ্যে বারবার ডুবতে চেয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত না ডুবে সে শপথ করিয়ে নিয়েছিল শৈবলিনীকে দিয়ে। এই শপথের মধ্যেও রয়েছে আত্মত্যাগেব বাসনা।

আবার এই দুটি সন্তরণ দৃশ্যে শৈবলিনীর চরিত্র ও তার পরিণতির ইঙ্গিতও রয়েছে। কারণ প্রথম সন্তরণ দৃশ্যে শৈবলিনী যে স্বার্থপর, তার প্রমাণ রেখেছে— "কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে?" জীবনকে শৈবলিনী ভোগ করতে চায়, তাই সে ডুবতে চায় না। স্বার্থের প্রয়োজনে, অবস্থার প্রেক্ষিতে জীবনের রস উপভোগের ক্ষেত্রে শৈবলিনীর জুড়ি মেলা ভার। তাই প্রতাপের জন্য সে ডুবতে পারেনি, আর পারেনি বলেই চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। সেই বধূ শৈবলিনী আবার অতৃপ্ত কামনাকে চরিতার্থ করার জন্য ফষ্টরের সাহায্যে প্রতাপকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। এমনকি প্রতাপের সঙ্গে পলায়নের সময়ও ফষ্টরের কথা মনে পড়েছে। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় সন্তরণ দৃশ্যে দেখা যায়, প্রতাপের মতো শৈবলিনী ডুবতে ভয় পেয়েছে। তাই সে প্রতাপের কথা মতো শপথ করে প্রতাপের আশা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। চরিত্রের এই যে বৈচিত্র্যময়তা তা সন্তরণ দৃশ্য থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ এসেছে।

সুতরাং নিছক প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে নয়, কাহিনি বিন্যাসে, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বময়তাকে পরিস্ফুট করার কারণে এবং রোমান্স সৃষ্টির জন্যে এই দুটি সন্তরণ দৃশ্য উপন্যাসে যে যথার্থভাবে সংযোজিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। এই দৃশ্যের অবতারণায় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পদৃষ্টির মুন্সিয়ানাই প্রমাণিত হয়।

তেইশ

রচনাকৌশল ও ভাষা ঃ চন্দ্রশেখর

ফর্ম ও কন্টেন্টের সাযুজ্যই দক্ষ শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির চাবিকাঠি। সেই চাবিকাঠি বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল বলেই উপন্যাসের ভাববস্তু, কথাবস্তু নির্মাণ এবং সেগুলিকে বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ শিল্পকুশলতা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের যে ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই বাংলা গদ্যকে দিয়েছেন বিশিষ্ট সৌষ্ঠব। বঙ্কিমের সাধু গদ্যরীতি উপন্যাসের শোভা বর্ধন করেছে। তৎসম শব্দবহুল গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষায় যে গাম্ভীর্য ধ্বনিসম্পদ ও সরসতা এনেছেন তাতে গদ্য হয়ে উঠেছে এক বিশেষ সম্পদ। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের রচনাকৌশল ও গদ্যরীতি উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধির অন্যতম উপাদান রূপে বিবেচিত হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তার প্রধান কারণ কাহিনি বিন্যাসে নানা ধরনের রচনাকৌশলের ব্যবহার। লেখক চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন রচনাকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, যার ফলে উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধি সার্থক হয়েছে। এ ধরনেব রচনাকৌশলগুলি হল ঃ

(ক) নাটকীয়তা আনয়ন ও নাট্যচাতুর্য সৃষ্টি ঃ নাটকীয় মুহূর্তের মাধ্যমে কাহিনির মধ্যে গতি ও দ্বন্দ্বময়তা সৃষ্টি করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যেমন, দলনী ও গুরগণেব সাক্ষাৎ, প্রতাপ কর্তৃক শৈবলিনীর উদ্ধার, শৈবলিনী কর্তৃক প্রতাপের মুক্তিসাধন প্রভৃতি।

নাট্যচাতুর্য সৃষ্টিতেও লেখকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। শৈবলিনী প্রতাপকে ভোলবার সংকল্প বাক্য উচ্চারণের পরে "প্রাণভয়ে শৈবলিনী সুখ সৌন্দর্য প্রণয়াদি-পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল।" এই দৃশ্যের নাট্যচাতুর্য প্রশংসনীয়। এরকম আরো নাট্যচাতুর্যময় ঘটনা হল প্রতাপের গৃহে শৈবলিনীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন এবং দরবার দৃশ্যে যোগবলের প্রভাবের জন্য ফষ্টরের স্বীকারোক্তি।

(খ) রূপকের ব্যবহার ঃ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে রূপকের ব্যবহার করে শিল্পের সৌন্দর্য রক্ষা করেছেন। যেমন, ফষ্টরেব বজরায় শৈবলিনী স্বপ্ন দেখেছিল যে, সে যেন একটি পদ্ম। সরোবরের প্রান্তে এক সুবর্ণ নির্মিত রাজহংস খেলা করে বেড়াচ্ছে। যখন রাজহংসকে সে ধরতে চেয়েছে, তখন সে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। নদীতীরে একটি শ্বেতশূকর বেড়াচ্ছে, এর মুখ ফষ্টরের মতো। শূকর তাকে প্রলুব্ধ করছে ও হাঁস ধরে দেবার কথা বলছে। অন্যদিকে সন্তরণ দৃশ্যে সমুদ্রের সঙ্গে জীবনের রূপক কল্পনা করা হয়েছে।

(গ) বিশিষ্ট কবি কল্পনা ঃ চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ভাব-ভাষার কাব্যময় মাধুর্য প্রশংসনীয়। বর্ণনার মধ্যে মাধুর্য এনে উপন্যাসকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে বঙ্কিমচন্দ্রের জুড়ি মেলা ভাব। যেমন, সামান্য কথায় সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে এই বর্ণনায়, "বৃক্ষ দেখা যায় না- —পথ দেখা যায় না—শৃগাল-কুক্কুর ভিন্ন কোন জন্তু দেখা যায় না—কলনাদিনী নদীপ্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে

দেখা যায়।" অথবা, "নগর মধ্যে আলো জ্বলিতেছে,—গঙ্গাকূলে শত শত বৃহত্তরণী শ্রেণী অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—কলকল রবে অনন্ত প্রবাহিনী গঙ্গা ধাবিতা হইতেছেন।"

(ঘ) কথোপকথনে সংলাপ ব্যবহার ঃ উপন্যাসের মধ্যে গতিময়তা সঞ্চারের জন্য কথোপকথনের ভাষা ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কথোপকথনের ভাষায় যেমন গতিময়তা এসেছে, তেমনি তা সৌন্দর্যও সৃষ্টি করেছে। যেমন, তৃতীয় খন্ডের ষষ্ঠ দৃশ্যে সন্তরণ দৃশ্যে প্রতাপ ও শৈবলিনীর কথোপকথন যেমন দ্বন্দ্ব ময় তেমনি তা আকর্ষণীয়। শৈবলিনীর উক্তি ঃ

"কি শপথ প্রতাপ?"

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি?

প্র। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্র। তবে আমার শপথ?

শৈ। কাছে আইস—হাত দাও।

(ঙ) বৈপরীত্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠককে আন্দোলিত করা ঃ বিপরীত বিষয় ও সুরকে নিপুণভাবে বিন্যস্ত করে পাঠককে গতিচঞ্চল করে তোলা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অনবদ্য কৌশল। 'কপালকুন্ডলা' এবং 'চন্দ্রশেখর'-এ এই রীতি প্রয়োগ করেছেন। জটিল সম্পর্ককে বোঝানোর জন্য আপাত বৈপরীত্যের মধ্যে সাদৃশ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, বেদগ্রামের কুটির ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিপরীতে মুঙ্গেরের সম্রাটের প্রাসাদ ও নবাবের চিত্র। আবার একদিকে পল্লীগ্রাম, কুলবধূ, পুকুরঘাট, রক্ষণশীল রীতিনীতি এবং অন্যদিকে সম্রাটের প্রাসাদ, অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতা, অতিরিক্ত উচ্চাশা, ষড়যন্ত্র রাজকীয় ঐশ্বর্য। সমান্তরাল ঘটনা সৃষ্টিও তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, ইংরেজ কর্তৃক শৈবলিনী হরণ এবং দলনী হরণ, কিম্বা প্রতাপের শৈবলিনী উদ্ধার এবং শৈবলিনীর প্রতাপ উদ্ধার, অথবা গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনীর সাঁতার ও উভয়ের চারিত্রিক স্বভাবের বৈপরীত্য প্রভৃতি।

আবার চারিত্রিক স্বভাবের দিক থেকে একই শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যেও বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, শৈবলিনী ও দলনী, সুন্দরী ও কুল্‌সম্‌, ফষ্টর ও তকি খাঁ, চন্দ্রশেখর এবং মীরকাশিম। শৈবলিনী ও দলনী উভয়ের প্রেম কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও শৈবলিনী যেখানে প্রেমে আসক্ত সেখানে দলনী প্রেমে একনিষ্ঠ। সুন্দরী ও কুল্‌সম্‌ দুজনেই যথাক্রমে নায়িকা ও উপনায়িকার সঙ্গিনী হলেও কুল্‌সম্‌ বিপদে দলনীকে ত্যাগ করেছে, সুন্দরী চরম বিপদে শৈবলিনীকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। আবার ফষ্টর ও তকি খাঁ একজন ইংরেজ ও অন্যজন ভারতবাসী হলেও স্বভাব চরিত্রে দুজন লম্পট। এই মিল ও অমিলের মাধ্যমে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনি বয়নে ও চরিত্র চিত্রণে মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন।

(চ) কাহিনি বয়নে গতিময়তা সৃষ্টি ঃ ঘটনার অগ্রগতিতে ও চরিত্রের বিকাশে গতিময়তা

সৃষ্টি করে বঙ্কিমচন্দ্র বিশিষ্ট রচনাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। স্থান-কালের একটি নিবিড় ঐক্য উপন্যাসে সর্বত্র দেখা যায়। যেমন, প্রতাপের গতিময়তা—পুরন্দরপুর থেকে মুঙ্গের, বন্দী অবস্থায় নৌকাযোগে যেতে যেতে বিন্ধ্যাচলের কাছে কোন জায়গায় মুক্তিলাভ, সেখান থেকে নিজ গ্রাম হয়ে আবাব মুঙ্গের, তাবপব সেখান থেকে কাটোয়া হয়ে বেদগ্রাম ও তারপর উদয়নালা। চন্দ্রশেখরের ক্ষেত্রেও একই কথা। যেমন, বেদগ্রাম→মুর্শিদাবাদ →বেদগ্রাম→ বিন্ধ্যাচল →বেদগ্রাম →উদয়নালা।

(ছ) ঘটনাবর্তে চরিত্রের অবস্থান ও উপস্থিতির মাধ্যমে নিপুণ বিন্যাস ঃ ঔপন্যাসিক চরিত্রের গুরুত্ব ও নিজস্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী তাদের অবস্থান ও উপস্থিতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন, কেন্দ্রীয় চবিত্র শৈবলিনী গল্পের অর্ধেক অংশে; মুখ্য পুরুষ চরিত্র দুটির অবস্থান এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশের কাছাকাছি। দাম্পত্য প্রেমের বিজয় ঘোষণার জন্য প্রতাপ-শৈবলিনীর (ছয়টি পরিচ্ছেদ) থেকে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী (নয়টি পবিচ্ছেদ)-কে একসঙ্গে বেশি দেখানো হয়েছে। প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর মুক্ত ভ্রমণেব পর দীর্ঘস্থায়ীভাবে স্বামীসঙ্গ দেখিয়েছেন সুকৌশলে, উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করার জন্য।

(জ) চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট রীতি পদ্ধতি গ্রহণ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির অপরূপ দৃষ্টান্ত হল চরিত্র চিত্রণেব বিশিষ্ট পদ্ধতি। এ বিষয়ে সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন—

"১। প্রধানত আকস্মিক উত্তেজক কাজ ও আবেগতাড়িত সংলাপেব অগ্ন্যুদ্‌গারেব সাহায্যে চরিত্রগুলি রচিত।"

"২। এই প্রথম একটি রোমান্সে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকেও সহযোগী রীতি হিসাবে তিনি অনেক চবিত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহার কবেছেন।"

(ঝ) অসাধারণ চিত্র রচনা ঃ প্রকৃতি চিত্র, যুদ্ধ চিত্র, পরিবেশ চিত্র, নরক চিত্র, রূপ চিত্র এবং নৃত্য গীতের বর্ণনা প্রভৃতির চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ভীমা পুষ্করিণীর বর্ণনায় প্রকৃতিচিত্রের রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যেমন, 'ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিধারে ঘন ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের হেমাভ রৌদ্র ও পুষ্করিণীব কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল পর্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত অন্ধকারমধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসহস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।" তাছাড়া মুঙ্গেরের প্রাসাদের চিত্র, জগৎ শেঠের উৎসব গৃহের বর্ণনা, দলনীর সংক্ষিপ্ত রূপ বর্ণনা ('বসন্ত বর্ষায় একত্রে মিশিযাছে'), যুদ্ধ-সংক্রান্ত চিত্র ও সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে (কামানের গর্জন, রণবাদ্য, তুমুল-কোলাহল প্রভৃতি) লেখক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ভাষা ঃ

আলোকার্থীকে আলো পেতে গেলে যেমন সলতে পাকাতে হয় তেমনি কাব্যরসের আস্বাদ পেতে গেলে শিল্পীকে নির্মাণ করতে হয় শিল্পের কথাশরীর। এই কথাশরীর নির্মাণের ক্ষেত্রে

বঙ্কিমচন্দ্রের পারদর্শিতা অবিসংবাদিত। শব্দচয়নের কুশলতা, সেই শব্দকে সুচারুরূপে বিন্যাস এমনকি শব্দসজ্জার নাটকীয় ভঙ্গি—সবকিছুই বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব স্টাইলকে চিনিয়ে দেয়। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবের উপযোগী ভাষা নির্মাণ করেছেন বলেই বর্ণনার ভাষা, কথোপকথনের ভাষা, মনস্তত্ত্ব উদঘাটনের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সাধু গদ্য যে এত চিত্তাকর্ষী ও গতিময় হয়ে উঠতে পারে তা তাঁর ভাষা আলোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(ক) শব্দচয়নের ও শব্দসজ্জার নৈপুণ্য ঃ উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশেই রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাষায় অনায়াস নৈপুণ্য। যেমন, "ভাগীরথী তীরে, আম্র কাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহাব মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ নদী বৃক্ষ, দেখিয়া আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ—বালিকার নাম শৈবলিনী।"

(খ) প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য অনবদ্য কৌশল রচনা ঃ উপক্রমণিকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে শৈবলিনী প্রতাপের সঙ্গে না ডুব দিয়ে যখন পালিয়ে এল এবং ডুবন্ত প্রতাপকে চন্দ্রশেখর উদ্ধার করে যখন তার গৃহে পৌঁছে দিলেন তারপরের ঘটনার বর্ণনা কি ক্ষিপ্র গতিময় তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যেমন—"শৈবলিনী প্রতাপকে আর মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন। দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।"

(গ) রঙ্গরসিকতার উপযোগী ভাষা নির্মাণ ঃ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুন্দরী ও শৈবলিনীর কথোপকথন দুই নারীর ঘরোয়া রূপকে চিহ্নিত করেছে এবং ভাষা সেই রূপ চিত্রণে সহায়ক হয়েছে। যেমন—

"সুন্দরী বলিল, "ভাই সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল, বাড়ী যাই।"

শৈবলিনী। কেহ নাই, ভাই, চুপি চুপি একটি গান গা না।

সুন্দরী। দূর হ! পাপ! ঘরে চ!

শৈবলিনী। না লো সই।

সুন্দরী। মরণ আর কি! মদনমোহন ত ঘরে বোসে সেইখানে চল না।

শৈবলিনী। তাঁরে বল গিয়া, তোমার মদনমোহিনী ভীমার জল শীতল দেখিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

(ঘ) প্রশ্নাত্মক বাক্য ব্যবহরের মাধ্যমে পাঠকমনে কৌতূহল সঞ্চার ঃ দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রতাপ শৈবলিনীকে 'পাপিষ্ঠা' বললে শৈবলিনী গর্জে উঠে বলেছিল—

"তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না যে, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য

হইয়াছিল? তু ি জান না তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?"—এ ধরনের নাটকীয় উক্তি পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন।

(ঙ) বাংলা, হিন্দি, ইংরেজী মিশ্রিত কৌতুককর ভাষা ঃ ভীমা পুষ্করিণীর তীরে শৈবলিনী ও ফষ্টরের কথোপকথনে কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে ভাষার ব্যবহারে। যেমন,

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া জলের নিকট আসিয়া বলিল, "I come again fair lady."

শৈবলিনী বলিল, " আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।"

ইংরেজ। Oh-ay-that nasty gibberish-I must speak it, I suppose, হম্ again আয়া হ্যায়।

শৈবলিনী। কেন, যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, "কিয়া বোল্‌তা হ্যায়"।

শৈবলিনী। যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?

ইংরেজ। যম। John you mean হম্ জন্ নহি, হম্ লরেন্স।

শৈবলিনী। ভাল, একটা ইংরেজী কথা শিখিলাম—লরেন্স অর্থে বাঁদর।

(চ) প্রবাদ-প্রবচন মূলক বাক্যের ব্যবহার ঃ ভাষারীতির মধ্যে ওজস্বিতা আনার জন্য যে শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন, তাতে ভাষা ভারবহনক্ষম হয়ে উঠতে পেরেছে। যেমন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'; 'এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে'; 'আমি কি ভাতের কাঙ্গাল'; প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?'; 'আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?'; 'ভারতবর্ষীয় কপাট ইংরেজী লাথিতে টিকিবে না'; 'স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে'; ' এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটিরে এ রত্ন আনিলাম কেন?'; 'এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়াছিলেন কেন?';'আমার ভালবাসার নাম-জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা'; 'যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে'; 'যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন?'; 'বাল্য প্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে? ইত্যাদি।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যশৈলীর অন্যতম দিক হল, স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগী বর্ণননৈপুণ্য। ফলে তাঁর বর্ণনা একদিকে যেমন কৌতূহলী দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিতে যে সৌন্দর্য, তা ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকার্য', অন্যদিকে তিনি আবার অনেক বেশি সংযত ও গম্ভীর। অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদে যে বর্ণনা বিবরণধর্মী অথবা বিশ্লেষণধর্মী আবার সে বর্ণনা নির্লিপ্ত এক তপস্বীর বর্ণনা। আবার বর্ণনা কখনো গূঢ়ার্থবোধক, সাংকেতিক রূপকে ফুটিয়ে তোলে। তাই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের অসামান্য শিল্পরূপের একটি বিশেষ উপাদান যে তাঁর গদ্যশৈলী ও বিশিষ্ট বর্ণনারীতি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চব্বিশ

বিভিন্ন প্রসঙ্গ ঃ চন্দ্রশেখর

গান :

'বিষবৃক্ষ', 'মৃণালিনী'-তে গানের ব্যবহার যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমন বৈচিত্র্য 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে না থাকলেও এই উপন্যাসের দু-তিনটি গান শিল্পরীতির বিচারে গুরুত্বপূর্ণ।

ভীমা পুষ্করিণীতে শৈবলিনী সুন্দরীর কাছে একটি গান গেয়েছে—

"ঘরে যাব না লো সই।
আমার মদনমোহন আসছে ওই।"

এই গানটিতে ঠাট্টার ছলে শৈবলিনীর রঙ্গ-রসিকতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। কুলবধূ শৈবলিনী পুকুরে স্নানের সময় সুন্দরীর কাছে নিতান্ত রসিকতা করে গানটি গাইলেও তাতে রয়েছে অবরুদ্ধ চিত্তের প্রকাশ। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে, প্রকৃতির উন্মুক্ত অবসরে মনের কোণে ভিড় করে আসা গানের কলি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। শৈবলিনীর প্রেমিকা সত্তা যে বেঁচে আছে এটা যেমন গানের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি এই গানের মধ্য দিয়ে শৈবলিনীর এই রূপ যে পরবর্তীকালে তাকে বিপথগামী করতে পারে, তার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ খন্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে শৈবলিনী উন্মাদ হয়ে যাওয়ার পর দুটি গান গেয়েছে। যেমন ঃ

(ক) স্বামী আমার সোনার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে;
তেকাটাতে এলে, সখা, বুঝি পথ ভুলে?

(খ) কি করিলে প্রাণসখী, মনচোরে ধরিয়ে,
ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে।

প্রথম গানটিতে উন্মত্ত হৃদয়ের স্বরূপের মধ্যেও নিজের একনিষ্ঠ প্রেমের অভাব স্বামীর উপরে আরোপিত হয়েছে। তার এই পদস্খলনের পেছনে যে স্বামীর ভূমিকা রয়েছে, তা সুকৌশলে ঔপন্যাসিক এই গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় গানটিতে উন্মাদ্‌গ্রস্তা শৈবলিনীর দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে।

ষষ্ঠ খন্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বেদগ্রামে ফিরে শৈবলিনী সুন্দরীর কাছে একটি গান গেয়েছে—

আমার মরম কথা তাই লো তাই।
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ?
মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাঁদ।

এই গানটিতে রোমান্টিক প্রণয়ের চরম ব্যর্থতা এবং তজ্জনিত হতাশার দীর্ঘশ্বাস গানটির

ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

সরাসরি অন্য গানের প্রয়োগ উপন্যাসে না থাকলেও দলনীর গান গাওয়ার বিবরণ উপন্যাসে আছে। এমন কি পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে জগৎ শেঠদের বাড়ীতে নৃত্যগীতের আসরের কথা থাকলেও গানের ব্যবহার নেই।

কৌতুকময়তা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র যে উচ্চমানের হাস্যরসের শিল্পী ছিলেন, তার প্রমাণ 'কমলাকান্তের দপ্তর'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না, সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। — বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন।" 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মতো 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মাঝে মাঝে কৌতুক প্রসঙ্গের অবতারণা করে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভীমা পুষ্করিণীতে স্নানরতা শৈবলিনী ও সুন্দরীর কথোপকথনে নারীদেব রঙ্গ-রসিকতার চিত্রটি উদঘাটিত হয়েছে। আবার ঐ পরিচ্ছেদে লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে শৈবলিনীর রসিকতা কৌতুক সৃষ্টি করেছে। কৌতুকের কারণ দুজনে দুজনের ভাষা বুঝতে পারেনি, তাই।

দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রামচরণেব চিন্তার মধ্যে রয়েছে কৌতুকময়তা। ব্রহ্মচারী, রাতে দুজন যুবতী (দলনী ও কুলসম) নিয়ে এলেন কেন এই চিন্তা করতে করতে রামচরণ সিদ্ধান্ত করল "বোধ হয়, এই দুইজন স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন—কি জ্বালা, এ কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না।"

দ্বিতীয় খন্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ফষ্টরের চিন্তার মধ্যে আছে কৌতুকময়তা। যেমন 'তিনি পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; দেশী লোকে যে ইংরেজকে লক্ষ্য করিবে, এ কথা তিনি মনে স্থান দিলেন না।' এই চিন্তার জন্যই তাকে আহত হয়ে গঙ্গায় পড়তে হল।

দ্বিতীয় খন্ডের ষষ্ঠ দৃশ্যে রামচরণ ভুল করে প্রতাপের ঘরে শৈবলিনীকে রেখে এসে কৌতুককর কাজ করেছেন। পরের দৃশ্যে রামচরণের ইংরেজকে 'ইন্ডিল-মিন্ডিল' বলা, বন্দুক হাতে করে ঘরের কপাট খোলার মধ্যে কৌতুকরস সঞ্চারিত হয়েছে।

তৃতীয় খন্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ছদ্মবেশে শৈবলিনীর প্রতাপের কাছে যাওয়া ও অভিনয়ের মধ্যে কৌতুকরস সঞ্চারিত হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে রামচরণের মুক্তির পর রামচরণের উক্তির মধ্যে রয়েছে কৌতুক। যেমন, "গমনকালে, রামচরণ অস্ফুট স্বরে ইন্ডিল মিন্ডিলের পিতৃ-মাতৃ-ভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে গেল।"

এভাবে টুকরো টুকরো ঘটনা ও প্রসঙ্গের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে নির্মল কৌতুকবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

পঁচিশ

প্রধান চরিত্র ঃ চন্দ্রশেখর

শৈবলিনী ঃ প্রিয়া শৈবলিনী অশঙ্কিনী এবং জায়া শৈবলিনী পাপ-পুণ্যের অংশভাগিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব 'চন্দ্রশেখব' উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি শৈবলিনী চরিত্র। শৈবলিনী চবিত্রটি নানা কাবণে ব্যতিক্রমী চবিত্র। শৈবলিনীব দুটি সত্তা—প্রিয়া ও জায়া। প্রিযা শৈবলিনী অশঙ্কিনী এবং জাযা শৈবলিনী পাপ-পুণ্যের অংশভাগিনী। তাই শৈবলিনীর প্রেম তির্যক, স্বকীয় ও পরকীয় প্রেমের সংঘাতে সে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। সে বাল্যে প্রিয়া, কৈশোরে জায়া, যৌবনে পুনরায প্রিয়া এবং প্রেমেব অপ্রাপ্তিতে শেষ পর্যন্ত জায়া। এই দোলাচলতা এবং তজ্জনিত ট্রাজিক পবিণতি চবিএটিকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মাত্রা।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মোট চল্লিশটি অধ্যায়। এদের মধ্যে শৈবলিনীব গতিবিধি একুশটি অধ্যায়ে বর্ণিত। আবাব শৈবলিনী ও প্রতাপ একত্রে ছয়টি অধ্যায় এবং শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর একত্রে নয়টি অধ্যায়ে বিরাজ করেছে। গাণিতিক সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই একথা পরিষ্কার হয় যে, ঔপন্যাসিক তাঁর এই চরিএকে গুরুত্ব অনুযায়ী অবস্থান কালেব ব্যাপ্তিতে ধরতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র শৈবলিনী। বিচিত্র অভিজ্ঞতায লব্ধ তার চরিত্রকে ভাগ করলে পাঁচটি পর্ব লক্ষ করা যেতে পাবে। প্রথম পর্বে, প্রতাপ সাহচর্যে বাল্য ও কৈশোর ('এক বৃন্তে দুইটি ফুল')। দ্বিতীয় পর্বে, সে চন্দ্রশেখরের বিবাহিতা স্ত্রী ('সৌন্দর্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়'); এবং ফস্টবকে উপলক্ষ্য করে প্রতাপের জন্য গৃহত্যাগ (তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল?) তৃতীয় পর্বের শেষে প্রতাপকে স্পর্শ কবে গঙ্গাবক্ষে 'প্রাণান্তকব' শপথ। ('আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব')। চতুর্থ পর্বে, শৈবলিনীর কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ('দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে')। সবশেষে পঞ্চম পর্ব হল প্রায়শ্চিত্তান্তে শৈবলিনী যখন 'মনের পাপ' স্বামীর কাছে ব্যক্ত করার সংকল্প নিয়ে প্রতাপের কাছে অনুমতি চেয়েছে। প্রতাপও শৈবলিনীকে আশীর্বাদ কবেছে, 'তুমি এবাব সুখী হও'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শৈবলিনীর মনের কথা গোপন থাকেনি। প্রতাপকে তাই শৈবলিনী বলেছে, 'যতদিন তুমি এই পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।''

শৈবলিনী প্রতাপকে ভালোবাসে সত্য, কিন্তু তার চেয়েও সে বেশি ভালোবাসে নিজেকে। তার ভোগ-বাসনা প্রতাপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বলেই প্রতাপকে বাদ দিয়ে জীবন ধারণ করা তার কল্পনায় অসহ্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তার কাছে ভালোবাসা অপেক্ষা ভোগের আকর্ষণ অধিকতর প্রবল। এ কারণেই প্রতাপকে ডুবে যেতে দেখে তার মনে হয়েছিল, 'কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে?' কিন্তু একথা বললেও দীর্ঘ আট বছর স্বামীর সংসার করতে গিয়ে প্রতাপকে সে ভুলতে পারেনি। তাই স্বামী চন্দ্রশেখরের সংসার তাকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করতে পারেনি। ফলে শৈবলিনী প্রতাপকে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে ফস্টরকে উপলক্ষ্য করে গৃহত্যাগ করেছে।

বলা বাহুল্য, বাল্যপ্রণয় হেতু শৈবলিনীর এ কার্য ঘটেনি। তাই সে লবঙ্গলতা ('রজনী') থেকে স্বতন্ত্র। আসলে সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিমানসের প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহও উপন্যাসে ঘোষিত হয়েছে। শৈবলিনী দুঃসাহসিকা, সে বুভুক্ষু নারীও বটে। প্রতাপকে পাওয়ার লোভে সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বুকে ঝাঁপ দিয়েছে। তার গৃহত্যাগের একটি কারণ স্বামীর ভালোবাসায় অবিশ্বাস ও স্বামীর সংসারে আকর্ষণের অভাব এবং অপর কারণ প্রতাপ সম্বন্ধে শৈবলিনীর ভ্রান্ত ধারণা। সে ভেবেছিল প্রতাপকে ইচ্ছামতো ভাঙতে ও গড়তে পারবে। কিন্তু পারেনি। রামচরণের ভুলের ফলে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতাপের ঘরে প্রতাপের সঙ্গে তার যখন সাক্ষাৎ হল, তখন প্রথম শৈবলিনী তার ভুল বুঝতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শৈবলিনী প্রথমে অভিমান করেছে। কিন্তু বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপ সে অভিমানের কদর দেখায়নি। তখন শৈবলিনী তার হৃদয়ের দুষ্ট ক্ষত নির্লজ্জের মতোই প্রতাপের সামনে সমস্ত অনাবৃত করেছে। সেই সঙ্গে তার কলঙ্কিত আচরণের জন্য বারবার প্রতাপকেই দায়ী করেছে। কিন্তু প্রতাপের চরিত্রের দৃঢ়তার সামনে তার সকল প্রকার জারিজুরি ব্যর্থ হয়েছে। পরাজিতা শৈবলিনী বুঝেছে, প্রতাপ আর আগের প্রতাপ নেই। প্রতাপ রূপসীর স্বামী। বুঝেছে, কুলত্যাগিনী হয়ে মিথ্যেই সে কলঙ্কিনী নাম নিয়েছে।

প্রত্যাখ্যানের ফলশ্রুতিতেই শৈবলিনীর জীবনের প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়েছে। শুরু হয়েছে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের চিন্তা। দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত চিন্তার ধারা একদিকে যেমন শৈবলিনীর অতীতের কার্যাবলীর উপর আলোকপাত করে। তেমনি অন্যদিকে বর্তমান মানসিক অবস্থার পরিচয় তো দেয়ই। সেইসঙ্গে ভবিষ্যতের জন্যেও পাঠককে সতর্ক করে রাখে। শৈবলিনীর পক্ষে প্রতাপের আকর্ষণ দুর্নিবার। তাকে পাওয়ার আশায় সে ফষ্টরের নৌকায় দিন কাটিয়েছে। কিন্তু তখন বুঝেছে 'আজ মরিবার দিন বটে'। তবুও প্রতাপ তাকে আকর্ষণ করেছে। 'প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে' কিন্তু তার কি হয়, তা না দেখে সে মরতে পারে না। তাই লাঞ্ছিতা শৈবলিনী প্রতাপের কথা ভাবতে চাইলেও নিজেকে এই বলে বোঝাতে চায়, "আমি তাহার পক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে?" কিন্তু তারই অন্তর বলে, "কে তাহা জানি না সে শৈবলিনী পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু।"

নিষ্ফল অভিসারের কথা ভাবতে আত্মগ্লানিতে তাকে পীড়িত করে। সে ভাবে, "আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?" প্রতিক্রিয়ার স্বরূপতায় বেদগ্রামের স্মৃতি মনে পড়ে। কিন্তু বেদগ্রামের চিন্তা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। ঘুরে ফিরে আবার প্রতাপের চিন্তা এসে পড়ে। এই শৈবলিনী আবার লালসা তাড়িতা হলেও বিবেকহীনা নয়। সে বুঝেছে যেদিন সে প্রতাপকে দেখেছে সেদিনই তার পরকাল নষ্ট হয়েছে। সহসা তার মনে হয়, বুঝি যা কিছু তার ভাল তাতেই অগ্নি লাগে, বুঝি তার জন্যই প্রতাপ বিপদগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু আগে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন যে প্রতাপ আর কেউ নয়, এখন নিজেকে প্রতাপের বিপদের হেতু মনে করে তার মনে হয়েছে, "আমি কেন মরিলাম না?" আবার সহসাই সে কীট হইতে সযত্নরক্ষিত তীক্ষ্ণধার ছুরি বার করেছে।

গঙ্গাবক্ষে যেমন একদা শৈবলিনী মরতে গিয়ে মরতে পারেনি, আজও তার মরা হল না। ছুরিকাগ্রভাগ হৃদয়ে স্থাপিত করে সে ভাবতে বসে, "মরিব? না—আজ নহে। মরিব তো সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব।" আসলে ভোগলিপ্সা যার প্রকট, তার মরবার সাহস নেই সত্য কথা। কিন্তু সংস্কার ও প্রতিবেশ যে ব্যর্থ হয়নি তাও এখানে উল্লেখ্য। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে ভালোবাসতে শেখেনি সত্য কিন্তু বিপরীত আকর্ষণ প্রবল বলে সে তা বুঝতে পারলেও চন্দ্রশেখরও তাকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করেছে। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের কেউ নয়, তবুও সে ভাবে, "একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভার আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?" স্বামীর প্রতি এই যে নিগূঢ় আকর্ষণ, এই একদিন বক্ষচ্যুত শৈবলিনীকে কেন্দ্রস্থ করেছে। আর এখানেই রোহিণী ও শৈবলিনী পরস্পর ভিন্ন।

প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রণয় বাল্যপ্রণয়। প্রকৃতির লীলানিকেতনে এই প্রণয় গড়ে উঠেছে। এই প্রণয় অন্তরের একান্ত স্বভাবে বিকশিত হয়েছে—পল্লীবালার মতো। ভীমা পুষ্করিণীতে সুন্দরীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে, 'ঘরে যাবো না লো সই। আমার মদনমোহন আসছে ওই।" কিম্বা উন্মত্ত অবস্থায় উচ্চারিত গীতের কলি—'আমার মরম কথা তাই লো তাই। আমার শ্যামের বামে কই সে রাই।" এই সব উক্তি শৈবলিনীর প্রেমচিন্তার সাক্ষ্য বহন করে।

আট বছর আগে শৈবলিনী ও প্রতাপের যে সমস্যা ছিল, আজও সেই একই সমস্যা বর্তমান, যদিও ভিন্ন প্রতিবেশ। শৈবলিনী চায় প্রতাপকে শরবিদ্ধ করতে, কিন্তু প্রতাপ চায় শৈশব সহচরীকে অকল্যাণের হাত থেকে মুক্তি দিতে। তাই সে শৈবলিনীর কাছে ভালোবাসার সুযোগে শপথ আদায় করিয়ে নিয়েছে। এই শপথ দানেও শৈবলিনীর দ্বিধা প্রবল। সে জানে যে মহাপাপ করেছে, তাই শপথ করেছে। করেছে নরকভোগও। অনন্যোপায় হয়ে শৈবলিনী বলেছে, "আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

প্রতাপের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী শৈবলিনী মরেছে এবং তার মৃত্যুতে পুনর্জন্মলাভ করেছে চন্দ্রশেখর পত্নী শৈবলিনী। কিন্তু তার এই নবজীবন লাভের আগে প্রায়শ্চিত্তের ভিতর দিয়ে তাকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। অবশ্যই তা শিল্পের ন্যায় অনুযায়ী ঘটেনি। অর্থাৎ শৈবলিনীর দ্বন্দ্বমথিত জীবনের বিবরণে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ অবকাশকে লেখক উপেক্ষা করেছেন এবং সেই সঙ্গে অলৌকিক কিছু বহির্ঘটনাকে আরোপিত করে উপন্যাসকে রোমান্সের সাযুজ্যে স্থাপন করেছেন। মনুষ্যচিত্তের চিকিৎসক রমানন্দ স্বামী কঠোর যোগ নিয়ম পালনের প্রক্রিয়ায় শৈবলিনীর মনের আশঙ্কাকে একমুখী করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার ফল হয়েছে খারাপ।

তবু একথা বললে অসঙ্গত হবে না যে, বঙ্কিম যাকে পাপিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সেই শৈবলিনী সত্যিই কি ব্যভিচারিণী? উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, চন্দ্রশেখর ও

রমানন্দ স্বামীর চোখের উপরে শৈবলিনী প্রতাপকে ইঙ্গিতে ডেকে একান্তে জানায় যে, সে নিজেই চন্দ্রশেখরকে সব বলবে। কিন্তু প্রতাপের অনুমতি অপেক্ষা। বিস্মিত প্রতাপের উত্তরে শৈবলিনী জানায়, "স্বামী যদি আমায় পুনর্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়?"

শৈবলিনীর চরিত্র আলোচনাকালে যে দ্বিধাচিত্ততার কথা বলা হয়, তা শেষে দেখা যায় প্রতাপেই সমর্পিত, চন্দ্রশেখরে নয়। ফলে সমস্ত চিত্তচাঞ্চল্য যে প্রতাপেই স্থির তা পরিষ্কার। যাকে সে আট বছর বয়সেই ফুলের মালা পরিয়ে চির জীবনের স্বয়ংবরা হয়েছিল, সেই প্রতাপের কাছ থেকেই অনুমতি চেয়ে নেয় সমাজের ইপ্সিত চন্দ্রশেখর তথা স্বামী ভজনার জন্য। এখন প্রশ্ন হল, প্রতাপের মৃত্যুর পর শৈবলিনী কি পারবে, তার পুরোনো গৃহসংসারে মন দিতে? যে শৈবলিনী প্রতাপকে বলেছিল, 'তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই', সে কি পারবে প্রতাপকে ভুলতে? রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের নিবারণ ও হরসুন্দরীর মাঝে শৈলবালার অনুপস্থিতি যেমন কাটা হয়ে বিঁধেছিল, সেরকম চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর দাম্পত্য জীবনে প্রতাপ কি কাঁটা হয়ে বিদ্ধ করবে না?

উপন্যাসে শৈবলিনী ও দলনীর পরিণাম করুণ হলেও দলনীর মৃত্যু ঘটেছে শারীরিক এবং শৈবলিনীর আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে। শৈবলিনীকে লেখক প্রাণে বিনাশ না করলেও নৈতিক শুদ্ধির বকযন্ত্রে ফেলে তার প্রিয়া সত্তাকে বিনষ্ট করে জায়ারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে দলনীর চেয়ে শৈবলিনীর পরিণাম যেন আরও করুণ এবং আরও গভীর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। উন্মাদিনী অবস্থায় সুন্দরীকে যে কথা বলেছে তা-ই শৈবলিনীর মনের কথা। যেমন, "কে যেন নেই, — কে যেন ছিল, সে যেন নেই — কে যেন আসবে, সে যেন আসে না — কোথা যেন এসেছি, সেখানে যেন আসি নাই — কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি না।" তার চরিত্রে এই যে দ্বিধা ও চিত্তচাঞ্চল্য অল্প পরিমাণে লক্ষ করা যায়, তার বহুল চিত্রণের অবকাশ ছিল সত্য, কিন্তু লেখকের অন্য উদ্দেশ্যহেতু তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবে যেটুকু অঙ্কিত হয়েছে, তাতে লেখককে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়গ্রন্থ তো ভস্ম হয় না ঃ চন্দ্রশেখর চরিত্র

সমাজবিশ্লেষণের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ পুরুষ চন্দ্রশেখর। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরকে উপন্যাসের নাম ভূমিকায় রেখে একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, জ্ঞানের উপর প্রীতির স্থান, সেই প্রীতির আদর্শ দাম্পত্য প্রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র সেজন্য চন্দ্রশেখরের মতো জ্ঞানীর অন্তরে দাম্পত্য-প্রেমের ক্ষমা-সুন্দর আসনখানি পেতেছেন। কেননা চন্দ্রশেখরের মতো জ্ঞানবীর, সংযমী ও পরোপকারী ব্যক্তি আসলে হৃদয়ধর্মের খাতিরে অনেক মহৎ ব্যক্তি। প্রেমের ভূমিতে প্রতাপের প্রেমে পরার্থপরতা ও ত্যাগ থাকলেও সামাজিক কল্যাণ নেই। কারণ তা পরকীয় প্রেম। তাই চন্দ্রশেখরের মধ্যে হৃদয়ধর্মকে প্রচ্ছন্ন রেখে দাম্পত্য প্রীতির মাধ্যমে আদর্শ প্রেমের কল্যাণকর দিকের পরিচয় দিতে চেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই দৃষ্টিতে চন্দ্রশেখর চরিত্র বিচার্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, আদর্শ দাম্পত্য প্রীতি সমাজ বন্ধনের মূলে। কারণ এই প্রীতি

ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি মাত্র নয়, তা ঔচিত্য-বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তিনি তাই বলেছেন 'বিবাহ নিবন্ধনে চিত্ত মার্জিত হয়; মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হয়।' চন্দ্রশেখর উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে দাম্পত্য প্রীতির উৎকর্ষকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন।

চন্দ্রশেখর তত্ত্বজিজ্ঞাসু, জ্ঞানপিপাসু গ্রন্থকীট। তিনি তাই মনে করতেন, 'দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জনেব বিঘ্ন ঘটে।' কিন্তু মায়ের মৃত্যুব পর তিনি উপলব্ধি করলেন, 'দারপরিগ্রহ না কবাই জ্ঞানার্জনের বাধা।' কিন্তু সেখানেও সমস্যা। কেননা বিয়ে করবেন ঠিক করলেও, মনে মনে ভাবলেন, ''সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না। কেননা সুন্দরীর দ্বারা মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা।'' রূপের দেবতা তাঁর সে বিচার চূর্ণ করে দিলেন, 'শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল।' নিজে ঘটক হয়ে শৈবলিনীকে বিবাহ করলেন ঃ 'সৌন্দর্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?'

এবার চন্দ্রশেখরের মধ্যে জ্ঞান ও রূপের দ্বন্দ্ব বাধল। তিনি প্রথমে জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন হলেন, হৃদয়কে উপবাসী রেখে। কিন্তু একদিন গৃহে পতিত চন্দ্র কিরণে তাঁর ভুল ভাঙল, দেখলেন, শয্যায় সুপ্তা সুন্দরী শৈবলিনীকে— 'গ্রন্থ সরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে'। চন্দ্রশেখরের চিত্তে 'প্রীতি বিস্ফারিত' হল। তারপর এক জিজ্ঞাসা তাকে ব্যাকুল করে তুলল, 'এই ক্লেশ সঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণী মুখপদ্ম কি জন্মের সারভূত করিব?' শুধু তাই নয়, এই সিদ্ধান্তের পেছনে প্রতিক্রিয়াও ছিল এরকম, 'এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পন্ডিতের কুটিরে এ রত্ন আনিলাম কেন'? এই দ্বন্দ্ব থেকেই পন্ডিত চন্দ্রশেখর থেকে প্রেমিক চন্দ্রশেখরের দিকে গতি পরিবর্তিত হল।

মুর্শিদাবাদ থেকে বেদগ্রামে ফিরে এসে তত্ত্বজিজ্ঞাসু চন্দ্রশেখর স্পষ্ট অনুভব করলেন প্রেমের স্বরূপ। কেননা দূর থেকে নিজের বাড়ি দেখে তাঁর মনে আনন্দের সঞ্চার হল। এই আনন্দের কারণ তাঁর গৃহে রয়েছে 'প্রেয়সী ভার্যা।' আবার এও উপলব্ধি করলেন এ ধরনের আনন্দ মোহের কারণ। আবার তাঁর যে পরিবর্তন ঘটেছে তা জানা যায় এই উক্তি থেকে— ''এ মোহজাল কাটতে ইচ্ছা করে না যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।''

অথচ এই চন্দ্রশেখর মোহকে পূর্বে 'ছি ছি' করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, এই মোহ থেকেই চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত হয়েছে। প্রেম জেগেছে তার আর এক প্রমাণ হল, বাড়ি আসার আগের মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছে প্রিয়ার অনিষ্ট আশঙ্কার কথা। তাহলে 'স্নেহের স্বভাবই তাই, তা অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে'। প্রেম তো চির শঙ্কাতীত। তাই তিনি দ্রুতপদে চললেন। বোঝা গেল, সংসর্গ গুণে জ্ঞানীর তপোভঙ্গ হয়েছে। সেজন্য তাঁর হৃদয়ে জেগেছে প্রণয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ। তারই প্রকাশ ঘটেছে প্রথম খন্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে—''যদি গিয়া দেখি, শৈবলিনী নাই? যদি গিয়া শুনি যে, শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে আমি বাঁচিব না।'' শুধু তাই নয়, তিনি মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করলেন। তারপর শূন্য ঘর দেখে আবেগকম্পিত স্বরে 'শৈবলিনী' বলে আহ্বান, 'শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলিতে আগুন দিয়ে অন্তরের তীব্র প্রেমের স্বরূপকে জাগ্রত করলেন চন্দ্রশেখর।' তারপর

চন্দ্রশেখরের প্রেমের অভাবে বৈরাগ্য সৃষ্টি হল। তাই "রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন।"

সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত যখন গৃহধর্ম পালনে নিজেকে নিয়োজিত করতে প্রস্তুত, ঠিক সেই সময়ে তাঁর দাম্পত্য জীবনে নেমে এল এক কবুণ অভিশাপ, হারাতে হল প্রিয়াকে, তার আগে হারিয়েছিলেন প্রিয় গ্রন্থকে। তাই প্রিযাকে হারিয়ে সেই শোণিততুল্য গ্রন্থগুলিতে আগুন দিয়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করলেন। গৃহী চন্দ্রশেখর হলেন ব্রহ্মচারী। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, দাম্পত্য প্রীতি সর্বব্যাপিনী প্রীতির সোপান। তাই বাড়িতে এসে তিনি যদি অতৃপ্তকাম শৈবলিনীকে কাছে পেতেন, তাতে যে কি পরিণাম ঘটত, তা বলা দুষ্কর। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কঠিন আঘাত দিয়ে চন্দ্রশেখরের সুতীব্র মোহের বেগকে প্রতিহত কবার ব্যবস্থা করলেন।

ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখরকে গুরু রমানন্দ স্বামী পরোপকার ব্রতে দীক্ষা দিলেন। কারণ জগতে পরোপকারী ব্যক্তিবাই সুখী হয়। শুধু পরোপকার ব্রত নয়, ব্রহ্মচারীব নিয়মব্রতে মোহেব তীব্রতা সংযত হয। মোহের তীব্রতাকে বশীভূত করে পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত করে চন্দ্রশেখরেব চিত্তে সুখের অনুভূতি আনা-ই ছিল প্রধান লক্ষ্য। তাই ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখর বিস্মিত মোহিত হয়ে গুরুর কাছে মন্ত্রগ্রহণ কবলেন। তখনো তাঁর হৃদয়ে প্রেম জাগরূক ছিল। কারণ 'হৃদয়গ্রন্থ' ত ভস্মীভূত হয় না। দুর্দম প্রণয় সামঞ্জস্যের সূত্রে নতুন পথ পরিক্রমায় নিয়োজিত হল।

চন্দ্রশেখরের হৃদয়বৃত্তি যে পরোপকারে নিয়োজিত ছিল, সেই সূত্রেই এল দলনী-কুলসমকে অসহায় অবস্থায় প্রতাপেব গৃহে স্থান দেওয়ার ব্যাপার। শুধু তাই নয, এই পরোপকাব সূত্রেই পুরাতন প্রেম জাগ্রত হল প্রতাপের বাড়িতে প্রিয়া শৈবলিনীকে দেখে। অসহায় দলনী বেগমকে তিনি দুবার বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সুতবাং চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে না পেয়েও হৃদযধর্মকে সজীব রেখেছিলেন।

তারপর চন্দ্রশেখর যখন শৈবলিনীর সাক্ষাৎ পেলেন তখন তাব প্রায়শ্চিত্ত আবম্ভ হয়ে গিয়েছে। এদিকে গুরুর নির্দেশে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর গতিবিধি লক্ষ করেছেন। হতাশায়, পাপবোধে, ভৌম নরকদর্শনে ভীত শৈবলিনী যখন স্বামী দর্শনের জন্য ব্যাকুল, তখন তাকে কঠিন নিয়মে অনন্যমনা হযে সপ্তাহব্যাপী স্বামীকে চিন্তা কবাব আদেশ দেওয়া হয়েছে। শৈবলিনী যখন বিকৃতি প্রাপ্ত হযেছে, তখনই চন্দ্রশেখরের আগমন হয়েছে। হতচেতন শৈবলিনীর মাথা কোলে নিয়ে ব্রহ্মচারী বসেছেন। এই সময় শৈবলিনীব উন্মত্ততা ও নরকভয় দেখে চন্দ্রশেখরেব হৃদয়ে শৈবলিনীব জন্য সহানুভূতি জাগ্রত হয়েছে। চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে যে কোমলতা এসেছে তার প্রমাণ হল, তিনি সে সময়ে শৈবলিনীর অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেছেন এবং আদর করে শৈবলিনীকে ডেকে বলেছেন, 'আমি তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন?' তার এই অবস্থা চন্দ্রশেখরের হৃদয়কে মথিত করেছিল বলেই তিনি রমানন্দ স্বামীকে ডেকে বলেছেন, 'গুরুদেব এ কি করিলে? এ কি করিলে?'

চন্দ্রশেখরের হৃদয়বত্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ গৃহত্যাগী শৈবলিনীকে পুনরায় গৃহে গ্রহণ কবাব মধ্যে। কেননা তাঁর মতো শাস্ত্রজ্ঞ ও সামাজিক মানুষ কুলত্যাগিনীকে গ্রহণ করলে সমাজচ্যুত হওয়ার ভয ছিল। সে ভয়কে জয় করেছেন হৃদয় দ্বারা, প্রেমের দ্বারা। সেই হৃদয় ও প্রেম

দিয়ে শৈবলিনীর সব দোষ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। দ্বিধা দ্বন্দ্ব যে তাঁর ছিল না তা নয়। কারণ তিনি যখন জানলেন, শৈবলিনী স্বেচ্ছায় ফষ্টরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন তখন মুখ নীচের দিকে নামিয়ে নিয়েছিলেন। পরে যোগবল প্রয়োগ করে জেনেছিলেন, শৈবলিনী প্রতাপের জন্যই গৃহত্যাগ করেছিলেন। তবুও তাঁর শৈবলিনীকে গ্রহণে বাধা ছিল তিনটি—

(১) ফষ্টরের নৌকা-বাসে ফষ্টর তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছিল কিনা।

(২) ইংরেজের নৌকায় থাকার কারণে সে জাতিভ্রষ্টা হয়েছে কিনা।

(৩) প্রতাপের ভালোবাসার ফলে শৈবলিনী শুচি কিনা।

এই তিনটি বাধা অপসারণের ক্ষেত্রে শৈবলিনী-ই চন্দ্রশেখরকে সাহায্য করেছে। শৈবলিনীর মুখ থেকে জানা গেল, প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করায় শৈবলিনী মনে সাধ্বী না হলেও দেহের দিক থেকে সতী, ফষ্টর সম্পর্কেও শৈবলিনী 'কায়মনোবাক্যে' সতী; শৈবলিনী জাতিভ্রষ্টাও হয়নি, কারণ ফষ্টরের নৌকায় সে 'গঙ্গার উপর' স্বহস্তে পাক করে খেয়েছে, 'ম্লেচ্ছের' ছোঁয়া জল পর্যন্ত খায়নি। ফলে চন্দ্রশেখরের পক্ষে শৈবলিনীকে ঘরে স্থান দেওয়ার কোন বাধা রইল না। ফষ্টরের সাক্ষ্যে যখন তিনি নিঃসংশয় হলেন, তখন চন্দ্রশেখর প্রতাপকে জানিয়েছেন, 'ইহাকে গৃহে লইব।' কেননা শৈবলিনী দেহ ও বাক্যে নিষ্পাপ। মনের দিক থেকে প্রতাপের প্রতি আসক্ত থাকলেও শৈবলিনী ছিলেন স্বামী অনুরাগিনী।

আসলে চন্দ্রশেখর বুঝেছিলেন, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর সম্পর্ক মানসিক, দৈহিক নয়। তাই তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে চন্দ্রশেখর দ্বিধা করেননি। এখানেই চন্দ্রশেখরের মহত্ত্ব। এই মহত্ত্ব হৃদয়বোধের উদারতাজনিত। শাস্ত্র ও লোকাচারের উর্ধ্বে হল প্রেমধর্ম ও হৃদয়ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন, আদর্শ দাম্পত্যের রূপটিকে মেলে ধরতে, যা শৈবলিনীর মুখে বসিয়েছেন, "হৃদয় মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন, শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুণ্‌গুণ্ করিতেছে।" চন্দ্রশেখর আদর্শ স্বামীর মতো স্ত্রীর সব কথা জেনে ও শুনে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। চন্দ্রশেখর প্রেমকে দেখেছেন কল্যাণের সূত্রে। তাই শৈবলিনীর ক্রিয়াকলাপ তাঁর মনে খুব একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারেনি।

'ক্ষমা পরম ধর্ম', এই নীতিতে বিশ্বাস করেন চন্দ্রশেখর। বিচক্ষণ ও পন্ডিত ব্যক্তি চন্দ্রশেখর শুধু শৈবলিনীর ব্যাপারে নয়, মীরকাশিমের ভাগ্য গণনার ক্ষেত্রেও তার পরিচয় রেখেছেন। তাই বলেছিলেন, "সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত, তবে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইত। বিশেষ জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।" আবার এই গণনার খবরটি তিনি নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এইজন্য যে, তাতে নবাব অন্তত দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না।

পন্ডিত, বিচক্ষণ, শাস্ত্রজ্ঞ, পরোপকারী, ক্ষমাশীল চন্দ্রশেখরকে আপাতদৃষ্টিতে নিষ্প্রভ চরিত্র বলে মনে হলেও তাঁর মধ্যে আছে এক গভীর মূল্যবোধ। যে বোধ কোনরকম আঘাতে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত তো হয়-ই না, বরং তাকে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। আসলে বাহ্যিক দিক দিয়ে চন্দ্রশেখর একটু নিষ্প্রভ ঠিকই কিন্তু অন্তরপ্রকৃতিতে চন্দ্রশেখর একজন কৃতি পুরুষের প্রতিমূর্তি। সেই কৃতি পুরুষের হৃদয়ধর্মকে বঙ্কিমচন্দ্র উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন।

চন্দ্রশেখর নামটির মাহাত্ম্যও রয়েছে তাঁর চরিত্রে। চন্দ্রশেখর শব্দের অর্থ শিব, নীলকণ্ঠ।

শিব যেমন বিষ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। তেমনি চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর কৃতকর্মের হলাহল নিজে গ্রহণ করে বিপথগামী পত্নীকে পুনরায় স্বপথে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই সুধাকর চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, ''চন্দ্রশেখরের চরিত্রের মধ্যে মহাদেবের মত প্রেমের উদ্ভব হয়েছিল যখন শৈবলিনী গৃহত্যাগ করেছিল।--- চন্দ্রশেখর আপন বেদনাকে নীরবে সহ্য করেছেন। তাঁর অন্তরের সর্ব-রিক্ততার বহিঃপ্রকাশ কেবল ব্রহ্মচারী বেশের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত হয়েছে। শিব যেমন সমুদ্রমন্থনে বিষ নিজ কণ্ঠে ধারণ করে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছিলেন; সেরূপ চন্দ্রশেখর স্মরগরলের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় প্রাণহীন শৈবলিনীকে কণ্ঠলগ্ন করলেন চিরকাল; অসতীদেহকে চিরকাল ধারণ করলেন কঠোর কর্তব্য বলে।''

কিন্তু মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন, ''চন্দ্রশেখর চরিত্রের সাত্ত্বিক কঠোরতাকে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) মানবীয় হৃদয়বৃত্তির দ্বারা শোধন করিয়া যে আদর্শ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—চন্দ্রশেখর শ্রদ্ধা অপেক্ষা কৃপার পাত্র হইয়াছেন। শৈবলিনী পাপীয়সী-অন্যপূর্বা ও কুলত্যাগিনী। সেই পত্নীকে এইরূপ শুদ্ধির দ্বারা পাপমুক্ত করিয়া সে যখন ঘরে তুলিয়া লইতেছে, তখন তাহাতে তাহার অপার করুণা ও স্নেহ অপেক্ষা দুর্বলতাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।'' চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে মোহিতলালের এই মন্তব্য যথার্থ নয়। কারণ শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখরের ক্ষমা করার মধ্যে কোন দুর্বলতা ছিল না, ছিল হৃদয়ধর্ম। যে হৃদয়ধর্মে তিনি দলনী ও কুলসমকে সাহায্য করেছিলেন, যে হৃদয়ধর্মে তিনি প্রতাপকে উদ্ধার করেছিলেন, সেই ধর্মেই তিনি শৈবলিনীকে অন্যাসক্তা জেনেও শৈবলিনীকে ক্ষমা করেছেন। এই ক্ষমার পটভূমিকা নিপুণভাবে দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

চন্দ্রশেখর চরিত্রের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন, ''ধ্যান-কল্পনা শিল্পী বঙ্কিমের, বাস্তবে এ আদর্শের রূপকার চন্দ্রশেখর। তিনি একাধারে জ্ঞানী, ব্রহ্মচারী, স্বামী ও প্রেমিক। তাঁহার প্রেম প্রদীপ হইয়া সংযত, ক্ষমাসুন্দর, উজ্জ্বল প্রেমের পথকে প্রদীপিত করিয়াছে। আমাদের দেশের একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবিও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন, যে প্রেম স্নেহ হরণ করে না, উত্তপ্ত করে না, স্বর্ণ দীপাধারে ঘৃত প্রদীপের মত সেই প্রেমই খাঁটি আদর্শ প্রেম।''

''বাল্য প্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে'' ঃ প্রতাপ

প্রতাপ কর্মকুশলী, সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ বীর ও প্রেমিক হলেও তিনি হতভাগ্য এক চরিত্র। তিনি গ্রীক 'ট্রাজেডির' নায়কের মতো ভাগ্যহত। বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাতজনিত কারণে তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল অশনি-সংকেত। তাছাড়া 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিণী'। প্রতাপের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তা-ই দেখাতে চেয়েছেন। প্রণয়ীর মঙ্গলের জন্য নিজের সুখভোগ-ত্যাগেই প্রেমের সার্থকতা। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের অভীপ্সিত প্রেম-ভাবনার পূর্ণাঙ্গ চরিত্র প্রতাপ।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য প্রেমের প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন বলেই প্রতাপ

শৈবলিনীর প্রণয়ে অভিসম্পাতকে কার্যকবী কবেছেন। ফলে প্রতাপ সেই প্রেমেব শহীদ হয়েছেন। একথা ঠিকই যে, বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য প্রেমের বাইবেব প্রেমকে অস্বীকার করেননি। তবে বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে বলেই অভিসম্পাতের রুদ্র রূপকে তিনি অঙ্কন কবেছেন। এই সঙ্গে চিত্ত সংযম, পরোপকার বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় জযকে যুক্ত কবে তিনি প্রতাপেব প্রেমকে আত্মবিসর্জনে মহনীয় করে তুলেছেন। মোহিতলাল মজুমদার প্রতাপের চবিত্রেব আলোচনা প্রসঙ্গে তাই যথার্থই বলেছেন, "এত বড় অন্তব সংগ্রাম আর কোন বাংলা কাব্যে চিত্রিত হয নাই; সে সংগ্রামে এতখানি শক্তির পবিচয়—যে শক্তি এমন অবস্থায এমন কবিযা আত্মবিসর্জন করে. প্রেমেব এমন রূপান্তব—আর কোন কাব্যসৃষ্টিতে এমন সার্থক হয় নাই।"

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের সমাপ্তি তৃণশয্যায শাযিত 'অনিন্দ্য জ্যোতিঃ স্বর্ণতরু' প্রতাপের জন্য অনন্ত পুণ্য, অনন্ত সুখ, অনন্ত প্রণয়লোক প্রাপ্তির কামনা নিয়ে ঃ "যেখানে ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য--- লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে চাহিবে না।" প্রতাপেব এই আত্মত্যাগেব মহিমাকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে গুরুত্ব সহকারে দেখিয়েছেন এবং তার পটভূমিও নির্মাণ কবেছেন তিনি।

প্রতাপ আদর্শ প্রেমিক ঠিকই কিন্তু তিনি সংগ্রামী প্রেমিক। প্রেমিক হিসেবে তাঁর পবিচয অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। প্রতাপ আর যাই হোক্, তিনি গৃহদাহের সুরেশ নন, কিম্বা 'চোখের বালি'র বিহারীও নন, নন 'রজনী'র অমবনাথ। প্রতাপেব চবিত্র অন্য ধাতুতে গড়া। প্রতাপ নিজেই স্বীকার করেছেন তার ভালোবাসার নাম 'জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা'। শুধু প্রেমিক হিসেবে নয়, বীব হিসেবে, পবোপকাবী রূপে তাঁব চবিত্র আকর্ষণীয়। চন্দ্রশেখব উপন্যাসের নায়ক হলেও অনেক বেশি সক্রিয চরিত্র প্রতাপ। চন্দ্রশেখবের তুলনায় প্রতাপকে অনেকটা মানবিক চরিত্র বলেই মনে হয়। চন্দ্রশেখরের চবিত্রে যেখানে আদর্শেব প্রাধান্য, সেখানে প্রতাপের চরিত্র, আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়ে গড়া। প্রতাপ তাই দ্বিতীয় নবকুমার।

'উপক্রমণিকা' অংশে কিশোর প্রতাপের বর্ণনা দিয়ে শুরু। এক কিশোর ও এক বালিকার লীলাচাঞ্চল্যের মধ্যে প্রতাপের রোমান্টিক হৃদয়েব পরিচয় মুদ্রিত হয়ে রযেছে। উপক্রমণিকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতাপ যোল বৎসরের নাযক। শুধু তাই নয়, 'বালকের ন্যায কেহ ভালবাসিতে জানে না'। তার প্রমাণও রেখেছেন গঙ্গায ডোবাব সংকল্পেব মধ্যে। প্রতাপ ডুবলেও শৈবলিনী ডুবল না। তাই প্রতাপের স্বাতন্ত্র্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ কবে।

তারপর প্রতাপকে উদ্ধার করেন চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপের প্রণয়িনী শৈবলিনীকে বিয়ে করায়, প্রতাপ শৈবলিনীকে দেখতে পেতেন। চন্দ্রশেখর সুন্দরীর বোন রূপসীর সঙ্গে প্রতাপের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। নবাবের দরবারে চন্দ্রশেখর প্রতাপের চাকরি করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতাপ নিজগুণে দিন দিন উন্নতি লাভ করতে লাগলেন। এর ফলে তিনি জমিদার হলেন। তিনি বৃহৎ অট্টালিকার অধিকারী হলেন, নামও ছড়িয়ে পড়ল দেশে। সুন্দরীর মুখে শৈবলিনীর বৃত্তান্ত শুনে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হলেন এবং চন্দ্রশেখরের কাছে কৃতজ্ঞ বলেই তিনি শৈবলিনী উদ্ধারে কৃতসংকল্প হলেন। সেই সংকল্প অনুযায়ী ভৃত্য রামচরণকে নিয়ে মুঙ্গেরে গেলেন

চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধানে। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রতাপের কৃতজ্ঞতাবোধ, পরোপকার ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাই।

প্রতাপ যে প্রকৃত বীর তার প্রমাণ মেলে যখন তিনি জীবন বিপন্ন করে ফষ্টরের নৌকা থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার করেন। আবার মুঙ্গেরে নিজের শয়নকক্ষে শৈবলিনীর স্থির শোভা দেখে প্রতাপ চোখ ফেরাতে পারেননি। এ তাঁর যে মোহ নয়, তার ব্যাখ্যা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "সৌন্দর্য মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয়বশ্যতা প্রযুক্ত যে তাঁহার চক্ষু ফিরিল না, এমত নহে—কেবল অন্য মন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।" আসলে সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি আকর্ষণে নয়, বিপন্নকে উদ্ধার করার বাসনাই ছিল প্রতাপের উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন, শৈবলিনী তাঁর জন্যই গৃহত্যাগ করেছে—প্রতাপের অতুল্য দেবমূর্তি শৈবলিনীর ইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত করেছে, তার-ই রূপ ধ্যান করে শৈবলিনীর ঘর অরণ্যে পরিণত হয়েছে তখন, "প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি বৃশ্চিক দষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।" আসলে শৈবলিনীর এই বাক্য প্রতাপের আদর্শের উপর বজ্রাঘাত। প্রতাপ নিজে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, শৈবলিনীর প্রবৃত্তির কলুষ মূর্তি দেখে তিনি নিঃশব্দে পালিয়ে গিয়েছেন। প্রবৃত্তি তাড়িত মোহের সংসারে তা অতি কঠিন আত্মজয়, বজ্রকঠোর নীতি ও সংযমের পরিচয়।

তারপর ইংরেজের হাতে বন্দী প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর সাক্ষাত্ ঘটে পান্সীতে। প্রতাপ শৈবলিনীর বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হয়ে মানলেন, 'এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে'। প্রতাপ আরও উপলব্ধি করলেন, কামনা চরিতার্থ করতে শৈবলিনী যে কোন কাজ করতে পারে: তাই প্রতাপ চাইলেন এই অকল্যাণকর কামনার বিনাশ প্রয়োজন। তাই শৈবলিনীর কল্যাণের জন্য তিনি দ্বিতীয় সন্তরণ দৃশ্যে চরম মীমাংসার জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রতাপের এই মানসিকতা থেকে পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, প্রতাপ বুঝি শৈবলিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তা কিন্তু নয়। যদিও সন্তরণকালে আদরের ও অতি পরিচিত 'শৈ' নামে শৈবলিনীকে ডাক দেওয়া প্রমাণ করে যে প্রতাপ বুঝি শৈবলিনীর প্রতি পুনরায় আসক্ত হয়েছেন। বিশেষ করে প্রতাপকে শৈবলিনী যখন বলেছে, 'প্রতাপ ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?' তার উত্তরে প্রতাপ বলেছে. "চাঁদের? না। সূর্য উঠিয়াছে।"

প্রতাপের এই উক্তি প্রমাণ করে তিনি নতুন জীবনের স্বাদ পেতে চান। এই সূর্য নতুন সূর্য, নতুন প্রভাত, নতুন আলো। আসলে এই জীবনের স্বাদ প্রতাপ দিতে চেয়েছেন শৈবলিনীকে। সেই নতুন জীবনে উদ্বুদ্ধ করবার লক্ষ্যে ভীষণ শপথ করিয়ে নিলেন—'আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্বসুখ জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব।' প্রতাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল শৈবলিনীকে তার দাম্পত্য জীবনে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া। অন্তত এই শপথ সেই কথাই প্রমাণ করে। প্রতাপের প্রেম যে পরার্থপর তাকে প্রমাণ করার জন্য এই শপথ। তাই প্রতাপ যেমন সংযত তেমনি কর্তব্যপরায়ণ। প্রতাপ তাই বলেছেন, 'ভালবাসার নাম জীবন-বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।'

বঙ্কিমচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছিলেন, এই প্রেম অনন্ত প্রেমের সঙ্গে মানুষের যোগ সাধন

করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আমরা দুজন ভাসিয়া এসেছি, যুগল প্রেমের স্রোতে। অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে।' পার্থিব প্রেমে দুঃখ আছে, দুর্বহ ভার আছে, সুখের অন্ত আছে—কিন্তু অনন্ত ধামের প্রেমে সে দুঃখ, সে ভার নেই—সে প্রেমে ইন্দ্রিয় জয়ের কষ্ট নেই। প্রতাপের জীবনচর্যায় সেই অনন্তের জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল।

তবুও প্রতাপ একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও অনমনীয় মনোবল থেকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর চরিত্রে কোন লুকোচুরির অবকাশ রাখেননি বঙ্কিমচন্দ্র। তাই প্রতাপ চরিত্র দিবালোকের মতো স্পষ্ট। যেমন, প্রতাপের অনুমতি সাপেক্ষে শৈবলিনী যখন নিজ কর্তব্য স্থির করেছে ঃ স্বামী যদি তাকে পুনরায় গ্রহণ করে তাহলে তাঁর কাছে কোন কথা লুকোবে না, পূর্বকথা জানিয়ে তাঁর ক্ষমাভিক্ষা করবে। এই প্রসঙ্গে অনুমতি চাইলে প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, "বলিও। আশীর্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও। এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।" প্রতাপের এই নীরব অশ্রুবর্ষণের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র একটি রেখায় তাঁর জীবনের রিক্ততা পরিস্ফুট করেছেন। সমালোচক প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন, "দুর্দমনীয় প্রলোভনের সম্মুখে শৈবলিনীর ভালবাসার সুযোগ লইয়া প্রতাপ তাহাকে নবজীবনের পথনির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আজ যখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার শিক্ষা নিষ্ফল হয় নাই, শৈবলিনী তাহার শপথের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে, তখন শৈবলিনী-বিহীন জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি সহসা তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত করিল। প্রতাপের নীরব অশ্রু এই আত্মবিস্মৃতির অভিব্যক্তি।" অবশ্য এই আত্মবিস্মৃতি থেকেই আত্মবিসর্জনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এখানেই প্রতাপ চরিত্রের পরিকল্পনার সার্থকতা।

শৈবলিনী প্রতাপকে ভেবেছিলেন একজন নমনীয় পুরুষ হিসেবে। ইচ্ছা করলেই তাকে যেদিকে খুশি ঘোরানো যাবে। প্রতাপ যে তা নয়, তা তিনি বারে বারে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে শৈবলিনী যখন প্রতাপকে বলেছে, 'আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—' তখন প্রতাপ শুধু বিস্মিত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেছেন ফষ্টর বধে। এমনকি সে সময়ে চন্দ্রশেখর তাকে বারণ করলেও শোনেননি। এমনকি চন্দ্রশেখরের পদধূলি পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন প্রতাপ। যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার কারণ হিসেবে প্রয়োজন আগে জানিয়ে অতি মধুর ও কোমল হাসি হেসে বিদায় নিয়েছেন প্রতাপ। এই হাসি বাহ্যিক দিক থেকে মধুর ও কোমল হলেও এ আসলে বঙ্কিম কথিত পরহিততন্ত্রের পটভূমিকা এবং চিত্তদীর্ণ প্রতাপের তীক্ষ্ণ বেদনামথিত হাসি।

প্রতাপের মৃত্যু নিয়েও প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। 'গৃহদাহে' সুরেশের মৃত্যু আত্মহত্যা না আত্মত্যাগ—সেই প্রশ্নের মতো প্রতাপের মৃত্যু আত্মত্যাগ না আত্মলাভ এই প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন করেছেন স্বয়ং প্রমথনাথ বিশী 'বঙ্কিম সরণী' গ্রন্থে। প্রতাপের উক্তিই স্মরণ করা যাক্—

"আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরোপকারী, তাহাদিগের সুখের কন্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে শৈবলিনীর চিত্ত কখনো না

কখনো বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।'' প্রমথনাথ বিশীর মতে, ''প্রতাপের মৃত্যু জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বের শিরে অগ্নিময় কিরীট পরিয়ে দিয়েছে।----- এই স্বেচ্ছাকৃত মৃত্যুর মধ্যে জীবনের একটা পরম উদ্দেশ্যের সন্ধান পেয়েছে প্রতাপ। এ সুন্দর, তাই কাব্যের উৎস।''

প্রতাপের মধ্যে পরকীয় প্রেমের স্বরূপ থাকলেও প্রতাপ সত্যিই 'অনিন্দ্যসুন্দর স্বর্ণতরু'। বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রীতিভাবনা তথা পরহিতব্রতের লক্ষ্যে প্রতাপ চরিত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁর আত্মবিসর্জনের মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। অনন্তের সঙ্গে প্রতাপের সংযুক্তিতেই বৃহৎ প্রেমের স্বরূপ ধরা পড়েছে। এখানেই তাঁর ত্যাগের শাশ্বত মহত্ত্ব। এ প্রেমে অভিসম্পাত নেই। প্রতাপের ইন্দ্রিয়জয় জনিত পুণ্যের অনন্ত স্বর্গলাভ, 'দধীচির অপেক্ষা'ও প্রতাপ 'স্বর্গের অধিকারী'। প্রতাপ যে জায়গায় পৌঁছেছে, সেখানে 'রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই', সেখানে 'লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না'।

·

·

'এ সংসারে নবাবি এইরূপ' ঃ মীরকাশেম

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইতিহাসে অংশের নায়ক 'সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীরকাশেম খাঁ।' এই চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে প্রেমিক মীরকাশেমকে মিশিয়ে দিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁকে এক আকর্ষণীয় চরিত্ররূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে, বিচারের বিভ্রান্তি থেকে এক অবিশ্বাস্য পরিণামী স্বরূপ ঔপন্যাসিক তাঁর মধ্যে চিত্রিত করে চরিত্রটি জীবন্ত আকার দান করেছেন।

মীরকাশেম 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের উপ-কাহিনির নায়ক। তাঁর জীবনের বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও ব্যর্থতার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। ইতিহাস ও মানবজীবন-এই দুটি ধারা তাঁর জীবনে সমন্বিত হয়ে পড়েছে বলেই চরিত্রটি আকর্ষণীয়। একদিকে স্বাধীনতাকামী, প্রজানুরঞ্জক, দেশপ্রেমী সম্রাট অন্যদিকে প্রেমিক সত্তা—এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত মীরকাশেম চরিত্র ঔপন্যাসিকের এক বিশেষ সৃষ্টি।

নবাব মীরকাশেমের চমৎকার ছবি এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইংরেজদের অত্যাচার থেকে প্রজাকে রক্ষা করার বাসনা নিয়ে মীরকাশেম বলেছেন, ''ইংরাজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন?'' শুধু তাই নয়, মীরকাশেম আরো বলেছেন, ''যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সিরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীরজাফরও নহি।''

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও প্রজানুরঞ্জনে নিবেদিত- প্রাণ মীরকাশেমকে বঙ্কিমচন্দ্র আঁকতে চেয়েছেন এই জন্যে যে, ইতিহাসের মীরকাশেমের উপর তিনি একটা গাঢ় কল্পনার রঙ মিশিয়ে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে চান। ইতিহাসে যে 'মীরকাশেমকে পাই তিনি হলেন নবাব মীরজাফর-এর জামাতা। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা মীরজাফরকে নামেমাত্র নবাব করে এ দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা হয়ে বসল। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ইংলন্ডে গমন করলে

রাজ্যশাসন ব্যাপারে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ঘটতে লাগল। সেই সময় ব্যান্সিটার্ট সাহেব ক্লাইভ-এর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীরকাশেমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি নবাব হয়েই ইংরেজদেরকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী দান করেন। কিন্তু মনে মনে তিনি ইংরেজদের কর্তৃত্ব পছন্দ করতেন না। ইংরেজদের বিতাড়িত করার লক্ষ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মীরজাফর-এর সময় থেকেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বিনা শুল্কে ব্যবসা করছিল। মীরকাশেম তখন সব ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই শুল্ক আদায় বন্ধ রাখেন। এতে কোম্পানি ও কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ইংরেজরা মীরকাশেমের সর্বনাশ সাধনেব জন্য পাটনা শহর অধিকার করে নেয়। তখন মীরকাশেম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু তিনি তিনটি যুদ্ধে পরপর পরাজিত হলেন। এই যুদ্ধগুলির মধ্যে উদয়নালার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর মীরকাশেম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগল সম্রাট শাহ আলম এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বক্সারে ইংবেজদেব সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হন। ইতিহাসের এই কাহিনি সূত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র অনুসরণ করে তাঁর প্রেমিক সত্তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

নিখিলনাথ রায় 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'তে লিখেছেন, ''পলাশী ও উদয়নালা এই দুই স্থানেই বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুরী নবাবপক্ষের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল।'' শুধু তাই নয়, তখন 'ব্যাপারী ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি, অর্থলোভী কুঠিয়ালদের জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং সেই সঙ্গে মীরকাশেমের লাঞ্ছনা ও মর্যাদা হ্রাস এবং ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত করেছেন উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন কোম্পানির আমলে বাংলার নবাবের সিংহাসন যেন অগ্নিবারুদের উপর প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন। ইংরেজদের অর্থলিপ্সা ও জঘন্য স্বেচ্ছাচারিতা এবং দেশীয় শেঠ সেনাপতিদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা নবাবকে শান্তিতে থাকতে দিত না। ইতিহাস সূত্রে পাই, মীরকাশেম কতকগুলি নৃশংস কাজের জন্য 'বিকৃত মস্তিষ্ক' আখ্যা পেয়েছিলেন। ঘটনা বিপর্যয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হতেই পারে। মীরকাশেম তার ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসে দেখা যায়, মীরকাশেম দলনীকে বিষপানে মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না।

এমনকি, বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সত্যকে অবলম্বন করে মীরকাশেমের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার চিত্র এঁকেছেন। যেমন, ''ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাশেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাশেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুরগণ খাঁর অবিশ্বস্ততা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্বাণ হইল, নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি ও হিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সংবাদ পৌছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আব সহিল না। মীরকাশেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, ''দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন

নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপানে বধ করিও।"

নবাব মীরকাশেম-এর থেকে ব্যক্তি মীবকাশেমকে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবরূপে চিত্রিত করেছেন। নবাব মীরকাশেমের কর্মক্ষেত্র শুধু অন্তঃপুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রসারিত। কাজেই মুখের কথায় ও কর্মে সঙ্গতি রক্ষা হয় না। ইতিহাসের ঘটনা সংঘাতে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়, বিচাব-বিবেক লুপ্ত হইযা যায। প্রেমিক হৃদয়ে সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ ডেকে আনে অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের সূত্র ধরেই মীরকাশেমকে হারাতে হয়েছে দলনীকে। তকি খাঁর মিথ্যা সংবাদে—'বেগম আমিযটের উপপত্নীস্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন,—নবাবের মনে এই অবিশ্বাস দেখা দিল। একে ইংরেজদের সঙ্গে পর পর যুদ্ধে পবাজয়, তারপর দলনীর বিশ্বাসঘাতিনী হওয়ার সংবাদ নবাবকে বিপর্যস্ত করে দেয়। তিনি আদেশ দিলেন, দলনীকে বিষপান করিয়ে বধ করিও। প্রেমিকের নির্দেশ প্রেমিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। নবাবের ভুল ভাঙল বাঁদী কুলসমের বজ্রসম বাক্যে। নবাব নিজের দুর্বুদ্ধিতে 'অজেয় রাজ্য' হারিয়েছেন। 'দলনীর কবরেব কাছে আমার কবর দিও' এই বাক্যে এবং সকলে চলে গেলে রাজ বেশবাস দূরে নিক্ষেপ করে 'দলনী'! দলনী!' বলে উচ্চৈস্বরে কান্নায় মীরকাশেমেব প্রেমিক হৃদয়ের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে যায়। আবার প্রেমের রাজ্যে তিনি যে 'মূর্খ', তার প্রমাণ 'তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কণ্টকে যত্ন করিয়াছেন।' বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, যে প্রেম চরিত্রের উৎকর্ষ বাড়ায় সেই প্রেমই শ্রেষ্ঠ। মীবকাশেমেব প্রেমের সেই শ্রেষ্ঠত্বের অভাব ছিল। বিচারে ভ্রান্তিজনিত কারণে মীরকাশেমের প্রেমে ফাটল ধরেছে। এদিক থেকে মীরকাশেম হতভাগ্য।

হতভাগ্য মীরকাশেম ওমরাহদের সম্বোধন করে বলেছেন যে, তাঁরা যেন সুবা রক্ষা করেন, তিনি চলে যাচ্ছেন। হয় তিনি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন, অথবা ফকিরি গ্রহণ করবেন। নবাবের শেষ অনুরোধ হলো যদি ইংরেজরা বা তাঁর অনুচরবর্গ সিরাজউদ্দৌলার মতো হত্যা করে, তবে তাঁর প্রার্থনা হল যে, তাঁরা যেন দলনীর কাছে তাঁকে কবর দেয়! এই অনুশোচনা তাঁর প্রেমিক হৃদয়কে উজাড় কবে দেখিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, উপকাহিনির নায়ক মীরকাশেম উপন্যাসে কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। উত্তরে বলা যেতে পারে, চন্দ্রশেখর যেহেতু ঐতিহাসিক রোমান্স, তাই ইতিহাসের পটভূমিকায় ব্যক্তিজীবনকে ফুটিয়ে তোলার জন্য ইতিহাসের চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া মীরকাশেমের বিপরীতে চন্দ্রশেখরকে স্থাপন করে মীরকাশেমের মূঢ়তার বিপরীতে চন্দ্রশেখরের বিচক্ষণতাকে প্রকাশ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। চন্দ্রশেখর জানতেন তাঁর স্ত্রী অন্যাসক্তা, ফষ্টরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর স্ত্রীকে ক্ষমা করেছেন, পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে নবাব হয়েও মীরকাশেম তাঁর বেগম সম্বন্ধে সন্দেহপরায়ণ হয়ে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কাহিনিতে তথা চরিত্রের মধ্যে এই বৈপরীত্য সৃষ্টি করার প্রয়োজনে মীরকাশেম চরিত্রের উপযোগিতা যথেষ্ট। তাছাড়া, ইতিহাসের মীরকাশেমের মধ্যে প্রেমিক মীবকাশেমের চরিত্রকে উদঘাটিত করে তাকে নিপুণভাবে চিত্রিত করার মধ্যেই

ছিল ঔপন্যাসিকের মুন্সিয়ানা। বিশেষত, মীরকাশেম-দলনীর কাহিনি সন্নিবেশ করে মীরকাশেমের হঠকারিতার মাধ্যমে উপন্যাসে ট্রাজিক সম্ভাবনাকে রূপ দেবার জন্যও মীরকাশেম চরিত্রের উপযোগিতা যে গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একনিষ্ঠ প্রেমের আরাধিকা ঃ দলনী

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের উপকাহিনির নায়িকা দলনী একনিষ্ঠ প্রেমিকা হিসেবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর বিপরীতে দলনীকে স্থাপন করে দলনী চরিত্রকে উজ্জ্বল চরিত্ররূপে চিত্রিত করেছেন। উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালে দেখতে পাব—শৈবলিনী পাপিষ্ঠা, দলনী পুণ্যবতী; শৈবলিনী স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী, দলনী স্বামীগতপ্রাণা। শৈবলিনীর জীবনে দুঃখের শেষে শান্তির আভাস, আর দলনীর জীবনের পরিণতি বিষাদ-করুণ; শৈবলিনীর চরিত্রে উদ্দামতা, আর দলনীর চরিত্র শান্ত মাধুর্যমন্ডিত।

বঙ্কিমচন্দ্র দলনীকে রূপ-গুণে উজ্জ্বল করে এঁকেছেন—"নির্দোষ গঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গরাশিতুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার, স্বর্ণ-খচিত সুগন্ধ বিকীরণকারী উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল তাহার অঙ্গ সঞ্চালনমাত্র গৃহমধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল। অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্যমাত্রে তরঙ্গ উঠে, তেমনি তরঙ্গ উঠিল।" উপন্যাসে তাঁর প্রথম আবির্ভাব লাজনম্র শংকিতা নারীরূপে মুঙ্গের দুর্গের অন্তঃপুরে।

প্রথম খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই ঔপন্যাসিক মানিনী দলনীর ছবি এঁকেছেন, "মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থল কমলিনীর ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয় সম্বোধনের ন্যায় ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।" দলনী বেগমকে দেখে তকি খাঁ অনুভব করেছিলেন, "সুন্দরী-নবীনা সবেমাত্র যৌবন বর্ষায় রূপের নদী পুরিয়া উঠিতেছে — ভরা বসন্তে অঙ্গমুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে, বসন্ত বর্ষায় একত্র মিশিয়াছে।" শুধু তাই নয়, দলনীকে তকি খাঁ বলেছিল, "তুমি একদিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে।"

উপন্যাসের শুরু থেকেই দলনী পতিগতপ্রাণা। পতির অনিষ্ট আশংকায় তিনি ভীতা। তাই নবাবকে তিনি বলেছেন, "যদি জানেন, যে ইংরাজের বিরোধী হইবে, সেই হারিবে, তবে কেন তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?" নবাব যুদ্ধ করবেন ঠিক করলে দলনী তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেছেন এবং জ্যোতিষ ডাকিয়ে যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে জানতে উদ্যোগী হয়েছেন।

দলনীর প্রধান সম্পদ একনিষ্ঠ স্বামী প্রেম। এই সম্পদ-ই তাঁর ট্রাজিক পরিণতিরও কারণ। কেননা স্বামীকে যুদ্ধ থেকে নিরত করা তথা তাঁর কল্যাণকামনায় এতটাই চিন্তিত যে, যে কোন কাজ-ই এজন্য করতে পারেন। যুদ্ধ যাতে না হয় সেজন্য তিনি গুরগণ খাঁর সাহায্য নিয়েছেন। সে কারণে গভীর রাতে, নবাবকে না জানিয়ে কুলসমকে সঙ্গী করে দলনী দুর্গ থেকে বের হয়েছিলেন। এই অবিমৃশ্যকারিতাই তাঁর পতনের পথকে প্রস্তুত করে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "দলনী স্বামীর অমঙ্গল সম্ভাবনায় ভীত হইয়া একবার দুর্গের বাহিরে পা দিয়াই প্রতিকূল দৈবরূপ যে দুরন্ত দানবকে জাগাইয়া তুলিল, তাহার ক্ষমাহীন

হিংসা তাহাকে মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছে।''

দলনী বেগম মীরকাশেমের শুধু বেগম নয় 'স্ত্রীরত্নসার'। স্বামীর মঙ্গলের জন্য সে তাঁর ভাই-র সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে চায় না। সরলা দলনী প্রকাশ্যে বলে, 'আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রু সম্বন্ধ।' ' স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে'—ভেবে গুরগণ খাঁ দলনীর অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। দলনী ও কুলসম অন্ধকার রাজপথে অসহায় হয়ে পড়েন। চন্দ্রশেখর তাঁদের আশ্রয় দেন। কিন্তু ভুলবশত 'ফষ্টরের বিবি' মনে করে ইংরেজ সৈন্যেরা তাঁদের নিয়ে যান। ফষ্টরের নৌকা থেকে দলনী তকি খাঁর হাতে পড়েন। তকি খাঁর রটনায় দলনী আমিয়টের উপপত্নী বলে নবাব জানতে পারেন। নবাবের নির্দেশে দলনী বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেন। কারণ স্বামী অপেক্ষা প্রিয় তাঁর কেউ নেই। স্বামী তাঁর কাছে 'রাজাধিরাজ, জগতের আলো, অনাথার ভরসা, পৃথিবীপতি, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, দয়ার সাগর'।

স্বামীর আদেশ, তা যে ধরনেরই হোক্ না কেন, তাকেই শিরোধার্য করে নিতে তাঁর আপত্তি নেই। তাই তিনি বলেন, ''বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার অমৃত— তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ তখন আমি বিষপান করিয়াছি।''

প্রেমের এই যে সর্বব্যাপী রূপ তা যেমন পবিত্র তেমন কোমল। তাই অতি সুন্দর কুসুম প্রিয়তমের আদেশ শিরোধার্য করে জগৎ থেকে বিদায় নিল। দলনীর প্রেম, দলনীর দুঃখ, দলনীর মৃত্যু শোচনীয় হলেও সুন্দর। তকি খাঁ যথার্থই বলেছে, ''জগদীশ্বর দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন?'' দলনীর ঈশ্বর নির্ভরতা ও মানসিক ইচ্ছা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কাজ করেছেন, তাতে মানসিক শক্তি-ই প্রেরণা দান করেছে।

উপন্যাসে দলনী চরিত্রের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে যেমন অচলার বিপরীতে মৃণালকে উপস্থাপিত করা হয়েছে তেমনি শৈবলিনীর বিপরীতে চিত্রিত হয়েছে দলনী। বৈপরীত্য সৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রের স্বরূপকে তুলে ধরাই ছিল দলনী চরিত্র পরিকল্পনার মূলে। শৈবলিনীর পতিপ্রেমের সঙ্গে দলনীর পতিপ্রেমের উৎকর্ষ বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন। ঐতিহাসিক রোমান্স-সৃষ্টির প্রয়োজনে ইতিহাসের সূত্রে রোমান্স ঘন পরিবেশ তুলে ধরার জন্য দলনী চরিত্রের উপযোগিতা ছিল যথেষ্ট। দলনীর মাধ্যমে প্রেমের নৈতিক আদর্শকেও বঙ্কিমচন্দ্র মেলে ধরতে চেয়েছেন।

দলনীর পরিণতি যে ট্রাজিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য এমন প্রশ্নও আসা স্বাভাবিক যে, এমন অপাপবিদ্ধ প্রেমের পরিণাম এত ভয়ংকর হল কেন? বঙ্কিমচন্দ্র বিশুদ্ধ প্রেমের এমন শোচনীয় বিনষ্টির চিত্র আঁকলেন কেন? শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে মেটারলিংকের 'Luck' নামক প্রবন্ধের বক্তব্যকে সম্মুখে রেখে এই ঘটনাকে 'নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ নিয়তির অত্যাচারের' একটি রোমাঞ্চকর দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, দলনীর জীবনের পরিণতি 'ক্রূর দৈবের নিষ্ঠুর পরিহাসের মত'। নির্মম নীতি নিরীহকেও রেহাই দেয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, 'মনুষ্য চরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল, সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল।' বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে অদৃষ্টবাদের

দুবকম রূপের কথা বলেছেন। একটি Pure or Asiatic Fatalism, the Fatalism of oedipus, যাতে অদৃশ্য দৈবশক্তি মানুষের সমস্ত শক্তি ইচ্ছাকে ধুলিসাৎ করে মানুষকে ভয়ঙ্কর পবিণামের দিকে ঠেলে দেয়। অন্যটি হল Modified Fatalism, যাতেমানবচরিত্রের মাধ্যমেই মানুষের ইচ্ছা, কর্ম ও পরিণাম নিয়ন্ত্রিত হয। বঙ্কিমচন্দ্র এই দ্বিতীয় অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

এইদিক দিয়ে বিচার করলে একনিষ্ঠ স্বামী-প্রেমী দলনীর মধ্যেই এমন একটি ছিদ্র ছিল, যা তাঁর একনিষ্ঠা, পবিত্রতা সত্ত্বেও শোচনীয় পরিণামের কারণ হয়ে উঠেছে। দলনী নিজেই বলেছেন, "আমি হাজাব দাসীর মধ্যে একজন বৈ ত নই। ----- আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন?" অথচ দলনী কার্যে তাই করেছেন। অন্তঃপুরিকা হয়েও স্বামীর অনুমতি না নিয়ে অসমসাহসে বাজপথে বের হয়েছেন। যা তিনি স্বামীর কল্যাণকর বলে ভেবেছিলেন, তা সত্যই দেশের নবাবেব পক্ষে কল্যাণকর কিনা, তা বিচার করে দেখেননি। একজন নবাবকে দেশের কল্যাণের জন্য যুদ্ধ থেকে বিরত কবা উচিত কিনা—এই ঔচিত্যবোধও তাঁর ছিল না।

আসলে দলনী আত্মসুখকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। দলনীর প্রেম একনিষ্ঠ ও পবিত্র হলেও আত্মসুখপরায়ণ। যেখানে নবাব দলনীকে বলেছেন, 'যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব' সেখানে দলনী মনে মনে তাঁর প্রশংসা করেও বলেছেন, "আপনি স্বযং যুদ্ধে যাইবেন না"। যে অন্ধ প্রেম পরের কথা ভুলে নিজের প্রিয়জনকেই শুধু রক্ষা করতে চায, তা যতই একনিষ্ঠ হোক, তা মহৎ নয়। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রাণী' নাটকে বিক্রমের মধ্যে এই প্রেমের রূপ দেখিয়েছেন এবং আত্মসংবৃত প্রেমের পবিণতি কি শোচনীয় তাও চিহ্নিত করেছেন। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাই বলেছেন, "আত্মসুখান্বেষী আবেগ, আবেগ-প্রসূত অসম তেজ ও স্পষ্ট ভাষণ দলনীর প্রেমকে মাধুর্যমণ্ডিত করিলেও বৃহত্তর স্বার্থে এ প্রেম অকিঞ্চিৎকর। আত্মসুখের আবেগে যাহার স্থিতি বিষপাত্রই তাহার পরিণাম। দলনীর অদৃষ্ট স্বভাবকে অতিক্রম করে নাই।"

ছাব্বিশ

অপ্রধান চরিত্র ঃ 'চন্দ্রশেখর'

ফষ্টব ঃ

'চন্দ্রশেখব' উপন্যাসে ইংবেজ কোম্পানিব অধ্যক্ষতায বাংলায শেষ স্বাধীন নবাব মীবকাশেমেব বৃত্তান্ত বর্ণিত হওযায সেই সূত্রে ইংবেজ চবিত্র উপন্যাসে চিত্রিত হযেছে। ফষ্টব কাল্পনিক চবিত্র হলেও ইংবেজেব লোভ, লালসা, স্বেচ্ছাচাবিতা ও ক্ষুদ্রাশযতাব পূর্ণ ছবি এই চবিত্রে অঙ্কিত হযেছে। তাই ফষ্টব ঔপন্যাসিকেব কল্পিত চবিত্র হলেও কল্পনা বাস্তবকে লঙ্ঘন কবেনি। পলাশীব যুদ্ধেব পব কযেক বৎসব ইংবেজদেব ভাগ্য ছিল অনিশ্চিত, বণিকেব মানদন্ড বাজদণ্ড অধিকাব কবতে পাববে কিনা, তাও ছিল সংশযেব বিষয। এ অবস্থায ইংবেজ কর্মচাবী, বিশেষত ইংবেজ কুঠিযালদেব একমাত্র লক্ষ্য ছিল ছলে বলে এদেশেব সম্পদ আত্মসাৎ কবা। লবেন্স ফষ্টব সেই কুঠিযালদেব প্রতিনিধি

উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য কবেছেন [illegible] ইংবেজদিগেব ভাবতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শাবীবিক বোগ জন্মে [illegible] বাতাসে ইংবেজদিগেব অর্থাপহবণ বোগ জন্মিত। ফষ্টব অল্পকালেই সে বোগে আক্রান্ত হইযাছিলেন।" ফষ্টব তাই নীতিহীন, ধর্মজ্ঞানহীন অসংযমী ব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র এই [illegible] চবিত্রটিব মধ্যে ইংবেজেব ক্ষমতালোভ, স্বেচ্ছাচাবিতা, জাত্যহঙ্কাব অকুতোভযতা [illegible] লোকেব প্রতি তাদেব অবজ্ঞাব ভাব সবই দেখিযেছেন। অ্যাবিস্টটল বলেছেন সম্ভ [illegible] কাব্যেব উপাদান। বঙ্কিমচন্দ্রও মনে কবেন, "যাহা সত্যেব প্রতিকৃতি মাত্র নহে [illegible] তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকাবী অথচ স্বভাবাতিবিক্ত তাহাই কবিব প্রশংসনীয সৃষ্টি।' এদিক থেকে লবেন্স ফষ্টব প্রশংসনীয সৃষ্টি।

ঔপন্যাসিক ফষ্টবেব দ্বাবা উপন্যাসেব কোন প্রযোজন মিটিযেছেন তা আলোচনা কবা যেতে পাবে। ইতিহাসেব ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে এই চবিত্রটি [illegible] নবাবেব সঙ্গে ইংবেজেব বিবোধ উপলক্ষ্যে এই চবিত্রেব আগমন [illegible] সিদ্ধ কবেছে। শুধু তাই নয, ফষ্টবেব শৈবলিনী অপহবণেব মাধ্যমে [illegible] কাহিনিব যোগ সাধিত হযেছে। ফষ্টবেব কাবণে শৈবলিনী গৃহ থেকে চলে যাওযায চন্দ্রশেখবেব [illegible] পবিবর্তন সাধিত হযেছে। চন্দ্রশেখবেব স্বৰূপ ধবা পডেছে। সেইসঙ্গে [illegible] তথা শৈবলিনীব সঙ্গে পুবাতন সম্পর্ককে কেন্দ্র কবে নতুন বিন্যাস [illegible] আগমনে। এমনকি ফষ্টবেব জন্য দলনীব পবিণতিও সম্ভব হযেছে। তাই ফষ্টব ইতিহাসেব সূত্রে কাল্পনিক চবিত্র হলেও অপবাপব চবিত্রেব যোগে এবং কাহিনি বিন্যাসে বিশেষ [illegible] ভূমিকা গ্রহণ কবেছেন ফষ্টব।

ফষ্টব ইষ্ট ইন্ডিযা কোম্পানিব পুবন্দবপুবেব বেশমেব কুঠিব ভাবপ্রাপ্ত কর্মচাবী ছিল। বিশেষ কাজে নিযুক্ত কবাব জন্য তাকে কলিকাতায ডাকা হয। ফষ্টবেব [illegible] ছিল না। ফষ্টব স্থিব কবল, Now or never। তাই পুবন্দবপুব ত্যাগ কবাব আগে শৈবলিনীকে অপহবণেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবল। ফষ্টবেব মধ্যে ৰূপ ও ৰূপেব নেশা তাব ধর্মাধর্মবোধকে

ভুলিয়ে দিল। কুঠিয়াল হিসেবে লরেন্স ফষ্টর গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রে ভীমা পুষ্করিণীতে শৈবলিনীকে দেখল। নিজের দেশে ফষ্টর প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় হতাশ্বাস হয়েছিলেন। প্রেমে হতাশ হয়েই তিনি দেশত্যাগ করেছিলেন। তাই ব্যর্থ কামনার স্বপ্নে তার কাছে 'কটা চুলের অপেক্ষা কাল চুল ভাল বলে মনে হল।' ফষ্টর মনে করলেন, 'তুষারময়ী মেরি কি শিখারূপিণী উষ্ণদেশেব সুন্দরীর তুলনীয়'? প্রলোভনের জাল বিস্তৃত হল, কিন্তু শৈবলিনী আত্মসমর্পণ করল না। ফষ্টর প্রশ্রয় পেয়েছে কিন্তু তাঁর যত্ন বিফল হয়েছে। এই বিফলতা দাম্ভিক ইংরেজের উদ্ধত স্বেচ্ছাচারিতাকে উদ্দীপ্ত করেছে। ফলে শৈবলিনীকে অপহরণের সিদ্ধান্ত নিতে সে দ্বিধা করেনি।

ইংরেজরা যে 'লোভ সম্বরণে অক্ষম' এবং 'পরাভব স্বীকারে অক্ষম' ছিল তার প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র ফষ্টর চরিত্র এঁকেছেন। এমনকি যে কোন কাজে ফষ্টর পরাঙ্‌মুখ ছিল না, ধর্মাধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য বিচারবোধও ছিল না তার। ইংরেজের ক্ষুদ্রাশয়তাকেও ফষ্টরের মধ্যে এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, ওয়ারেন হেস্টিংস ফষ্টরের অপরাধ জানতে পারেন এবং কাউন্সিলের প্রস্তাব অনুসারে ফষ্টর পদচ্যুত হয়ে প্রভুদের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে ষ্ট্যালকাট ছদ্ম পরিচযে নবাব পক্ষের সুইস সৈন্যাধ্যক্ষ সমরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চন্দ্রশেখর ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীন কল্পনা এক্ষেত্রে বাস্তব সত্য অপেক্ষা সম্ভাব্য সত্যের উপর বেশি নির্ভর করেছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কুলসম তাকে সনাক্ত করায় আমীর হোসেন তাকে গ্রেপ্তার করে নবাবের কাছে নিয়ে যায়। তাই ফষ্টরের সমস্ত চাতুরি বিনষ্ট হয়ে যায়।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে লরেন্স ফষ্টর অনৈতিহাসিক চরিত্র হলেও তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনকে ইতিহাসের তরঙ্গাবর্তে টেনে এনেছে লরেন্স ফষ্টর। তারই কৌশলে শৈবলিনী অপহৃতা হয়েছে। চন্দ্রশেখরের মতো জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর শোণিত তুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি পুড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। তার জন্যই ফষ্টরের বিবি ভ্রমে দলনীকে ইংরেজের নৌকায় আনা হয়েছে। তকি খাঁ নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য নিষ্কলঙ্ক দলনীর নামে মিথ্যা রটনা করবার সুযোগ পেয়েছে। প্রতাপের এক সময়ের কর্মতৎপরতার মূলেও রয়েছে ফষ্টরের ভূমিকা। কারণ ফষ্টরের শৈবলিনী অপহরণের জন্য ফষ্টরকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনে প্রতাপ কৃতসংকল্প হয়েছে। শৈবলিনীর জীবনের মূর্তিমান অভিশাপ ফষ্টর। রূপমুগ্ধ ফষ্টরকে আশ্রয় করেই শৈবলিনী প্রতাপকে লাভ করবার জন্য কুলত্যাগ করেছিল এবং ইংরেজ মহলে ফষ্টরের বিবি বলে পরিচিত হয়েছিল। এই ফষ্টর-ই শৈবলিনীর স্বপ্নে শ্বেত শূকররূপে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে, আবার স্বামীধ্যানের সময় ফষ্টরকে তার মনে হয়েছে 'বাঘ' বলে।

আবার ইংরেজের নৌকায় শৈবলিনী ও দলনীর বাসকালে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল ফষ্টর তারও নিরসন ঘটিয়েছে। লরেন্স ফষ্টরের সাক্ষ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, দলনী 'স্ত্রীরত্নসার'। মহম্মদ তকি খাঁ দলনীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিষপানে হত্যার কারণ হয়েছিল, সেকথা ফষ্টর প্রমাণ করেছে। শৈবলিনী যে ভ্রষ্টা নয়, তাও প্রমাণ করেছে ফষ্টর।

তাই উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থনে ও জটিল-গ্রন্থি মোচনে ফষ্টরই যেন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে

সূত্রধারের কাজ করেছে। উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে ইংরেজের বিচারে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রচলিত সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র সে পরিশিষ্ট বর্জন করেছেন। প্রচলিত সংস্করণে তাকে কুকুরের কামড়ে মৃত্যুর ভয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু পরিণাম দেখানোর আগেই ইংরেজের কামানে নবাবের তাঁবু আক্রান্ত হয়েছে এবং একটি ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের আভাসের মধ্যে ফষ্টরের পবিণতির উপর যবনিকা পতিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী ফষ্টরের এই পরিণতিকে শিল্পসম্মত বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ ফষ্টরের পরিণতি Poetic Justice. নীতিবাদী বঙ্কিমেব লেখনীতে তাই ফষ্টরের এ ধরনের পরিণতি যুক্তিসংগত।

রমানন্দ স্বামী ঃ

নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের এক অপরূপ সৃষ্টি রমানন্দ স্বামী। যেমনটি তিনি সৃষ্টি করেছেন 'আনন্দমঠে' সন্ন্যাসীদের মধ্যে, 'দেবী চৌধুরাণী'তে ভবানী পাঠকের মধ্যে, 'দুর্গেশ নন্দিনী'তে অভিরাম স্বামীর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে দাদাঠাকুর, ঠাকুরদা জাতীয় চরিত্রগুলি যেমন নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করাব প্রয়োজনে সৃষ্ট, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাসে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী জাতীয় চরিত্রগুলি ঔপন্যাসিকের নৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে রমানন্দ স্বামী উল্লেখযোগ্য ও অপবিহার্য ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পরিব্রাজক হয়েও সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মানুষের মতো কাজ করে গেছেন তিনি। তাই তাঁর চরিত্র মানবিক গুণে সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে।

উপন্যাসের ঘটনাকালে মুঙ্গেরে এক মঠে একজন পরমহংস বাস করতেন। পরমহংস বলতে বোঝায় যে মহাত্মা নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হয়ে শুধু তত্ত্বমার্গে বিচরণ করেন। যিনি সবসময় শুদ্ধ চিত্তে থেকে শুধু প্রাণধারণোপযোগী দানমাত্র পরিগ্রহ করেন, যার লাভালাভ উভয়েই সমান, যাঁর আশ্রয় নেই। দেবপ্রাঙ্গণ, বৃক্ষমূল, নদীপুলিন প্রভৃতি সাধারণ ভোগ্যভূমিই যাঁর আশ্রয়, যাঁর কোন বিষয়ে যত্ন বা মমতা নেই, যিনি পবাৎপর পবমেশ্ববে চিত্ত অর্পণপূর্বক শুভাশুভ কর্মক্ষয়ার্থ সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেন—তিনিই পরমহংস। এই ধরনের সন্ন্যাসী হলেন রমানন্দ স্বামী।

রমানন্দ স্বামী ছিলেন সিদ্ধপুরুষ ও তত্ত্বদর্শী এবং তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, বাগ্মী ও সংযমী পুরুষ। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞানেও তিনি প্রগাঢ় পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হলেও মানুষের কল্যাণকামী ছিলেন। তিনি বিচক্ষণ, কর্মতৎপর ও বহু শাস্ত্রবিদ। গৌণ চরিত্র হয়েও উপন্যাসের পরিণতিতে, শৈবলিনীর মানসিকতার পরিবর্তনে তথা তাঁর পাপ-স্খালনে, চন্দ্রশেখরের চিত্তে স্থৈর্য সম্পাদনে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ও যোগবলের জন্য ঔপন্যাসিক তাঁকে ব্যবহার করেছেন। এমনকি প্রতাপের যে পরিবর্তন ও আত্মত্যাগ তাও রমানন্দ স্বামীর স্বীকৃতি পেয়েছে।

রমানন্দ স্বামীকে আমরা প্রথম পাই চন্দ্রশেখরের গুরু হিসেবে। শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পর চন্দ্রশেখর যখন সংসার ছেড়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করলেন তখন এই রমানন্দ স্বামীর দ্বারাই তিনি দীক্ষিত হয়েছেন। চন্দ্রশেখরকে পরহিতব্রত বা পরোপকার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। এরপর রমানন্দ স্বামীর কর্মধারা চন্দ্রশেখরের কল্যাণ-চিন্তায় পার্থিব উন্নতি ও মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়েছে এবং এজন্য তাঁর কর্মতৎপরতা উপন্যাসে সাবলীলভাবে চিত্রিত হয়েছে। চন্দ্রশেখর রমানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এমন সময়ে যখন তিনি পন্ডিত হয়েও পত্নীর গৃহত্যাগে ক্ষতবিধ্বস্ত। সেই বিধ্বস্ত জীবনে রমানন্দ স্বামীর উক্তি (যে পরোপকারী সেই সুখী, অন্য কেউ সুখী নয়) বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। এই সূত্রেই কাহিনি বিন্যাসে রমানন্দ স্বামী উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এরপর উপন্যাসের নায়ক চন্দ্রশেখরকে নিয়ন্ত্রণ করে উপন্যাসের কাহিনির গতি পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। মুঙ্গের থেকে চন্দ্রশেখরকে স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং দলনী বিপদে পড়েছে বলে তাকে উদ্ধারের কাজে লাগিয়েছেন পরহিতব্রতের উদ্দেশ্যে। তাই রমানন্দ স্বামী সরাসরি, মূল কাহিনি ও উপকাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন।

শৈবলিনী যখন প্রতাপের-সান্নিধ্য ত্যাগ করে দুর্গম পর্বতে উপনীত হল তখন রমানন্দ স্বামীই অলক্ষ্যে থেকে তার জীবন রক্ষা করলেন এবং পর্বতগুহামধ্যে তাকে নিরাপদে রাখবার ব্যবস্থা করলেন। শৈবলিনীর হৃদয়কে কলুষমুক্ত করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধানের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন রমানন্দ স্বামী। তাঁরই কৃপায় চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর পুনর্মিলন সম্ভবপর হয়েছিল। রমানন্দ স্বামীর কাছ থেকে যোগবল লাভ করে এবং সেই যোগবল প্রয়োগ করে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর হৃদয়ের গূঢ়-রহস্য অবগত হয়েছিলেন। শৈবলিনীর চরিত্র যে সত্যই কলঙ্কমুক্ত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের পক্ষে পুনরায় শৈবলিনীকে গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। এই ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে রমানন্দ স্বামী অত্যন্ত তৎপর ছিলেন।

অসুস্থ শৈবলিনীকে সুস্থ করার জন্য রমানন্দ শৈবলিনীকে বেদগ্রামে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ ছিল —"যাঁহারা ইহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সর্বদা ইহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিও।" রমানন্দের প্রক্রিয়াতেই শৈবলিনী রোগমুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরই নির্দেশে শৈবলিনী ব্রত পালন করে স্বামীকে পেয়েছিলেন।

রমানন্দ স্বামীর কথাবার্তায় তাঁর যুদ্ধ ও রাজনীতি সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতাপ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়েছিলেন, তখন রমানন্দ স্বামীই তার কাছে উপস্থিত হয়ে তার হৃদয়ের গূঢ় কথাগুলি জেনে নিয়েছিলেন। ইংরেজের নৌকা থেকে অবতরণ করে দলনী যখন একাকী অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন তখন তিনিই দয়াপরবশ হয়ে তার উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হয়েছেন এবং তাকে তকি খাঁর আশ্রয়ে প্রেরণ করেছিলেন, যদিও দলনীর ক্ষেত্রে তা শুভ হয়নি।

রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক [illegible]কলাপ অতিপ্রাকৃতের আভাস দেয়। [illegible] বঙ্কিমচন্দ্র যে সব সন্ন্যা[illegible] চরি[illegible] অঙ্কন করে[illegible] [illegible]র কেউই অলৌকিক [illegible]বাবী নন [illegible]

থেকে রমানন্দ স্বামী স্বতন্ত্র চরিত্র, উপন্যাসের এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রমানন্দ স্বামীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং তিনিই প্রধান চরিত্রগুলির একটি সংযোগসূত্র রচনা করে দিয়েছেন। শৈবলিনীর আত্ম-উপলব্ধির জন্য ও নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য লেখক তাঁকে ব্যবহার করেছেন। তাই কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে রমানন্দ স্বামী চরিত্রের অবতারণা অপরিহার্য ছিল।

কুল্‌সম ঃ

গৌণ চরিত্র হলেও কুল্‌সম উপন্যাসে অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কুল্‌সম দলনীর বাঁদী হলেও বুদ্ধিবৃত্তিতে ও কর্মতৎপরতায় সে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে মতিবিবির পেষমনের মতো কুল্‌সমও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। সে দলনীর পরিচারিকা হলেও সহচরী ও সতী। সে বুদ্ধিমতী ও পরিহাসকুশলা। দলনী প্রেমিকা বলেই নিজের হিতাহিত বিচারশূন্যা। কিন্তু কুল্‌সম বাস্তবকে উপেক্ষা করতে পারে না। দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ হলে দলনী স্বতেজে দুর্গদ্বারে বসে ধরা পড়তে চেয়েছে, কিন্তু কুল্‌সম প্রশ্ন তুলেছে 'লোকে কি মনে করিবে, নবাবই বা কি মনে করিবেন'। এই ধরনের বিচাবোধ-সম্পন্না নারী হল কুল্‌সম। তার কথাবার্তা, আচার-আচরণের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধি ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয়।

দলনী কুল্‌সমকে দুঃসাহসিক কাজের ভার দিয়েছেন। সে কাজটি হল দলনীর একটি চিঠি গোপনে গুরগণ খাঁ-র কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই কাজকে সে আনন্দে মেনে নিয়েছে, এই কারণে যে কোন পুরুষ মেয়ে মানুষের চাতুরি ধরতে পারে না। তবে নবাবকে সে ভয় করে। কারণ বিনা অনুমতিতে দুর্গ ত্যাগ করবার জন্য নবাব বেগমকে ক্ষমা করলেও বাঁদীকে কখনও ক্ষমা করবেন না, এ ভয় কুল্‌সমের ছিল। যার জন্য সে ইংরেজের নৌকা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ লাভ করেও দলনীর সঙ্গ ত্যাগ করেছে। এই কাজটি দাসী কিম্বা সখীভাবের পরিপোষক নয়।

তাছাড়া দলনীকে ত্যাগ করে সে যে ভাল কাজ করেনি, তা সে পরে বুঝে আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়েছে। কুল্‌সম-ই জানে দলনীর প্রতি নবাবের অকৃত্রিম ভালোবাসা কেমন ছিল। যার জন্য দলনীকে বিষপানে হত্যা করানোর ব্যাপারে তার বিবেকবোধ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তকি খাঁ-র বিরুদ্ধে শুধু নয়, সুবে বাংলার নবাব মীরকাশেমকে সে এজন্য মূর্খ বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেনি। সামান্য বাঁদীর মুখে এ অভিযোগ যেন ছিন্নতন্ত্রী বীণার শেষ আর্তনাদ। সত্যভাষণের এ মহিমা একজন বাঁদীকেও মহনীয় করে তুলেছে।

আবার ফষ্টরের সমস্ত কুকীর্তি সম্পর্কে হেস্টিংসকে জানিয়েছিল কুল্‌সম। হেস্টিংস পত্রসহ কুল্‌সমকে নবাবের কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন এবং নবাবকে পত্র মারফত সব কথা জানিয়েছিলেন। কুল্‌সম-ই ছদ্মবেশী ফষ্টরকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে। তকি খাঁর কুকীর্তি সে ধরতে পারেনি, কারণ সে সময় দলনীর কাছে সে ছিল না। থাকার কথাও নয়। থাকলে

দলনীর ভাগ্য-বিপর্যয় চিহ্নিত হতে পারত না।

অন্যদিকে বাঁদী হয়েও কুল্‌সম যুদ্ধবিগ্রহের খবর অন্তঃপুরে পৌঁছে দিয়েছে ও বৃহত্তর কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে দিয়েছে। অস্ত্র বোঝাই নৌকা যে পাটনার কুঠিতে যাচ্ছে সে খবর পৌঁছে দিয়েছে কুল্‌সম। আবার কুল্‌সম বলেছে, ''মুঙ্গেরে যেমন হে সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনি নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি।'' এই ঘটনা ইতিহাসসম্মত।

কুল্‌সম-এর কৌতুকবোধও প্রশংসনীয়। যেমন, ''পুরুষ মানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভার্থ—তাহাতে দেখিতে পায় না। কৈ, পুরুষে মেয়েমানুষের চাতুরী কখন টের পাইল, এমন ত দেখিলাম না''।

কুল্‌সম দলনীর অনেক উপকার করলেও তার বিপদের সময় পাশে দাঁড়াতে পারেনি, অন্তত তার সুযোগ পায়নি। এদিক থেকে শেক্‌সপিয়রের ওথেলো নাটকের এমিলিয়ার সঙ্গে তার তুলনা চলে। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাই বলেছেন—''কুল্‌সম্ ওথেলো নাটকের এমিলিয়ার অনুসরণে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এমিলিয়ার মতই সে প্রভুপত্নীর প্রতি অনুরক্ত, আবার এমিলিয়ার মতই তাহার দৃষ্টি সংকীর্ণ।''

সুন্দরী ঃ

'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে শ্যা[illegible]রী ও 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সুন্দরী শুধু নামের মিল, তা না হলে দুটি চরিত্র ভিন্ন। গৌণ চরিত্র হলেও চরিত্রটি উপন্যাসে নানা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, ফষ্টর প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে সুন্দরী নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছে। সুন্দরীর কর্মপ্রচেষ্টা, সহানুভূতিশীলতা, সরলতা, উপস্থিত বুদ্ধি প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী চরিত্রটিকে সুন্দর করে তুলেছে।

সুন্দরীর বাবার নাম কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী, স্বামীর নাম শ্রীনাথ। সুন্দরীর বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। সুন্দরীর মা ছিলেন চিররুগ্না, তাই সাংসারিক কাজকর্মে অক্ষম। তাই প্রায়ই সুন্দরীকে পিত্রালয়ে থাকতে হত। প্রতাপ সুন্দরীর বোন রূপসীকে বিয়ে করেছিল। সুন্দরী মূলত শৈবলিনীর সখী হিসেবে চিত্রিত। এই কাজে তার সাহসিকতা, বাস্তবজ্ঞান ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রশংসনীয়।

সখীভাবের দিক থেকে সুন্দরী অপরূপ চরিত্র। বাংলার গার্হস্থ্যজীবনে ননদ-ভাজের সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে ছিল বিষতিক্ত, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা ছিল মধুর। সুন্দরী-শৈবলিনীর সম্পর্ক একটু দূর সম্পর্কিত ননদ-ভাজের; প্রীতি ও মাধুর্যই এ সম্পর্কের বন্ধন। সখীর সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখই-এ প্রীতির মূল কথা।

শৈবলিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে আমরা উপলব্ধি করি ভীমা পুষ্করিণীতে স্নানের সময়।

ফস্টরকে দেখে পালিয়ে গেলেও সুন্দরী ভীরু স্বভাবের মেয়ে ছিল না। আসলে শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সুন্দরী চরিত্র অস্ফুট। পুকুরধারে গোরা সাহেব দেখে সঙ্গীকে একা রেখে পালিয়ে যাওয়া সখী জনোচিত কাজ ছিল না। কিন্তু সেই কাজটি যথার্থ ভাবে করেছে শৈবলিনীর অপহরণের পর। আসন্ন সন্ধ্যায় গোরা সাহেবের উপস্থিতিতে গ্রামবাংলার স্বভাবভীরু নারীর যে চরিত্র ভীমা পুষ্করিণীর তীরে পাই, সেই নারী অবস্থাভেদে কেমন অসমসাহসিকা হতে পারে, সুন্দরী কর্তৃক অপহৃতা শৈবলিনীর উদ্ধারদৃশ্যে তা চিত্রিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে নাপিতানীর ছদ্মবেশে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যথার্থ বন্ধুর মতো কাজ করেছে সুন্দরী।

শৈবলিনীকে উদ্ধার করার জন্য সুন্দরীর নাপিতানী বেশে সাহেবের নৌকার অভিযান তার অশঙ্কিনী নারীমূর্তিকে প্রকাশ করেছে। ফস্টরের নৌকায় শৈবলিনীর সঙ্গে তার কথোপকথনে তার অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। শৈবলিনী সম্পর্কে সে বলেছে, "পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই।" আবার চন্দ্রশেখর সম্পর্কে সে বলেছে, "বিধাতা তাঁকে, সং গড়িয়া রাঙ্গতা দিয়া সাজান নাই—মানুষ করিয়াছেন।" সুন্দরী গ্রাম্য রমণী, তাই সে সংস্কারে আচ্ছন্ন। তাই সে বলেছে, "আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী; আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ্ নাই।"

শৈবলিনীর গৃহত্যাগের ব্যাপারে সুন্দরী বরাবর চিন্তিত ছিল। শৈবলিনীকে ফেরাতে না পেরে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেও হাল ছাড়েনি। প্রতাপের কাছে সে সব বলেছিল ও শৈবলিনী উদ্ধারে পুনরায় তৎপর হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন, ইতিহাসের স্পর্শেই স্বভাবভীরু নারী অসমসাহসিকা হয়ে উঠেছিল। আসলে গ্রামবাংলার নারীর মধ্যে এই কোমল কঠোরের মিশ্রণ ঘটেছে; সে নারী বজ্রগর্ভা কাদম্বিনী, কখনো সে মেদুর আবার কখনো সে বজ্র কঠিন। এর উৎসে রয়েছে অকৃত্রিম হৃদয়ভার। কেননা সুন্দরী শৈবলিনীকে 'পাপিষ্ঠা' বলেছে, তার মরণ কামনা করেছে—আবার সেই সুন্দরীই শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে মরেছে। সে প্রতাপকে উত্তেজিত করে তুলেছে এবং বেদগ্রামে শৈবলিনীর উন্মত্তদশা দেখে চোখের জল ফেলেছে, তার শুশ্রূষা করেছে। সে শৈবলিনীর জন্য কাতর হয়েছে, "সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে।"

শৈবলিনীকে সে যে কতটা ভালোবাসত তার প্রমাণ রয়েছে শৈবলিনীর উন্মত্ত অবস্থার মধ্যে। চন্দ্রশেখর যখন শৈবলিনীকে নিয়ে বেদগ্রামে আসেন, তখন সুন্দরী সবার আগে আসে এবং শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্ত করে ঘরে নিলে যে কোন অসুবিধা নেই তা ব্যক্ত করেছে ('তা, ওকে এনেছ বেশ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল')। আবার যখন সুন্দরী জানল, শৈবলিনী অসুস্থ তখন সুন্দরী কাঁদতে লাগল। তারপর চন্দ্রশেখরের বহুদিনের পরিত্যক্ত ঘরকে সে বাসোপযোগী করে তুলে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছিল সুন্দরী। তাই গৌণ চরিত্র হয়েও সুন্দরীর এই ক্রিয়াশীলতা উপন্যাসের কার্যকর ভূমিকা লাভ করেছে।

গুরগণ খাঁ ঃ

উপন্যাসে গুরগণ খাঁ গৌণ চরিত্র হলেও ভিলেন চরিত্র হিসেবে চিত্রিত। অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কূটকৌশলী, সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী চরিত্র হিসাবে গুরগণ উপন্যাসে চিত্রিত। উপন্যাসে গুরগণের প্রকৃত পরিচয় গোপন থেকেছে। সে মীরকাশেমের সেনাপতি পদে উন্নীত হয়েছে খুব সামান্য এক বস্ত্রবিক্রেতা হিসেবে।

সুদূর আর্মেনিয়া থেকে ভাগ্যান্বেষণে গুরগণ ভারতে আসে। সে দলনীকে নিয়ে বাংলাদেশে আসে। প্রথমে সে গজ মেপে কাপড় বিক্রয় করত। ভাগ্যের বশে এবং নবাব মীরকাশেমের আনুকূল্যে ও নিজের প্রতিভায় সে হয়ে ওঠে নবাবের প্রধান সেনানায়ক। গোলন্দাজ বাহিনী সৃষ্টি করে ও তাদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে, উৎকৃষ্ট কামান বন্দুক নির্মাণ করে সে নবাবের পর রাজ্যের দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়ে ওঠে। নবাব ও তার উপব যথেষ্ট আস্থা রেখেছিল। তার পরামর্শ ছাড়া মীরকাশেম কোন কাজ করত না। তার পবামর্শের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেও নবাব তা শুনতেন না। তাই "গুরগণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন"।

সুযোগসন্ধানী গুরগণ ভারতবর্ষকে সমুদ্র বলে মনে করত— "যে ডুব দিতে পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গণিলে কি হইবে? দেখ, আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—এখন আমার ভয়ে ভারতবাসী অস্থির; আমিই বাঙ্গালার কর্ত্তা।" সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে গুরগণ উপলব্ধি করল, ইংরেজকে তাড়াতে পারলে সে-ই হবে পরবর্তী বাংলার নবাব। তাই তার সিদ্ধান্ত হল, "এখন মীরকাশেম মসনদে থাক; তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীরকাশেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ।"

দলনীকে রাত্রে কাছে আসতে দেখে গুরগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েছে। কারণ তাদের পরিচয় নবাব জানে না। দলনী সেই পরিচয়ে এসেছে তা ব্যক্ত করায় গুরগণ দলনীকে 'বালিকা' সম্বোধন করেছে ও স্ত্রীলোকের পরামর্শ গ্রাহ্য করতে চায়নি। আবার ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নবাবের পরাজয় সম্পর্কে ভীত হলে তাকে কূটকৌশলী মানুষের মতো বলেছে, "স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে।" শুধু তাই নয়, নিজে যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাই তার কাজের সহায়তার জন্য দলনীকে প্রলুব্ধ করে গুরগণ বলেছে, "আমার ভরসা আছে, তুমি একদিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নূরজাহান হইবে।" দলনী গুরগণের এই বাক্যে বিরক্তি প্রকাশ করলে ও ধিক্কার জানিয়ে চলে গেলে গুরগণ বুঝেছে যে, তার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে দলনী সহায়ক হবে না। বরং স্বামীর মঙ্গলের জন্য দলনী যেহেতু ভাইয়ের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। তাই সে দলনী সম্পর্কে সাবধান হয়। গুরগণ যে স্বার্থান্ধ সেকথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল দলনী।

কূটবুদ্ধির অধিকারী গুরগণ উপলব্ধি করেছিল, যদি তার অভিসন্ধির কথা দলনী নবাবকে ফাঁস করে দেয়, তাহলে সমূহ বিপদ। তাই দুর্গদ্বারে দলনীর প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই নির্দেশের ফলে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দলনীর সাক্ষাৎ ও দলনীকে প্রতাপের গৃহে আশ্রয় দিয়ে

বিপত্তির সৃষ্টি। সুতরাং গুরগণের উদ্দেশ্যের জন্যই কাহিনির গতি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, গুরগণ খাঁর চক্রান্তের ফলে নবাবের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজের নৌকা আটক না করে দলনী বেগমকে আরো দূরে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।

গুরগণের উদ্দেশ্য নবাব যে ধরতে পারেনি তা নয়, তিনি ভেবেছিলেন, যুদ্ধটা সমাপ্ত হোক, তারপর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কিন্তু একের পর এক যুদ্ধে গুরগণের চক্রান্তে নবাব যুদ্ধ হেরেছেন। গুরগণের বিশ্বাসঘাতকতা উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে বিশেষ কার্যকর হয়েছে।

তকি খাঁ ঃ

তকি খাঁ ইতিহাসের চরিত্র হলেও ইতিহাসকে পুরোপুরি অনুসরণ করেননি বঙ্কিমচন্দ্র। কারণ ইতিহাস মতে মীরকাশেমের সেনাপতিদের মধ্যে তকি খাঁ বীর, বিশ্বস্ত ও কর্মনিষ্ঠ। তিনি বীরের মতোই কাটোয়ার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু উপন্যাসে তকি খাঁর অবিশ্বস্ততার কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে শুধু ইতিহাসের কালানুক্রম লঙ্ঘন করেননি, ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করে ইতিহাসের প্রভুভক্ত বীর তকির চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে যুদ্ধে মীরকাশেমের অসির আঘাতে তাকে নিহত করিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, "দুঃখের বিষয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে তকি খাঁয়ের একটি জঘন্য চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক ও অনৈতিহাসিক।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, নবাবী আমল)

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, মহম্মদ তকি খাঁ মীরকাশেমের রাজত্বকালে বীরভূমের ফৌজদার ছিলেন। কিন্তু উপন্যাসে তার কোন উল্লেখ নেই। উপন্যাসে আছে যে, আমিয়ট ও তার সঙ্গীদের নৌকা আটকাবার জন্য নবাব মুর্শিদাবাদে তকি খাঁর কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়ে মুর্শিদাবাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন সৈয়দ মহম্মদ, তকি খাঁ নয়।

তকি খাঁ প্রথমে বিশ্বাসী রাজকর্মচারীরূপে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে তকি খাঁর সাহসিকতার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু তারপর তার মধ্যে দেখা যায় কর্তব্যপালনে দ্বিধা। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজের বিপদের আশঙ্কায় তকি দলনীর নামে অত্যন্ত কুৎসাপূর্ণ খবর পাঠায়। এই খবরটি হল, দলনী আমিয়টের নৌকায় উপপত্নীরূপে বাস করেছে। মীরকাশেমও দলনীকে বিশ্বাসঘাতিনী ভেবে দলনীকে বিষপানে বধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আসলে এই চক্রান্তের মূলে ছিল তকি খাঁর দলনীর প্রতি ভালোবাসা ও প্রত্যাখ্যাত হওয়া। রূপদর্শনে উন্মত্ত তকি দলনীকে জানিয়েছিল যে, তাকে ভজনা করলে তার আর বিষপান করতে হবে না। এতে দলনী তাকে পদাঘাত করে। তকির বিশ্বাসঘাতকতা কুল্‌সমের কাছ থেকে জানতে পেরে নবাব তাকে স্বহস্তে বধ করেন।

কিন্তু ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে কাটোয়ার যুদ্ধে তকি খাঁ প্রাণ দিয়েছিলেন। ইতিহাসের বর্ণনা এরকম, "অগ্রগামী সৈন্যের অনেকেই ইহাতে নিহত হইল। একটি গুলি তকি খাঁর

মস্তক ভেদ করিয়া তাঁহার বীরকীর্তির অবসান করিয়া দিল।''

বঙ্কিমচন্দ্র তকিকে ব্যবহার করেছেন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিমূর্ত্তি হিসেবে। বিশেষ করে দলনীর স্বামী প্রেমের নিষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে তকি-র সঙ্গে দলনীর কথোপকথনে। তাই গৌণ চরিত্র হয়েও তকি খাঁ উপন্যাসে বলিষ্ঠভাবে চিত্রিত হয়েছে।

রামচরণ ঃ

দলনীর বাঁদী কুলসম্-এর মতো প্রতাপের ভৃত্য রামচরণ উল্লেখযোগ্য চরিত্র না হলেও তার ক্রিয়াকলাপ কৌতুক জাগ্রত করে। তার ধূর্ততাও প্রশংসনীয়। তার প্রভুভক্তির তুলনা নেই। কারণ সে প্রতাপের বিশ্বস্ত সহচর। লাঠি-বাজিতে রামচরণ প্রসিদ্ধ। গুলির নিশানা ভালো। কারণ শৈবলিনীকে উদ্ধারের সময় রামচরণ কিছুটা দূরে কসাড় বনে লুকিয়েছিল। প্রতাপ তখন জলে শৈবলিনীকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে অনুগত ভৃত্যের মতো রামচরণ গুলি করে প্রহরীর মৃত্যু ঘটায় এবং আর একটি গুলিতে ফষ্টরকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে শৈবলিনী উদ্ধার পর্বে বীরের ভূমিকা গ্রহণ করে।

তবে সে একটা ভুলও করেছিল। শৈবলিনীকে উদ্ধারের পর নির্দেশমত জগৎ শেঠের বাড়ীতে না নিয়ে গিয়ে প্রতাপের বাড়ীতে শৈবলিনীকে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী ঘটনাধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। আবার রামচরণ যেদিন মুক্তি পেয়েছিল আমিয়টের কাছ থেকে সেদিন অস্ফুট স্বরে ইন্ডিলমিন্ডিলের (ইংরেজদের) পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে নিন্দাসূচক কথা বলতে বলতে গিয়েছিল। অন্যদিকে অধিক রাত্রে ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখরকে দুইজন যুবতী স্ত্রীলোক (দলনী ও কুলসম)-কে কেন নিয়ে এলেন, সে ভাবনা প্রবল হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা করে ঠিক করল, 'বোধ করি ওই দুইজন স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন—কি জ্বালা, এ কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না।'' রামচরণের এই ব্যবহার কৌতুক জাগায়। সুতরাং রামচরণ গৌণ চরিত্র হয়েও পাঠকের মনে উঁকি দিয়ে যায়।

সাতাশ

চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ চন্দ্রশেখর

এক বোঁটায় দুই ফুল ঃ প্রতাপ ও শৈবলিনী

নজরুলের গানে যেমন 'একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু, মুসলমান' তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট এক বোঁটায় দুই ফুল ঃ প্রতাপ ও শৈবলিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের এই রোমান্টিক জুটি যেন আধুনিক চলচ্চিত্রের উত্তম-সুচিত্রা। তবে পার্থক্য বিস্তর। কারণ প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র কৈশোরেই অভিসম্পাতে জর্জরিত করেছেন। আবার দুজনের প্রেম ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন শ্রেণির। শৈবলিনী যতটা বাস্তবজ্ঞান সমৃদ্ধ প্রতাপ তেমনি আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত। কিন্তু উভয়েই প্রেমিক এবং উভয়ের জীবনে নেমে এসেছে ট্রাজিক পরিণতি।

পুরন্দরপুরের প্রতাপ ও শৈবলিনী কিশোর বয়সেই নিতান্ত খেলাচ্ছলে পরস্পরকে ভালোবেসেছিলেন। উপন্যাসের শুরুও এই দুই বালক-বালিকার লীলাচাঞ্চল্য দিয়ে— "ভাগীরথী তীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ, নদী, বৃক্ষ দেখিয়া আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ, বালিকার নাম শৈবলিনী।" তাবপর "বালিকা, ক্ষুদ্র করপল্লবে, তদ্বৎসুকুমার বন্যকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া, বালকের গলায় পরাইল। আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকেব গলায় পরাইল। স্থির হইল না—কে মালা পরিবে; নিকটে হৃষ্টপুষ্ট একটি গাই চরিতেছে দেখিয়া, শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল; তখন বিবাদ মিটিল।" এই মালার প্রসঙ্গ হয়তো শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' লেখার সময় স্মরণে ছিল। কেননা রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তকে পাঠশালায় বৈঁচিফলের মালা গেঁথে পরিয়েছিল। সে যাই হোক, প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাস্তবে উভয়ের মালা পরা হল না। কারণ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছিলেন। তাই প্রতাপ ও শৈবলিনীর খেলাচ্ছলে মালা পরানোর ব্যাপার নিছক খেলা রূপেই পরিগণিত হল।

মালা খেলা হয়ে যাওয়ার কাবণ হল সামাজিক বাধা, শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি কন্যা। প্রতাপ জানত এই বিয়ে হওয়ার নয়, তাই সে মনে মনে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শৈবলিনী বয়সে ছোট, তার উপলব্ধির বয়স তখনো হয়নি, তাই সে ভাবত প্রতাপের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল। তারপর প্রতাপ যেমন বুঝেছিল শৈবলিনীও বুঝল 'এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।' যদিও তার মনে মনে এই সত্য থেকেই গেল 'প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই'।

উভয়ের বিবাহ হবে না তা যখন উভয়েই জানল তখন দুজনে মিলে পরামর্শ করল গঙ্গায় সাঁতার দিতে দিতে দুজনে ডুবে মরবে। ডুবতে গিয়ে প্রতাপ ডুবল, শৈবলিনী ডুবতে গিয়েও পারল না। কারণ "শৈবলিনীর ভয় হইল, মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার

কে?' এখানেই দুজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয়ে গেল। একজন প্রেমের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত, অন্যজন বেঁচে থাকার ইচ্ছা নিয়ে আত্মত্যাগে অপারগ। এরপর চন্দ্রশেখরের বিয়ে হল শৈবলিনীর সঙ্গে এবং প্রতাপের হল রূপসীর সঙ্গে। দুই কপোত-কপোতী সামাজিক বাধায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা জোড়া লাগতে বেশিদিন লাগল না কাবণ শৈবলিনীর জীবনতৃষ্ণা ছিল প্রবল। তাই আট বছর অতীত হওয়ার পরও শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলতে পারল না, কিন্তু প্রতাপ শৈবলিনীকে ভোলার চেষ্টা করল। শৈবলিনীর প্রতাপকে ভুলতে না পারার কারণ স্বামীর অতিরিক্ত অধ্যয়নলিপ্সা ও স্ত্রীর প্রতি অমনোযোগিতা। তাই প্রতাপ যেখানে ধৈর্য ও সংযম রক্ষা করে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল, সেখানে শৈবলিনী প্রতাপকে লাভ করার আশায় সমাজ সংসার ত্যাগ করল।

তারপর প্রতাপ যখন শুনতে পেল, শৈবলিনী ইংরেজদের নৌকায় রয়েছে, তখন প্রতাপ কর্তব্যবোধের প্রেরণায় শৈবলিনীকে উদ্ধার করল। উদ্ধারের পর প্রতাপ স্বাভাবিকভাবেই গৃহত্যাগিনীকে 'পাপিষ্ঠা' সম্বোধন করে তার মুখ দেখতে নেই এমন কথা বললে শৈবলিনী তাব প্রতিক্রিয়ায় প্রতাপের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তির কথা জানিয়ে বলেছে, "তুমি কি জান না যে, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?" এখানে উভয়ের চরিত্রের ভিন্নতা সহজেই চোখে পড়ে।

এরপর প্রতাপের চরিত্রের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা শৈবলিনীকে পুনরায় তার গৃহধর্মে ফেরানোর ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। কারণ প্রতাপ জানে ভালোবাসার অপর নাম আত্মবিসর্জন। কিন্তু শৈবলিনী জানে ভালোবাসার মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনতৃষ্ণা। তাই গঙ্গাবক্ষে সন্তরণকালে সে শৈবলিনীকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিল যে, সে প্রতাপের চিন্তা বিস্মৃত হবে। ("প্রতাপ শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল"।) অর্থাৎ শপথের মধ্যেও শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি ভালোবাসা নিবৃত্ত হল না, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো তা শৈবলিনীর অন্তরে থেকেই গেল, যা প্রতাপের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত।

মূলত শৈবলিনীর ভালোবাসায় স্বার্থ ছিল, ছিল লালসা আর সেইসঙ্গে ছিল প্রবৃত্তির তাড়না। শৈবলিনীর ভলোবাসার প্রকৃতি ছিল চঞ্চল প্রকৃতির। শৈবলিনীর নামের অর্থ হল স্রোতস্বিনী। তাই তার চরিত্রে রয়েছে স্রোতস্বিনীর গতিময়তা, সেই গতিময় চঞ্চলতা শৈবলিনীর প্রধান মূলধন। অপরদিকে প্রতাপের ভালোবাসা উচ্চস্তরের। সে প্রেমিক হলেও চঞ্চল নয়, সে সমাজ সংসার সম্বন্ধে অজ্ঞও। তাই শৈবলিনীকে সে নষ্ট করতে চায় না। তাই শেষ পরিচ্ছেদে শৈবলিনী যখন প্রতাপকে বলেছে 'আমি সুখী হইব না, তুমি থাকতে আমার সুখ নাই—" তখন প্রতাপ দ্রুতবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছে জীবন বিসর্জনের জন্য।

শুধু তাই নয়, প্রতাপ শেষ মুহূর্তে তার ভালোবাসার পরিচয় ব্যক্ত করেছে রমানন্দ স্বামীর কাছে—"কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে আমার ভালবাসা বুঝিবে? কে

বুঝিবে, আজি এ ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি। আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিতরণ করিয়াছে। কখনও মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষ তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি সে কথা তুলিলেন কেন?'' সুতরাং প্রতাপের প্রেম ছিল তার অন্তরব্যাপী, কিন্তু সেই প্রেম কল্যাণবোধে উদ্দীপ্ত হওয়ায় তা শৈবলিনীর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত যেমন রাজলক্ষ্মীর সেবাশুশ্রূষা গ্রহণ করেও রাজলক্ষ্মীর জন্য রাজলক্ষ্মীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, প্রতাপও শৈবলিনীর জন্য শৈবলিনীকে ছেড়ে গেল।

প্রতাপ আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে প্রেমকে চিরন্তন রূপ দিয়ে গেল, প্রতাপের প্রেম অমর, সে মৃত্যুঞ্জয়ী। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের যে অমর শিখা শৈবলিনীর কাছে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, তাতে শৈবলিনী কি পারবে চন্দ্রশেখরের গৃহকোণকে পুনর্জীবিত করতে? আসলে প্রতাপের প্রেমের কাছে শৈবলিনী হেরেই গেল। এই হার মানা হার গলায় নিয়ে শৈবলিনীকে বাকি জীবন কাটাতে হবে। তাই প্রতাপের মৃত্যু মহৎ হলেও শৈবলিনীর শেষ জীবন বড্ড ট্র্যাজিক। সুবোধ সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে তাই বলেছেন, ''নীতিবেত্তা বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরের মুখ দিয়া শৈবলিনীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ''প্রতাপ কি তোমার জার?'' কবি বঙ্কিম শৈবলিনীর মারফতে উত্তর দিয়াছেন; ''ছি! ছি! —— এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম. ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলে কেন?''

আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা : প্রতাপ
এবং
দাম্পত্যপ্রীতি সর্বব্যাপিনী প্রীতির সোপান : চন্দ্রশেখর

প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর আসলে শিল্পী বঙ্কিমের দুই অনবদ্য সৃষ্টি। প্রেমের কল্যাণকর আত্মবিসর্জনের রূপ যেমন প্রতাপের মধ্যে চিত্রিত তেমনি দাম্পত্য প্রীতির সামাজিক দিকটি চন্দ্রশেখরের মধ্যে অঙ্কিত। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন উভয় প্রেমের পরিণতি যেন কল্যাণকর হয়। তাই প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর উভয়েই পরহিতব্রতে দীক্ষিত, তাদের প্রেমের স্বরূপও এদিক থেকে বিচার্য। আবার উভয়ের চরিত্র উন্নত হলেও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা। বয়সের দিক থেকে চন্দ্রশেখর প্রৌঢ়, আর প্রতাপ যুবক, চন্দ্রশেখর শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান অন্যদিকে প্রতাপ কর্মী, বীর, সংযমী ও কর্তব্যনিষ্ঠ। তবে গৃহদাহের মহিম ও সুরেশের সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না।

চন্দ্রশেখর চরিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ে'র ভূপতির কিছু সাদৃশ্য আছে, আবার প্রতাপের সঙ্গে 'চোখের বালি'র বিহারী, 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার এবং 'রজনী'র অমরনাথের

কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। দাম্পত্যজীবনের মধুর কোমল দিককে অস্বীকার করে প্রগাঢ় শাস্ত্রালোচনা ও বিদ্যার চর্চা করলে জীবনে কি ধরনের অশান্তি নেমে আসে তা চন্দ্রশেখর ও ভূপতির মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। অন্যদিকে 'চোখের বালি'র বিহারীর মতো প্রতাপ অনেকটা অন্তর্মুখী, সে তার প্রেমকে কল্যাণের জন্য লুক্কায়িত রেখেছে। আবার প্রতাপের আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে 'রজনী'র অমরনাথ এবং 'কপালকুন্ডলা'র নবকুমার।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রতাপ সক্রিয় চরিত্র, কিন্তু নাম ভূমিকার গৌরব চন্দ্রশেখরের। প্রেমের ভূমিতে প্রতাপের প্রেম সংযত পরার্থপর হলেও সেই প্রেম পরকীয়। তাতে চিত্ত-জয়ের মহিমা আছে, আত্মবিসর্জনের দীপ্তি আছে—কিন্তু সামাজিক আদর্শের দিক থেকে তা অসুস্থ ও অকল্যাণকর। অন্যদিকে চন্দ্রশেখর জ্ঞানবীর, সংযমী ও পরোপকারী। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপের মধ্যে প্রেমের আত্মবিসর্জনের রূপটিকে যেমন এঁকেছেন, তেমনি চন্দ্রশেখরের মতো জ্ঞানীর অন্তরে দাম্পত্য প্রেমের ক্ষমাসুন্দর আসনখানি পেতেছেন।

চন্দ্রশেখর পরোপকারী, প্রতাপও তাই। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে উদ্ধার করেছেন, সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক করিয়ে দিয়েছেন, নবাবের কাছারিতে প্রতাপের চাকরির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছেন। আবার সুন্দরীর কাছে প্রতাপ যখন জেনেছে শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর গৃহত্যাগ করে চলে গেছে তখন তাদের উদ্ধারের আশায় নিজেকে সর্বতোভাবে প্রয়াসী করেছে। প্রতাপকে চন্দ্রশেখর ফষ্টরবধে কাজ নেই বলে বলেছে, 'যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।' এই উক্তি শুনে প্রতাপ চন্দ্রশেখরকে বলেছেন, "আপনিই মনুষ্য মধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের অভীপ্সিত প্রেম-ভাবনার অনেকটা পূর্ণাঙ্গ চরিত্র প্রতাপ। 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিণী'। তাই প্রণয়ীর মঙ্গলের জন্য নিজের সুখভোগ ত্যাগ করে প্রেমের সার্থকতাকে তুলে ধরেছেন প্রতাপ। বাঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য প্রেমের বাইরের প্রেমকে অস্বীকার করেননি। তবে বালক-বালিকার বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে এই স্বভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রেমের রুদ্র রূপকে অঙ্কন করেছেন। সেইসঙ্গে সেই প্রেমকে চিত্ত সংযম, ইন্দ্রিয় জয় ও পরোপকার বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করে—প্রতাপের প্রেমকে আত্মবিসর্জনে মহনীয় করে তুলেছেন। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, দাম্পত্যপ্রীতি সর্বব্যাপিনী প্রীতির সোপান। স্মরজ অনুরাগ, রূপ, মোহ, উৎকট ভোগতৃষ্ণা, এই প্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে বলবতী ও দুর্দমনীয় করে তোলে। সামঞ্জস্য না করতে পারলে তা পাশব-বৃত্তির নামান্তর হয়ে সর্বনাশের কারণ হয়। চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে রূপের প্রতি যে বেগবান মোহ জেগেছিল, তাতে যে কি পরিণাম ঘটত, তা বলা যায় না। তাই কঠিন আঘাতে সুতীব্র মোহের বেগকে প্রতিহত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

চন্দ্রশেখর প্রথমে জ্ঞানী, তারপর গৃহী, তারপর ব্রহ্মচারী এবং শেষে গৃহী। অন্যদিকে প্রতাপ প্রথমে কিশোর প্রেমিক, পরে গৃহী, তারপর সৈনিক ও শেষে পরহিতব্রতে আত্মবিসর্জনকারী। চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে জ্ঞান ও প্রেমের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল, প্রতাপের মধ্যে সেই দ্বন্দ্ব ছিল না। চন্দ্রশেখরের মধ্যে স্বামী চন্দ্রশেখরের রূপ যথেষ্ট বলিষ্ঠ রূপে চিত্রিত হলেও প্রতাপ স্বামী হিসেবে কেমন তা চিত্রিত হয়নি। কারণ রূপসী 'কাব্যের উপেক্ষিতা'।

চন্দ্রশেখরের চরিত্র মহৎ ঠিকই, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু প্রতাপের চরিত্রে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। চন্দ্রশেখর সংসারে থেকেও সংসারের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারেননি, শাস্ত্রচর্চার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ তাঁকে অন্য সব বিষয়ের প্রতি উদাসীন করেছিল। প্রতাপ চন্দ্রশেখরের মতো পন্ডিত না হলেও কর্মকুশল, কর্তব্যপরায়ণ, সাহসী ও বীর। চন্দ্রশেখব যেমন তাঁব ঔদার্যের দ্বারা অপরাধিনী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন, প্রতাপও সেইরকম অথবা তার চেয়েও বেশি মহত্ত্বের সঙ্গে শৈবলিনীর কল্যাণের জন্য নিজেব প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। যদিও চন্দ্রশেখরই উপন্যাসের নায়ক তবুও প্রতাপ আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের প্রতীক এবং প্রতাপ হৃদযবৃত্তির বাহন। চন্দ্রশেখর রক্তমাংসের মানুষ হলেও অনেকখানি শিল্পীর আদর্শের বাহন, সেদিক থেকে প্রতাপ রক্তমাংসের সজীব মানুষ।

প্রেমের দুই পাত্রী ঃ শৈবলিনী ও দলনী

প্রিযা ও জায়া শৈবলিনী এবং 'স্ত্রীরত্নসার' দলনী বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপম সৃষ্টি। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসে যেমন অচলার বিপরীতে মৃণালকে চিত্রিত কবেছেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর বিপরীতে দলনীকে এঁকেছেন। একজন প্রেমের জন্য একনিষ্ঠ, বিষপাত্রকেও বরণ করে নিয়েছে, আর একজন প্রেমেব জন্য ডুবতে গিয়েও ডুবতে পারেনি এবং গৃহজীবনকেও অরণ্য করে ফেলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের স্বরূপ উপন্যাসে চিত্রিত করতে গিয়ে প্রেমের দুই পাত্রীকে একাধারে অঙ্কন করেছেন।

শৈবলিনী মূল কাহিনির নায়িকা এবং দলনী উপকাহিনির নায়িকা। প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত উভয়ের তুলনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—(অ) দলনী ও শৈবলিনী বিপরীত গুণসম্পন্না হলেও উভয়েই প্রেমিকা।

(আ) "শৈবলিনীর প্রেমে বর্ষার বেগবতী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় কুলপ্লাবিনী। ইহা ধর্ম্ম মানে নাই, সমাজ মানে নাই, সকল বাধা ও বন্ধন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া প্রমত্ত বেগে প্রণয়াস্পদের পানে ছুটিয়াছে, তাঁহাকে দলিয়া পিষিয়া নিবিড়ভাবে একান্ত আপনার করিয়া লইতে চাহিয়াছে। ইহা উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল ও লালসাদুষ্ট; ভোগলিপ্সায় ইহার অভিব্যক্তি। এই কারণে প্রেমের প্রথম পরীক্ষায় শৈবলিনীকে পবাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং পরে অগ্নিশুদ্ধ হইলেও, অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে না পারায় তাহাকে তাহার প্রণয়াস্পদের মৃত্যুর কারণ হইতে হইয়াছে। দলনীর প্রেম প্রভাত অরুণের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল, ইহা আপনার পক্ষপুটে প্রণয়াস্পদকে সকল অমঙ্গল হইতে আড়াল করিয়া বাখিতে চাহে। প্রণয়াস্পদের সভায় আত্মবিলোপ ইহার ধর্ম্ম, মৃত্যুতে ইহার অগ্নিপরীক্ষা।"

(ই) "শুধু প্রেমের অনুভূতিতে নহে, অন্যত্রও আমরা দলনী ও শৈবলিনীর চরিত্রের মৌলিক পার্থক্যকে লক্ষ্য করি। শৈবলিনী চতুরা, অসমসাহসিকা ও প্রত্যুৎপন্নমতি, দলনী সরলা, ভীরুস্বভাবা ও অবিমৃশ্যকারিণী।"

(ঈ) "শৈবলিনী নবাবকে বিভ্রান্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য আদায় করিয়া, চাতুর্যে ইংরেজের চক্ষে ধূলি দিয়া প্রতাপকে উদ্ধার করিয়াছে, দলনী স্বীয় নির্বুদ্ধিতা ও অবিমৃশ্যকারিতার ফলে গুরগণ খাঁর জালে পড়িয়া নিজেই নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে"।

শৈবলিনীর প্রেম তির্যক ও জটিল; দলনীর প্রেম পবিত্র ও কোমল। শৈবলিনী যেমন 'নষ্টনীড়ে'র চারু নয়, তেমনি দলনীও 'কপালকুণ্ডলা'র মতিবিবি নয়। শৈবলিনী স্বকীয় ও পরকীয় প্রেমের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত; দলনী একনিষ্ঠ প্রেমের লক্ষ্যে আত্মবিসর্জনেও শঙ্কা নেই। শৈবলিনী কখনও প্রিয়া, কখনও জায়া। বাল্যে প্রিয়া, কৈশোরে জায়া, যৌবনে পুনরায় প্রিয়া এবং প্রেমের অপ্রাপ্তিতে শেষ পর্যন্ত জায়া। প্রতাপ তার দয়িত, চন্দ্রশেখর তার স্বামী। অন্যদিকে দলনী একান্তই জায়া, সে স্বামীর মঙ্গলের জন্য ভাই-র অমঙ্গল করতে দ্বিধা করে না, ভাই-র সমস্ত রকম প্রলোভন জয় করে স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের খাতিরে। স্বামী দলনীর কাছে 'রাজাধিরাজ' জগতের আলো, অনাথের ভরসা, পৃথিবীপতি, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, দয়ার সাগর। শৈবলিনীর অন্তরে ছিল ভোগতৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা তাকে বহুদূর নিয়ে গেছে। কিন্তু দলনীর সেই তৃষ্ণা নেই, আছে শঙ্কা ও ব্যাকুলতা। শৈবলিনী প্রেমিকা হিসেবে অনবদ্য কিন্তু তার প্রেমের মধ্যে ছিদ্র নেই। অপরদিকে দলনীর প্রেমের মধ্যে এমন একটি ছিদ্র ছিল, যা তাঁর নিষ্ঠা ও পাতিব্রত্য সত্ত্বেও শোচনীয় পরিণামের কারণ হয়ে উঠেছে। আত্মসুখান্বেষী আবেগ, আবেগপ্রসূত অসম তেজ ও স্পষ্ট ভাষণ দলনীর প্রেমকে মাধুর্যমণ্ডিত করলেও বৃহত্তর স্বার্থে এ প্রেম অকিঞ্চিৎকর। আত্মসুখের আবেগে যার স্থিতি, বিষপাত্র তার পরিণাম।

শৈবলিনীর প্রেমের পরিণাম গণনাতেও ভুল হয়েছিল। তাই তার চরিত্র করুণ। দলনীর পরিণামও করুণ। কিন্তু মৃত্যু সে কারুণ্যের উপর যবনিকা টেনে দিয়েছে, শৈবলিনীকে লেখক প্রাণে বিনাশ করেননি। নৈতিক শুদ্ধির বকযন্ত্রে ফেলে তার প্রিয়া সত্তাকে বিনষ্ট করে জায়ারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে বিষদান্ত পরিণাম যেন আরও করুণ, আরও গভীর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে শৈবলিনী, সেক্ষেত্রে দলনীর স্থান গৌণ। তবুও দলনীর চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে লেখক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। দলনীর উজ্জ্বল চরিত্রের সমান্তরালে শৈবলিনীর কলঙ্ক কালিমার রূপটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরাই ছিল লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই শৈবলিনীকে প্রকাশ করতে হলে দলনীর প্রয়োজন ছিল, যেমন প্রয়োজন অন্ধকারের ভয়বহতাকে ফোটাবার জন্য আলোর উজ্জ্বলতা। উভয় চরিত্রের তুলনা প্রসঙ্গে জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, "শৈবলিনী পাপিষ্ঠা, দলনী পুণ্যবতী। শৈবলিনী স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী, দলনী স্বামীগতা প্রাণ। শৈবলিনীর চরিত্র জটিল, কিন্তু দলনীর চরিত্র অতিশয় সরল। শৈবলিনীর জীবনে দুঃখের শেষে শান্তির আভাস, আর দলনীর চরিত্র শান্তি মাধুর্যমণ্ডিত।"

এই দুই নারী যেন আমাদের সমাজের প্রেমের দুই রূপ। নারীর মোহিনী মূর্তির প্রকাশ শৈবলিনীতে এবং কল্যাণশ্রীর প্রকাশ দলনী চরিত্রে। শৈবলিনী বিবাহিত জীবনে অন্যপূর্বা নায়িকা, বাল্য তথা পূর্ব প্রণয়ী প্রতাপের প্রতি উন্মুখী এক সূর্যমুখী যেন। আর দলনী স্বামী

প্রেমের শুভ্র পবিত্র একমুখী নিষ্ঠায় যেন রজনীগন্ধা। শৈবলিনীর প্রেমানুভব সমাজ নিন্দিত, তাই শেষ পর্যন্ত শৈবলিনী বিদ্রোহিনী। অন্যদিকে দলনীর প্রেম স্নিগ্ধ; তা সমাজ অনুমোদিত বলেই শোভন। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে শৈবলিনী 'পাপিষ্ঠা' কিন্তু দলনী 'স্ত্রীরত্নসার'।

তাই শৈবলিনীর তীব্র জ্বালাময় চিত্র হৃদয়কে অস্থির করে তোলে। কিন্তু দলনীর স্নিগ্ধ মাধুর্য মনে এক শান্ত সুন্দর প্রশান্তির ভাব বিস্তৃত করে। সমালোচক তাই উভয়ের চরিত্রের তুলনায় জানিয়েছেন, ''শৈবলিনীর প্রণয়ে যেরূপ প্রণয়ের উগ্রমূর্তিটি প্রদর্শিত হইয়াছে, দলনীর প্রণয়ে আবার সেইরূপ প্রণয়ের শান্ত ও মোহন দৃষ্টি দেখানো হইয়াছে। একটিতে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের খরতর প্রভা দেখিতে পাই। অন্যটিতে শারদীয় পূর্ণিমার বিমল, স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখিতে পাই। একটির প্রণয় বাধা পাইয়া উগ্রভাব ধরিয়াছিল, অন্যটির প্রণয় বাধা না পাইয়া নীরবে স্রোতস্বিনীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছিল। একটির প্রণয় কলুষিত, অন্যটির প্রণয় পবিত্র। এইরূপ সর্বদা বিপরীত ভাব লইয়া দলনী বেগম 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থের একটি অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছেন।''

সুতরাং 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে ঐতিহাসিক রোমান্সের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেই প্রয়োজনেই প্রেমের দুই পাত্রী শৈবলিনী ও দলনীর প্রয়োজন ছিল। দুটি সমান্তরাল চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমের সার্বিক রূপটিই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করা যেতে পারে—''দুটি নারী চরিত্রের হৃদয়-নির্গত ভাবপ্রবাহ ক্রমবর্ধিত বেগে বিচিত্র পথের সৃষ্টি করতে করতে এগিয়ে চলে এক সময়ে একত্র মিলিত হয়েছে, তারপর দুর্বারতর বেগে, বিচিত্রতর পথে, আবার এগিয়ে চলেছে। এই হৃদয়-নির্গত ভাবপ্রবাহ ও নদীপথ আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বোধ হলেও দুয়ে এক, কার্যকর সূত্রে গ্রথিত। নারী দুজন শৈবলিনী ও দলনী; ভাবপ্রবাহ প্রতাপ ও মীরকাশেমের প্রতি গভীর আসক্তি; নদীপথ চন্দ্রশেখর উপন্যাস।

উপক্রমণিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বালক বালিকা

ভাগীরথীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদুর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ নদী বৃক্ষ, দেখিয়া আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ—বালিকার নাম শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত আট বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক।

মাথার উপরে শব্দ তরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূলবিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তর তর রব সে ব্যঙ্গসঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

বালিকা, ক্ষুদ্র করপল্লবে, তদ্বৎ সুকুমার বন্যকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া, বালকের গলায় পরাইল। আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল। স্থির হইল না—কে মালা পরিবে; নিকটে হৃষ্টা পুষ্টা একটি গাই চরিতেছে দেখিয়া, শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল; তখন বিবাদ মিটিল। এইরূপ ইহাদের সর্বদা হইত। কখন বা মালার বিনিময়ে বালক, নীড় হইতে পক্ষীশাবক পাড়িয়া দিত। আম্রের সময় সুপক্ক আম্র পাড়িয়া দিত।

সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গণিতে বসিল, কে আগে দেখিয়াছে? কোন্‌টি আগে উঠিয়াছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা। মিথ্যা কথা। শৈবলিনী তিনটা বৈ দেখিতেছে না।

নৌকা গণ। কয়খানা নৌকা যাইতেছে বল, দেখি? ষোলখানা? বাজি রাখ—আঠারখানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না, একবার গণিয়া নয়খানা হইল, আর একবার গণিয়া একুশখানা হইল। তারপর গণনা ছাড়িয়া উভয়ে একাগ্রচিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোণা জ্বলিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাৎ আছে। যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ, তাহাদের কয়জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয়? কয়জন বাঁচিয়া থাকে? কয়জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্দ্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সকল বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর!

বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর—উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কাল-প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।

শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।

শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না, কেবল মাতা। তাহাদের কিছু ছিল না, কেবল একখানি কুটীর—আর শৈবলিনীর রূপরাশি। প্রতাপও দরিদ্র।

শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূরিতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে? সে অরণ্যমধ্যে সন্ধান করিয়া কে সে রূপরাশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে?

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইল, দুই জনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল—"আয় শৈবলিনী! সাঁতার দিই।" দুইজনেই সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুইজনেই পটু—তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলেই পারিত না। বর্ষাকালে—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। ফেনচক্রমধ্যে, সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয় রজতাঙ্গুরীয়মধ্যে রত্ন যুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল। সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না—চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুই জনের কেহ শুনিল না—চলিল। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল—"শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে।"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন, এইখানেই।"

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল, মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর মিলিল

যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পান্সী বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী একজন দেখিল প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী চন্দ্রশেখর শর্ম্মা।

চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন।

প্রতাপের মাতা ছাড়িল না, চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া, সেদিন তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী প্রতাপকে আর মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন।—দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত। তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই। দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্তই নিরুৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিককাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়; অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দেবসেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটে,—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন, কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।

কিন্তু চন্দ্রশেখর স্থির করিলেন, যদি বিবাহ করি, তবে সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না। কেন না, সুন্দরীর দ্বারা মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা। সংসারবন্ধনে মুগ্ধ হওয়া হইবে না।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?

এই বিবাহের আট বৎসর পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

প্রথম খণ্ড

পাপীয়সী

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ দলনী বেগম

সুবে বাঙ্গাল, বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীর কাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন। দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে, রঙ্গমহলে একস্থানে বড় শোভা। রাত্রি প্রথম প্রহর এখনও অতীত হয় নাই। প্রকোষ্ঠমধ্যে সুরঞ্জিত হর্ম্ম্যতলে, সুকোমল গালিচা পাতা। রজতদীপে গন্ধতৈলে জ্বালিত আলোক জ্বলিতেছে। সুগন্ধ কুসুমদামের ঘ্রাণে গৃহ পরিপূরিত হইয়াছে। কিঙ্খাবের বালিশে একটি ক্ষুদ্র মস্তক বিন্যস্ত কবিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া বালিকাকৃতি যুবতী শয়ন করিয়া গুলেস্তাঁ পড়িবার জন্য যত্ন পাইতেছে। যুবতী সপ্তদশবর্ষীয়া, কিন্তু খর্ব্বাকৃতা বালিকার ন্যায় সুকুমার। গুলেস্তাঁ পড়িতেছে, এক একবার উঠিয়া চাহিয়া দেখিতেছে এবং আপন মনে কতই কি বলিতেছে। কখনও বলিতেছে, "এখনও এলেন না কেন?" আবার বলিতেছে, "কেন আসিবেন? হাজার দাসীর মধ্যে আমি একজন দাসীমাত্র, আমার জন্য এতদূর আসিবেন কেন?" বালিকা আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে প্রবৃত্ত হইল।

আবার অল্পদূর পড়িয়াই বলিল, "ভাল লাগে না। ভাল, নাই আসুন আমাকে স্মরণ করিলেই ত আমি যাই, তা আমাকে মনে পড়িবে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে একজন বৈ ত নই।" আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে আরম্ভ করিল, আবার পুস্তক ফেলিল, বলিল, "ভাল, ঈশ্বর কেন এমন করেন? একজন কেন আর একজনের পথ চেয়ে পড়িয়া থাকে? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন? তখন যুবতী পুস্তক ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিল। নির্দ্দোষগঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গরাশিতুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার দুলিল—স্বর্ণরচিত সুগন্ধবিকীর্ণকারী উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল—তাহার অঙ্গসঞ্চালনমাত্র গৃহমধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল। অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্যমাত্রে তরঙ্গ উঠে, তেমনি তরঙ্গ উঠিল।

তখন সুন্দরী এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল এবং ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে গীত আরম্ভ করিল—যেন শ্রোতার ভয়ে ভীতা হইয়া গাহিতেছে। এমত সময়ে নিকটস্থ প্রহরীর অভিবাদন-শব্দ এবং বাহকদিগের পদধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বালিকা চমকিয়া উঠিয়া, ব্যস্ত হইয়া দ্বাবে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নবাবের তাঞ্জাম। নবাব মীব কাসেম আলী খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণপূর্ব্বক, এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দলনী বিবি, কি গীত গায়িতেছিলে।" যুবতীব নাম বোধ হয়, দৌলতউন্নিসা, নবাব তাহাকে সংক্ষেপার্থ 'দলনী' বলিতেন। এজন্য পৌরজন সকলেই 'দলনী বেগম" বা "দলনী বিবি" বলিত।

দলনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিল। দলনীর দুর্ভাগ্যক্রমে নবাব বলিলেন, "তুমি যাহা গায়িতেছিলে, গাও, আমি শুনিব।"

তখন মহা গোলযোগ বাধিল। তখন বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাধে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরা বলিতে লাগিল বোধ হইল। নবাব বলিলেন, "হইয়াছে, তুমি উহার সঙ্গে গাও।" তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুরবোধ হয় নাই। তারপর—তারপর দলনীর মুখও ফুটিল না! দলনী মুখ ফুটাইতে কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই মুখ কথা শুনিল না, কিছুতেই ফুটিল না। মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। ভীরুস্বভাব কবির কবিতা কুসুমের ন্যায় যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয়সম্বোধনের ন্যায় ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।

তখন দলনী সহসা বীণা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি গায়িব না।"

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? রাগ না কি?"

দ। কলিকাতার ইংরেজেরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায় তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সম্মুখে পুনর্ব্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।

মীর কাসেম হাসিয়া বলিলেন, "যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে, তবে অবশ্য দিব।"

দ। কাঁটা পড়িবে কেন?

নবাব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বুঝি তাহাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন, তুমি কি সে সকল কথা শুন নাই?"

"শুনিয়াছি" বলিয়া দলনী নীরব রহিল। মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "দলনী বিবি, অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছ?"

দলনী বলিল, "আপনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন?—আমি বালিকা, দাসী, এ সকল কথা আমার বলা নিতান্ত অন্যায়, কিন্তু বলিবার একটি অধিকার আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভালবাসেন।"

নবাব বলিলেন, "সে কথা সত্য দলনী,—আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে যেমন ভালবাসি আমি কখনও স্ত্রীজাতিকে এরূপ ভালবাসি নাই, বা বাসিব বলিয়া মনে করি নাই।"

দলনীর শরীর কন্টকিত হইল। দলনী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল—তাহার চক্ষে জল পড়িল। চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "যদি জানেন, যে ইংরাজের বিরোধী হইবে, সেই হারিবে, তবে কেন তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?"

মীরকাসেম কিঞ্চিৎ মৃদুতরস্বরে কহিলেন, "আমার আর উপায় নাই। তুমি নিতান্ত আমারই, এইজন্য তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি—আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয় ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীরজাফরও নহি।"

দলনী মনে মনে বাঙ্গালার অধীশ্বরের শত শত প্রশংসা করিল। বলিল, "প্রাণেশ্বর! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি কি বলিব? কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে। আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না।"

মীরকা। এ বিষয়ে কি বাঙ্গালাব নবাবের কর্তব্য যে, স্ত্রীলোকের পবামর্শ শুনে? না বালিকার কর্তব্য যে, এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়?

দলনী অপ্রতিভ হইল, ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, "আমি না বুঝিয়াই বলিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলিয়াই এ সকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই।"

"কি?"

"আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন?"

"কেন, তুমি যুদ্ধ করিবে না কি? বল, গুর্‌গণ খাঁকে বরতরফ করিয়া তোমায় বাহাল করি!"

দলনী আবার অপ্রতিভ হইল, কথা কহিতে পারিল না। মীর কাসেম তখন সস্নেহভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন যাইতে চাও?"

"আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়া।" মীরকাসেম অস্বীকৃত হইলেন। কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল; জাঁহাপনা, আপনি গণিতে জানেন; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব?"

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, "তবে কলমদান দাও।"

দলনীর আজ্ঞাক্রমে পরিচারিকা সুবর্ণনির্ম্মিত কলমদান আনিয়া দিল।

মীরকাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন, শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলেন?"

মীরকাসেম বলিলেন, "যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।"

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীরমুন্‌সীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে যে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে একজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরে দলনী বেগম কোথায় থাকিবে?"

মীরমুন্‌সী তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ভীমা পুষ্করিণী

ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিধারে ঘন ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের

কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল পর্য্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত অল্পান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসীহস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না; আমরা জল নহি। যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনি বলিতে পারিবেন। তিনি বলিতে পারেন, কেমন করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার শিঞ্জিতের তালে, তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরি গ্রথিত জলপুষ্পের মালা দোলাইয়া সেই তালে তালে নাচে। সন্তরণ-কুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া, জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন কলসী ভাসাইয়া দিয়া, মৃদু বায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া বিম্বাধরে জল স্পৃষ্ট করে বক্ত্র মধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে; সূর্য্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে। জল পতনকালে বিম্বে বিম্বে শত সূর্য্য ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্তপদসঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। দুই সমান। জল চঞ্চল, এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?

পুষ্করিণীর শ্যামল জলে স্বর্ণরৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

সুন্দরী বলিল, "ভাই সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল, বাড়ী যাই।"

শৈবলিনী। কেহ নাই, ভাই, চুপি চুপি একটি গান গা না।

সু। দূর হ! পাপ! ঘরে চ!

শৈ। ঘরে যাব না লো সই।

আমার মদনমোহন আসছে ওই!
হায়! যাব না লো সই!

সু। মরণ আর কি? মদনমোহন ত ঘরে বোসে সেইখানে চল না।

শৈ। তাঁরে বল গিয়া, তোমার মদনমোহিনী ভীমার জল শীতল দেখিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

সু। নে, এখন রঙ্গ রাখ। রাত হলো—আমি দাঁড়াইতে পারি না। আবার আজ ক্ষেমীর মা বলছিল, এ দিকে একটা গোরা এসেছে।

শৈ। তাতে তোমার আমার ভয় কি?

সু। আ মলো, তুই বলিস কি? ওঠ, নহিলে আমি চলিলাম।

শৈ। আমি উঠবো না—তুই যা।

সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। পুনর্ব্বার শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, হ্যাঁ লো, সত্য সত্য তুই কি এই সন্ধ্যেবেলা একা পুকুরঘাটে থাকবি নাকি?

শৈবলিনী কোন উত্তর করিল না। অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। অঙ্গুলিনির্দ্দেশানুসারে

সুন্দরী দেখিল, পুষ্করিণীর অপর পারে এক তালবৃক্ষতলে, সর্ব্বনাশ! সুন্দরী আর কথা না করিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পিতল-কলস গড়াইতে গড়াইতে ঢক্ ঢক্ শব্দে উদরস্থ জল উদ্গীর্ণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার বাপী জলমধ্যে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী তালবৃক্ষতলে একটি ইংরেজ দেখিতে পাইয়াছিল।

ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া, আর্দ্রবসনে কবরীসমেত মস্তকের অগ্রভাগমাত্র আবৃত করিয়া, প্রফুল্ল-রাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘমধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল।

সুন্দরী পলাইয়া গেল, কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে তালগাছের অন্তরালে থাকিয়া ঘাটের নিকটে আসিল।

ইংরেজ, দেখিতে অল্পবয়স্ক বটে। গুল্ফ বা শ্মশ্রু কিছুই ছিল না। কেশ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুও ইংরেজের পক্ষে কৃষ্ণাভ। পরিচ্ছদের বড় জাঁকজমক, এবং চেন, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কারের কিছু পারিপাট্য ছিল।

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া জলের নিকট আসিযা বলিল, 'I come again fair lady."

শৈবলিনী বলিল, "আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।"

ইংরেজ। Oh-ay-that nasty gibberish–I must speak it, I suppose, হম্ again আয়া হ্যায়।

শৈ। কেন, যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, "কিয়া বোল্‌তা হ্যায়।"

শৈ। যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?

ইংরেজ। যম। Jhon you mean হম্ জন্ নহি, হম লরেন্স।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজী কথা শিখিলাম—লরেন্স অর্থে বাঁদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফস্টর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। লরেন্স ফস্টর পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আম্রবৃক্ষতল হইতে অশ্বমোচন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক টিবিয়ট নদীর তীরস্থ পর্বতপ্রতিধ্বনি সহিত শ্রুতগীতি স্মরণ করিতে করিতে চলিলেন। এক একবাব মনে হইতে লাগিল, 'সেই শীতল দেশের তুষাররাশির সদৃশ যে মেরি ফস্টরের প্রণয়ে বাল্যকালে অভিভূত হইয়াছিলাম, এখন সে স্বপ্নের মত। দেশভেদে কি রুচিভেদ জন্মে? তুষারময়ী মেরী কি শিখারূপিণী উষ্ণদেশের সুন্দরীর তুলনীয়া? বলিতে পারি না।"

ফস্টর চলিয়া গেলে, শৈবলিনী ধীরে ধীরে জলকলস পূর্ণ করিয়া কুম্ভকক্ষে বসন্তপবনারূঢ় মেঘবৎ মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

তথায় শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া নামাবলীতে কটিদেশের

সহিত উভয় জানু বন্ধন করিয়া, মৃৎপ্রদীপ সম্মুখে, তুলটে হাতে লেখা পুঁথি পড়িতেছিলেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার পর একশত দশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ। তাঁহার আকার দীর্ঘ; তদুপোযোগী বলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত— তদুপরি চন্দন রেখা। শৈবলিনী গৃহ প্রবেশকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন, 'যখন ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্রি হইল, তখন কি বলিব?'' কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মসূত্রের সূত্রবিশেষের অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল।

তখন চন্দ্রশেখর চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, ''আজি এত অসময়ে বিদ্যুৎ কেন?''

শৈবলিনী বলিল, আমি ভাবিতেছি, না জানি আমায় তুমি কত বকিবে!

চন্দ্র। কেন বকিব?

শৈ। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে তাই।

চন্দ্র। বটেও ত—এখন এলে না কি? বিলম্ব হইল কেন?

শৈ। একটা গোরা আসিয়াছিল। তা, সুন্দরী ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায় ছিল, আমায় ফেলিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া আসিল। আমি জলে ছিলাম, ভয়ে উঠিতে পারিলাম না। ভয়ে একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।

চন্দ্রশেখর অন্যমনে বলিলেন, ''আর আসিও না।'' এই বলিয়া আবার শাঙ্কর ভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি অত্যন্ত গভীরা হইল। তখনও চন্দ্রশেখর, প্রমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদি তর্কে নিবিষ্ট। শৈবলিনী প্রথামত স্বামীর অন্ন ব্যঞ্জন তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া, আপনি আহারাদি করিয়া পার্শ্বস্থ শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের অনুমতি ছিল—অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি বিদ্যালোচনা করিতেন, অল্পরাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিতে পারিতেন না।

সহসা সৌধোপরি হইতে পেচকের গম্ভীর কণ্ঠ শ্রুত হইল। তখন চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া, পুঁথি বাঁধিলেন। সে সকল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, আলস্যবশতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। মুক্ত বাতায়নপথে কৌমুদীপ্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে!—তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে, শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রূযুগতলে, মুদিত পদ্ম-কোরকসদৃশ, লোচন-পদ্ম দু'টি মুদিয়া রহিয়াছে;—সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে, সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, সুকুমার রসপূর্ণ তাম্বুলরাগারক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন করিয়া, মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিৎমাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন, কি সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল। আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ সুষুপ্তিসুস্থির হইল।

সেই বিলাস চাঞ্চল্য শূন্য, সুষুপ্তিসুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। ভাবিলেন, 'হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি? এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম।''

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রশেখর আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে মীরমুন্‌সীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। নবাবের কাজ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ লরেন্স ফষ্টর

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফস্টর তথাকার ফ্যাক্টর বা কুঠিয়াল। লরেন্স অল্প বয়সে মেরি ফস্টরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী স্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত। ফস্টর অল্পকালেই সে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং মেরির প্রতিমা তাঁহার মন হইতে দূর হইল। একদা তিনি প্রয়োজনবশতঃ বেদগ্রামে গিয়াছিলেন—ভীমা পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল পদ্মস্বরূপা শৈবলিনী তাঁহার নয়ন-পথে পড়িল। শৈবলিনী গোরা দেখিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু ফস্টর ভাবিতে ভাবিতে কুঠিতে ফিরিয়া গেলেন। ফস্টর ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কটা চক্ষু অপেক্ষা কাল চক্ষু ভাল, এবং কটা চুলের অপেক্ষা কাল চুল ভাল। অকস্মাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, সংসার-সমুদ্রে স্ত্রীলোক তরণীস্বরূপ—সকলেরই সে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—যে সকল ইংরেজ এদেশে আসিয়া পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়া, বাঙ্গালী সুন্দরীকে এ সংসারে সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা মন্দ করেন না। অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে, ধনলোভে ইংরেজ ভজিয়াছে,—শৈবলিনী কি ভজিবে না? ফস্টর কুঠির কারকুন্‌কে সঙ্গে করিয়া আবার বেদগ্রামে আসিয়া বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। কাবকুন্ শৈবলিনীকে দেখিল—তাহার গৃহ দেখিয়া আসিল।

বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজু নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখিতে চাহে, শৈবলিনীর সেই দশা ঘটিল। শিবলিনী, প্রথম প্রথম তৎকালের প্রচলিত প্রথানুসারে ফস্টরকে দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইত। পরে কেহ তাহাকে বলিল, 'ইংরেজেরা মনুষ্য ধরিয়া সদ্য ভোজন করে না—ইংরেজ অতি আশ্চর্য্য জন্তু—একদিন চাহিয়া দেখিও।" শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল—ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া সদ্য ভোজন করিল না। সেই অবধি শৈবলিনী ফস্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাঁহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল। তাহাও পাঠক জানেন।

অশুভক্ষণে শৈবলিনী ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অশুভক্ষণে চন্দ্রশেখর তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী যাহা, তাহা ক্রমে বলিব; কিন্তু সে যাই হউক, ফস্টরের যত্ন বিফল হইল।

পরে অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফস্টরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল যে, "পুরন্দরপুরের কুঠিতে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। তোমাকে কোন বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।" যিনি কুঠিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফস্টরকে সদ্যই কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে।

শৈবলিনীর রূপ ফস্টরের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। দেখিলেন, শৈবলিনীর আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভসম্বরণে অক্ষম, এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই ভাল। এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্যে অধর্ম আছে, অতএব অকর্তব্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম বৃটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্যসম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখনও দেখা দেয় নাই।

লরেন্স ফস্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভ সম্বরণ করিলেন না—বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম্মশব্দ লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি সাধ্যাসাধ্যও বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "Now or never"!

এই ভাবিয়া, যেদিন কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠির কয়জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্র বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে বেদগ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সে দিন গৃহে ছিলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে রাজকর্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন—অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই। গ্রামবাসীরা চিৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদনধ্বনি শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রশেখরের বাড়ী ডাকাইতি হইতেছে—অনেক মশালের আলো। কেহ অগ্রসর হইল না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, বাড়ী লুঠিয়া ডাকাইতেরা একে একে নির্গত হইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, কয়েকজন বাহকে একখানি শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ—সঙ্গে পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব। দেখিয়া সকলে সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুগণ চলিয়া গেল প্রতিবাসীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল দ্রব্য সামগ্রী বড় অধিক অপহৃত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই। কেহ কেহ বলিল, "সে কোথায় লুকাইয়াছে, এখনই আসিবে।" প্রাচীনেরা বলিল, "আর আসিবে না—আসিলেও চন্দ্রশেখর তাহাকে আর ঘরে লইবে না। যে পাল্কী দেখিলে, ঐ পাল্কীমধ্যে সে গিয়াছে।"

যাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল যে, শৈবলিনী আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, শেষে বসিল। বসিয়া বসিয়া, নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল। ঢুলিয়া ঢুলিয়া, বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। শৈবলিনী আসিল না।

সুন্দরী নামে যে যুবতীকে আমরা প্রথম পরিচিতা করিয়াছি, সেই সকলের শেষে উঠিয়া গেল। সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী। শৈবলিনীর সখী। আবার তাহার কথা উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া এ স্থলে এ পরিচয় দিলাম।

সুন্দরী বসিয়া বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল, গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ নাপিতানী

ফস্টর স্বয়ং শিবিকাসমভিব্যাহারে লইয়া দূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাস দাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন আবার হিন্দু দাস-দাসী কেন?

ফস্টর নিজে অন্য যানে কলিকাতায় গেলেন। তাঁকে শীঘ্র যাইতে হইবে—বড় নৌকায় বাতাস ঠেলিতে ঠেলিতে সপ্তাহে কলিকাতায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শৈবলিনীর জন্য স্ত্রীলোকের আরোহণোপযোগী যানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি যানান্তরে কলিকাতায় গেলেন। এমত শঙ্কা ছিল না যে, তিনি স্বয়ং শৈবলিনীর নৌকার সঙ্গে না থাকিলে, কেহ নৌকা আক্রমণ করিয়া শৈবলিনীর উদ্ধার করিবে। ইংরেজের নৌকা শুনিলে কেহ নিকটে আসিবে না। শৈবলিনীর নৌকা মুঙ্গেরে যাইতে বলিয়া গেলেন।

প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকাতলে প্রহত হইতে লাগিল। তোমরা অন্য শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্তকে যত পার বিশ্বাস করিও; কিন্তু প্রভাতবায়ুকে বিশ্বাস করিও না। প্রভাতবায়ু বড় মধুর;—চোরের মত পা টিপি টিপি আসিয়া, এখানে পদ্মটি, ওখানে যূথিকাদাম, সেখানে সুগন্ধি বকুলের শাখা লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করে—কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ অঙ্গগ্লানি হরণ করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। তুমি নৌকারোহী—দেখিতেছ এই ক্রীড়াশীল মধুরপ্রকৃতি প্রভাতবায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় নদীকে সুসজ্জিত করিতেছে; আকাশস্থ দুই একখানা অল্প কাল মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে, তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু মৃদু নাচাইতেছে, স্নানাবগাহননিরতা কামিনীগণের সঙ্গে একটু একটু মিষ্ট রহস্য করিতেছে—নৌকার তলে প্রবেশ করিয়া তোমার কাণের কাছে মধুর সঙ্গীত করিতেছে। তুমি মনে করিলে, বায়ু বড় ধীর প্রকৃতি,—বড় গম্ভীরস্বভাব, বড় আড়ম্বরশূন্য—আবার সদানন্দ! সংসারে যদি সকলেই এমন হয় ত কি না হয়! দে

নৌকা খুলিয়া দে! রৌদ্র উঠিল—তুমি দেখিলে যে বীচিরাজির উপরে রৌদ্র জ্বলিতেছে, সেগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় বড় হইয়াছে—রাজহংসগণ তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে; গাত্রমার্জ্জনে অন্যমনা সুন্দরীদিগের মৃৎকলসী তাহার উপর স্থির থাকিতেছে না, বড় নাচিতেছে; কখন কখন ঢেউগুলা স্পর্দ্ধা করিয়া সুন্দরীদিগের কাঁধে চড়িয়া বসিতেছে; আর যিনি তীরে উঠিয়াছেন, তাঁহার চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—মাথা কুটিতেছে—বুঝি বলিতেছে—"দেহি পদপল্লবমুদারং!" নিতান্ত পক্ষে পায়ের একটু অলক্ত-রাগ ধুইয়া লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কাণে মিলাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী রাগিণীতে কাণের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর বড় গর্জ্জন বাড়িল—বড় হুহুঙ্কারের ঘটা; তরঙ্গ সকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল—নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল—তুমি ভাব বুঝিয়া পবনদেবতাকে প্রণাম করিয়া, নৌকা তীরে রাখিলে।

শৈবলিনীর নৌকার দশা ঠিক এইরূপ ঘটিল। অল্প বেলা হইলেই বায়ু প্রবল হইল। বড় নৌকা, প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না। রক্ষকেরা ভদ্রহাটির ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙ্গাপেড়ে সাড়ীপরা—সাড়ীর রাঙ্গা দেওয়া আঁচল আছে—হাতে আলতার চুপড়ী। নাপিতানী নৌকার উপর অনেক কাল কাল দাড়ী দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়াছিল। দাড়ীর অধিকারিগণ অবাক্ হইয়া নাপিতানীকে দেখিতেছিল।

একটা চরে শৈবলিনীর পাক হইতেছিল—এখনও হিন্দুয়ানি আছে—একজন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল। একদিনে কিছু বিবি সাজা যায় না। ফস্টর জানিতেন যে, শৈবলিনী যদি না পালায়, অথবা প্রাণত্যাগ না করে, তবে সে অবশ্য একদিন টেবিলে বসিয়া যবনের কৃত পাক, উপাদেয় বলিয়া ভোজন করিবে। কিন্তু এখনই তাড়াতাড়ি কি? এখন তাড়াতাড়ি করিলে সকল দিক্ নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া ফস্টর ভৃত্যদিগের পরামর্শমতে শৈবলিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল, নিকটে একজন দাসী দাঁড়াইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল। নাপিতানী সেই দাসীর কাছে গেল, বলিল, "হাঁ গা—তোমরা কোথা থেকে আসচ গা?"

চাকরাণী রাগ করিল—বিশেষ সে ইংরেজের বেতন খায়—বলিল, "তোর তা কি রে মাগী! আমরা হিল্লী, দিল্লী, মক্কা থেকে আসচি।"

নাপিতানী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বলি তা নয়, বলি আমরা নাপিত—তোমাদের নৌকায় যদি মেয়ে ছেলে কেহ কামায় তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

চাকরাণী একটু নরম হইল। বলিল, "আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" এই বলিয়া সে শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল যে, তিনি আল্‌তা পরিবেন কি না। যে কারণেই হউক, শৈবলিনী অন্যমনা হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন, "আল্‌তা পরিব।" তখন

রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া, দাসী নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল। সে স্বয়ং পূর্ব্বমত পাকশালার নিকট নিযুক্ত রহিল।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া আর একটু ঘোম্‌টা টানিয়া দিল, এবং তাঁহার একটি চরণ লইয়া আল্‌তা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন, "নাপিতানী, তোমার বাড়ী কোথা?"

নাপিতানী কথা কহিল না। শৈবলিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাপিতানী, তোমার নাম কি?"

তথাপি উত্তর পাইলেন না।

"নাপিতানী, তুমি কাঁদচ?"

নাপিতানী মৃদু স্বরে বলিল, "না।"

"হ্যাঁ, কাঁদচ।" বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। নাপিতানী বাস্তবিক কাঁদিতেছিল। অবগুণ্ঠন মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল।

শৈবলিনী বলিলেন, "আমি আসাতে মাত্র চিনেছি। আমার কাছে ঘোম্‌টা। মরণ আর কি? তা এখানে এলি কোথা হতে?"

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী ঠাকুরঝি। সুন্দরী চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, "শীঘ্র যাও! আমার এই সাড়ী পর, ছাড়িয়া দিতেছি। এই আল্‌তার চুপড়ী নাও। ঘোম্‌টা দিয়া নৌকা হইতে চলিয়া যাও।

শৈবলিনী বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এলে কেমন করে?"

সু। কোথা হইতে আসিলাম—কেমন করিয়া আসিলাম—সে পরিচয়, দিন পাই ত এর পর দিব। তোমার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। লোকে বলিল, পাল্কী গঙ্গার পথে গিয়াছে। আমিও প্রাতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া, হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। লোকে বলিল, বজরা উত্তরমুখে গিয়াছে। অনেক দূরে, পা ব্যথা হইয়া গেল। তখন নৌকা ভাড়া করিয়া তোমার পাছে পাছে আসিয়াছি। তোমার বড় নৌকা—চলে না, আমার ছোট নৌকা, তাই শীঘ্র আসিয়া ধরিয়াছি।

শৈ। একলা এলি কেমন করে?

সুন্দরীর মুখে আসিল, "তুই কালামুখী সাহেবের পাল্কী চড়ে এলি কেমন করে?" কিন্তু অসময় বুঝিয়া সে কথা বলিল না। বলিল, "একেলা আসি নাই। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গী একটু দূরে রাখিয়া, আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি।"

শৈ। তার পর?

সু। তার পর তুমি আমাব এই সাড়ী পর, এই আল্‌তার চুপড়ী নাও, ঘোম্‌টা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া চলিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না। তীরে তীরে যাইবে। ডিঙ্গীতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না—ডিঙ্গীতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই ডিঙ্গী খুলিয়া দিয়া তোমাব বাড়ী লইয়া যাইবেন।

শৈবলিনী অনেকক্ষণ চিন্তা কবিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর তোমার দশা?"

সু। আমার জন্যে ভাবিও না। বাঙ্গালায় এমন ইংরেজ আসে নাই, সুন্দরী বামনীকে নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী; আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ্ নাই। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রি মধ্যে বাড়ী যাইব। বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা। তুমি আর বিলম্ব করিও না—তোমার নন্দাইয়ের এখনও আহার হয় নাই। আজ হবে কিনা, তাও বলিতে পারি না।

শৈ। ভাল, আমি যেন গেলেম। গেলে, সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি?

সু। ইস্—লো। কেন নেবেন না? না নেওয়াটা প'ড়ে রয়েছে আর কি?

শৈ। দেখ, ইংরেজ আমায় কেড়ে এনেছে—আর কি আমার জাতি আছে?

সুন্দরী বিস্মিতা হইয়া শৈবলিনীর মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রতি মর্ম্মভেদী তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল—ওষধিস্পৃষ্ট বিষধরের ন্যায় গর্ব্বিতা শৈবলিনী মুখ নত করিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ পরুষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কথা বলিবি?"

শৈ। বলিব।

সু। এই গঙ্গার উপর?

শৈ। বলিব। তোমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অমনি বলিতেছি। সাহেবের সঙ্গে আমার এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইবেন না।

সু। তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিও না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, অধর্ম্ম করিবেন না, তবে আর মিছা কথায় সময় নষ্ট করিও না।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল। একটু কাঁদিল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "আমি যাইব—আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি তখন ঘুচিবে?"

সুন্দরী কোন উত্তর করিল না। শৈবলিনী বলিতে লাগিল, "ইহার পর পাড়ার ছোট মেয়েগুলো আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে কি না যে, ঐ উহাকে ইংরেজে লইয়া গিয়াছিল? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখন কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন্ সুব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিবে? আমি যে স্বধর্ম্মে আছি, এখন ফিরিয়া গেলে, কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? আমি ঘরে ফিরিয়া গিয়া কি প্রকারে মুখ দেখাইব?"

সুন্দরী বলিল, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—সে ত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।"

শৈ। কি সুখে? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু,—

সু। কেন, স্বামী? এ নারীজন্ম আর কাহার জন্য?

শৈ। সব ত জান—

সু। জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্ল্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কি না, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কি

না, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া, রাঙ্‌তা দিয়া সাজান নাই—মানুষ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁকে তোমার মনে ধরিবে কেন? অন্ধের অধিক অন্ধ, তুমি তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্ল্লভ—অনেক পুণ্য-ফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে। তা যাক্, সে কথা দূর হৌক্—এখনকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণসেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? আমার রাগ হইতেছে।

শৈ। দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি।—নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব—নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন মুঙ্গের যাইতেছি। যাই, দেখি মুঙ্গের কেমন। দেখি, রাজধানীতে ভিক্ষা মিলে কি না। মরিতে হয়, না হয় মরিব।—মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না। মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও! তুমি যাও।

তখন সুন্দরী আর কিছু বলিল না। রোদন সম্বরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল, বলিল, "ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে! দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়! মুঙ্গেরে যাইবার পূর্ব্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়। ঝড়ে হোক্, তুফানে হোক্, নৌকা ডুবিয়া হোক্, মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।"

এই বলিয়া, সুন্দরী নৌকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, আল্‌তার চুপড়ী জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন। দেখিয়া রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।"

রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি যাইত, তবে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইত। বিশেষ, জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।"

রাজপুরুষ বলিলেন, "অথবা রাজার অপ্রিয় সম্বাদ বুদ্ধিমান্ লোকে প্রকাশ করে না। যাহাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেইরূপ রাজসমীপে নিবেদন করিব।"

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রাজকর্ম্মচারী তাঁহার পাথেয় দিতে সাহস করিলেন না। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।—কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু। আপনাপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, বিদেশ হইতে আগমনকালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয়

কেন? আমি কি এত দিন আহার-নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখে সুখী হইব? এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহ-বন্ধে পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এই জন্য আমার এ আহ্লাদ? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য—কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ। আমার যে তন্মী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্লকমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইতেছে না কেন? আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজাল জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব। কতক্ষণে আবার শৈবলিনীকে দেখিব?

অকস্মাৎ চন্দ্রশেখরের মনে অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল। যদি বাড়ী গিয়া শৈবলিনীকে না দেখিতে পাই? কেন দেখিতে পাইব না? যদি পীড়া হইয়া থাকে? পীড়া ত সকলেরই হয়—আরাম হইবে। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, পীড়ার কথা মনে হওয়াতে এত অসুখ হইতেছে কেন? কাহার না পীড়া হয়। তবে যদি কোন কঠিন পীড়া হইয়া থাকে? চন্দ্রশেখর দ্রুত চলিলেন। যদি পীড়া হইয়া থাকে, ঈশ্বর শৈবলিনীকে আরাম করিবেন, স্বস্ত্যয়ন করিব। যদি পীড়া ভাল না হয়! চন্দ্রশেখরের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, ভগবান্, আমায় এ বয়সে এ রত্ন দিয়া আবার বঞ্চিত করিবেন! তাহারই বা বিচিত্র কি—আমি কি তাঁহার এতই অনুগৃহীত যে, তিনি আমার কপালে সুখ বই দুঃখ বিধান করিবেন না? হয়ত ঘোরতর দুঃখ আমার কপালে আছে। যদি গিয়া দেখি, শৈবলিনী নাই?—যদি গিয়া শুনি যে, শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। চন্দ্রশেখর অতি দ্রুতপদে চলিলেন। পল্লীমধ্যে পঁহুছিয়া দেখিলেন, প্রতিবাসীরা তাঁহার মুখপ্রতি অতি-গম্ভীরভাবে চাহিয়া দেখিতেছে—চন্দ্রশেখর সে চাহনীর অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চুপি চুপি হাসিল। কেহ কেহ দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। প্রাচীনেরা তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—ভীত হইলেন—অন্যমনা হইলেন—কোন দিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে ভৃত্য বহির্ব্বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া, ভৃত্য কাঁদিয়া উঠিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন, উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই,—চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা। স্থানে স্থানে পোড়া মশাল—স্থানে স্থানে কবাট ভাঙ্গা। চন্দ্রশেখর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সকল ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। দেখিলেন, পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন, সে বাটীর বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন চন্দ্রশেখর, প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

কেহ উত্তর দিল না; চন্দ্রশেখরের বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়া রোরুদ্যমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল।

চন্দ্রশেখর আবার ডাকিলেন। গৃহমধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—কেহ উত্তর দিল না।

ততক্ষণে শৈবলিনীর চিত্রিত তরণীর উপর গঙ্গাম্বুসঞ্চারী মৃদু-পবন-হিল্লোলে, ইংরেজের লাল নিশান উড়িতেছিল—মাঝিরা সারি গায়িতেছিল।

চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।

তখন, চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম-শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া, তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্, একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া, ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড

পাপ

প্রথম পরিচ্ছেদ : কুল্‌সম্

"না, চিড়িয়া নাচিবে না, তুই এখন তোর গল্প বল্।"

দলনী বেগম, এই বলিয়া, যে ময়ুরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিল। আপনার হস্তের হীরকজড়িত বলয় খুলিয়া আর একটা ময়ূরের গলায় পরাইয়া দিল; একটা মুখর কাকাতুয়ার মুখে চোখে গোলাবের পিচকারী দিল। কাকাতুয়া "বাঁদী" বলিয়া গালি দিল। এ গালি দলনী স্বয়ং কাকাতুয়াকে শিখাইয়াছিল।

নিকটে এক জন পরিচারিকা পক্ষীদিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল, "এখন তোর গল্প বল্।"

কুল্‌সম্ কহিল, "গল্প আর কি? হাতিয়ার বোঝাই দুইখানা কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাতে এক জন ইংরেজ চড়ন্দার, সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলি ইব্রাহিম খাঁ বলেন

যে, 'নৌকা ছাড়িয়া দাও, উহা আটক করিলেই খামকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে।' গুর্‌গণ খাঁ বলেন, "লড়াই বাধে বাধুক। নৌকা ছাড়িব না'।"

দ। হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে?

কু। আজিমবাদের* কুঠিতে যাইতেছে। লড়াই বাধে ত আগে সেইখানে বাধিবে। সেখান হইতে ইংরেজেরা হঠাৎ বেদখল না হয় বলিয়া সেথা হাতিয়ার পাঠাইতেছে। এই কথা ত কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র।

দ। তা গুর্‌গণ খাঁ আটক করিতে চাহে কেন?

কু। বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে। আলি ইব্রাহিম খাঁ বলেন যে, আমরা যাহাই করি না কেন, ইংরেজকে লড়াইয়ে কখন জিতিতে পারিব না। অতএব আমাদের লড়াই না করাই স্থির। তবে নৌকা আটক করিয়া কেন লড়াই বাধাই? ফলে সে সত্য কথা। ইংরেজের হাতে রক্ষা নাই। বুঝি নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাণ্ড আবার ঘটে।

দলনী অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিল।

পরে কহিল, "কুল্‌সম্‌, তুই একটি দুঃসাহসের কাজ করতে পারিস্‌?"

কু। কি? ইলিস মাছ খেতে হবেস না ঠাণ্ডা জলে নাইতে হবে?

দ। দূর! তামাসা নহে। টের পেলে পর আলিজা তোকে আমাকে হাতীর দুই পায়ের তলে ফেলে দিবেন।

কু। টের পেলে ত? এত আতর গোলাব সোণা রূপা চুরি ক.রিলাম, কই কেহ ত টের পেলে না! আমার মনে বোধ হয়, পুরুষ মানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভার্থ—তাহাতে দেখিতে পায় না। কৈ, পুরুষে মেয়েমানুষের চাতুরী কখন টের পাইল, এমন ত দেখিলাম না।

দ। দূর। আমি খোজা-খান্‌সামাদের কথা বলি না। নবাব আলিজা অন্য পুরুষের মত নহেন। তিনি না জানিতে পারেন কি?

কু। আমি না লুকাইতে পারি কি? কি করিতে হইবে?

দ। একবার গুরগণ খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে।

কুল্‌সম্‌ বিস্ময়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিস্‌?"

কু। পত্র কে দিবে?

দ। আমি।

কু। সে কি? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

দ। প্রায়।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া ময়ূর দুইটা আপন আপন বাসযষ্টিতে আরোহণ করিল। কাকাতুয়া অনর্থক চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্যান্য পক্ষীরা আহারে মন দিল।

---

*পাটনা

কিছুক্ষণ পরে কুল্‌সম্ বলিল, "কাজ অতি সামান্য। এক জন খোজাকে কিছু দিলেই সে এখনই পত্র দিযা আসিবে। কিন্তু এ কাজ বড় শক্ত। নবাব জানিতে পাবিলে উভয়ে মবিব। যা হোক্, তোমার কর্ম্ম তুমিই জান। আমি দাসী। পত্র দাও—আর কিছু নগদ দাও।"

পরে কুল্‌সম্ পত্র লইয়া গেল। এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীব অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গুর্‌গণ খাঁ

যাহাব কাছে দলনীর পত্র গেল, তাঁহার নাম গুর্‌গণ খাঁ।

এই সময় বাঙ্গালায় যে সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুর্‌গণ খাঁ একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আর্‌মণি; ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান, কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বে বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনা। সৃষ্টি করেন। ইউবোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল, তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাসেমের এমত ভবসা ছিল যে, তিনি গুর্‌গণ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পবাভূত করিতে পারিবেন। গুর্‌গণ খাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল; তাঁহার পরমার্শ ব্যতীত মীরকাসেম কোন কর্ম্ম করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীরকাসেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুর্‌গণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুর্‌গণ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী দীপলোকে কতকগুলি পত্র পড়িতেছিলেন। সেগুলি কলিকাতাস্থ কয়েকজন আর্‌মাণির পত্র। পত্র পাঠ করিয়া, গুর্‌গণ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপ্‌দার আসিয়া দাঁড়াইল, গুর্‌গণ খাঁ কহিলেন, "সব দ্বার খোলা আছে?"

চোপ্‌দার কহিল, "আছে।"

গুর্। যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে বাধা দিবে না—বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে? এ কথা বুঝাইয়া দিয়াছ?

চোপ্‌দার কহিল, "হুকুম তামিল হইয়াছে?"

গুর্। আচ্ছা, তুমি তফাতে থাক।

তখন গুর্‌গণ খাঁ পত্রাদি বাঁধিয়া উপযুক্ত স্থানে লুক্কায়িত করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখন কোন্ পথে যাই? এই ভারতবর্ষ এখন সমুদ্রবিশেষ— যে যত ডুব দিতে পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গণিলে কি হইবে? দেখ, আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষ অস্থির। আমিই বাঙ্গালার কর্তা।

আমি বাঙ্গালার কর্তা? কে কর্তা? কর্তা ইংরেজ ব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীরকাসেম; আমি মীরকাসেমের গোলাপ—আমি কর্ত্তার গোলামের গোলাম; বড় উচ্চপদ! আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা না হই কেন? কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে? ইংরেজ! একবার পেলে হয়। কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে, আমি কর্ত্তা হইতে পারিব না। আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি---মীরকাসেমকে গ্রাহ্য করি না।—যে দিন মনে করিব, সেই দিন উহাকে মস্‌নদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব। সে কেবল আমার উচ্চপদে আরোহণের সোপান—এখন ছাদে উঠিয়াছি—মই ফেলিয়া দিতে পারি। কন্টক কেবল পাপ ইংরেজ। তাহারা আমাকে হস্তগত করিতে চাহে—আমি তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চাহি। তাহারা হস্তগত হইবে না। অতএব আমি তাহাদের তাড়াইব। এখন মীরকাসেম মস্‌নদে থাক; তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীরকাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ। কিন্তু আজি হঠাৎ এ পত্র পাইলাম কেন? এ বালিকা এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইল কেন?"

বলিতে বলিতে যাহার কথা ভাবিতেছিলেন, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গুরগণ খাঁ তাহাকে পৃথক্ আসনে বসাইলেন। সে দলনী বেগম।

গুর্‌গণ খাঁ বলিলেন, "আজি অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা অবধি আর তোমাকে দেখি নাই। কিন্তু তুমি এ দুঃসাহসিক কর্ম্ম কেন করিলে?"

দলনী বলিল, "দুঃসাহসিক কিসে?"

গুরগণ খাঁ কহিল, তুমি নবাবের বেগম হইয়া রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা নবাব জানিতে পারিবে তোমাকে আমাকে দুই জনকেই বধ করিবেন।"

দ। যদি তিনি জানিতেই পারেন, তখন আপনাতে আমাতে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশ করিব। তাহা হইলে রাগ করিবাব আর কোন কারণ থাকিবে না।

গুর্। তুমি বালিকা, তাই এমত ভরসা করিতেছ! এত দিন আমরা এ সম্বন্ধ প্রকাশ করি নাই। তুমি যে আমাকে চেন, বা আমি যে তোমাকে চিনি, এ কথা এ পর্য্যন্ত আমরা কেহই প্রকাশ করি নাই—এখন বিপদে পড়িয়া প্রকাশ করিলে কে বিশ্বাস করিবে? বলিবে, এ কেবল বাঁচিবার উপায়। তুমি আসিয়া ভাল কর নাই।

দ। নবাব জানিবার সম্ভাবনা কি? পাহারাওয়ালা সকল আপনার আজ্ঞাকারী—আপনার প্রদত্ত নিদর্শন দেখিয়া তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে এ কথা কি সত্য?

গুর্। এ কথা কি তুমি দুর্গে বসিয়া শুনিতে পাও না?

দ। পাই। কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র যে, ইংরেজের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ উপস্থিত। এবং আপনিই এ যুদ্ধ উপস্থিত কবিয়াছেন। কেন?

গুর্। তুমি বালিকা, তাহা কি প্রকারে বুঝিবে?

দ। আমি বালিকার মত কথা কহিতেছি? না, বালিকাব ন্যায় কাজ করিয়া থাকি? আমাকে যেখানে আত্মসহায়স্বরূপ নবাবের অন্তঃপুবে স্থাপন কবিযাছেন, সেখানে বালিকা বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে?

গুর। হউক। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমাব আমাব ক্ষতি কি? হয, হউক না।

দ। আপনারা কি জয়ী হইতে পারিবেন?

গুর্। আমাদের জয়েরই সম্ভাবনা।

দ। এ পর্য্যন্ত ইংরেজকে কে জিতিয়াছে?

গুর্। ইংরেজরা কয় জন গুর্‌গণ খাঁব সঙ্গে যুদ্ধ কবিযাছে?

দ। সেরাজউদ্দৌলা তাহাই মনে করিযাছেন। যাক্—আমি স্ত্রীলোক, আমার মন যাহা বুঝে, আমি তাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হইতেছে যে, কোন মতেই আমরা ইংবেজদের সঙ্গে যুদ্ধ কবিয়া জয়ী হইব না। এ যুদ্ধে আমাদেব সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবেন না।

গুর্। এ সকল কর্ম্মে স্ত্রীলোকের পরামর্শ অগ্রাহ্য।

দ। "আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে হইবে। আমায় আপনি বক্ষা করুন। আমি চাবি দিক অন্ধকার দেখিতেছি।" বলিয়া, দলনী রোদন করিতে লাগিল।

গুর্‌গণ খাঁ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীরকাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইযা যাইব।"

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছে যে, মীরকাসেম আমার স্বামী?"

গুর্‌গণ খাঁ কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইযা বলিলেন, "না, বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পাবে। আমার ভরসা আছে, তুমি এক দিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নূরজাহান হইবে।"

দলনী ক্রোধে কম্পিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া উঠিল। গলদশ্রু নিরুদ্ধ কবিযা, লোচনযুগল বিস্ফারিত করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল,—"তুমি নিপাত যাও। অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইযা জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমাব সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম আছে, তাহা তুমি জান না। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই; নহিলে আজি হইতে তোমাব সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই কেন? আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রুসম্বন্ধ। আমি জানিব যে, তুমিই আমার পরম শত্রু। তুমিও জানিও, আমি তোমার পরম শত্রু। এই রাজান্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

দলনী বাহির হইলে গুব্‌গণ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে, দলনী আব এক্ষণে তাঁহাব নহে, সে মীবকাসেমের হইযাছে। ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে স্নেহ কবিলে করিতে পাবে, কিন্তু সে মীরকাসেমেব প্রতি অধিকতব স্নেহবতী। ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী বলিযা

যখন বুঝিয়াছে বা বুঝিবে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে। অতএব আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে। গুর্‌গণ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন।

একজন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুর্‌গণ খাঁ তাহার দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে না দেয়।

অশ্বারোহণে দূত আগে দুর্গদ্বারে পৌঁছিল, দলনী যথাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শুনিয়া দলনী ক্রমে ক্রমে, ছিন্নবল্লীবৎ, ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন, "ভাই, আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না?"

কুল্‌সম্ বলিল, "ফিরিয়া সেনাপতির গৃহে চল।"

দলনী বলিল, "তুমি যাও। গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে আমাব স্থান হইবে।"

সেই অন্ধকার রাত্রে, রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপরে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈষৎ পবন হিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্রসকল মর্ম্মরিত হইতেছিল। দলনী কাঁদিয়া বলিল, "কুল্‌সম্!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দলনীর কি হইল?

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী, রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুল্‌সম্ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবেন?"

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আইস, এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই, প্রভাত হউক।"

কু। এখানে প্রভাত হইলে আমরা ধরা পড়িব।

দ। তাহাতে ভয় কি? আমি কোন্ দুষ্কর্ম করিয়াছি যে, আমি ভয় করিব?

কু। আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি, তা তুমিই জান। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, নবাবই বা কি মনে করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখ।

দ। যাহাই মনে করুন, ঈশ্বর আমার বিচারকর্ত্তা—আমি অন্য বিচার মানি না। না হয় মরিব, ক্ষতি কি?

কু। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে?

দ। এখানে দাঁড়াইয়া ধরা পড়িব—সেই উদ্দেশ্যেই এখানে দাঁড়াইব। ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত করিবে, সে আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?

কু। দরবারে।

দ। প্রভুর কাছে? আমি সেইখানেই যাইতে চাই। অন্যত্র আমার যাইবার স্থান নাই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরিবার কালে তাঁহাকে বলিতে পাইব যে, আমি নিরপরাধিনী। বরং চল, আমরা দুর্গদ্বারে গিয়া বসিয়া থাকি—সেইখানে শীঘ্র ধরা পড়িব।

এই সময়ে উভয়ে সভয়ে দেখিল, অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার পুরুষমূর্ত্তি গঙ্গা তীরাভিমুখে যাইতেছে। তাহারা বৃক্ষতলস্থ অন্ধকারমধ্যে গিয়া লুকাইল। পুনশ্চ সভয়ে দেখিল, দীর্ঘাকার

পুরুষ, গঙ্গার পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই আশ্রয়বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল। দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটি আরও অন্ধকার মধ্যে লুকাইল।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানে আসিল। বলিল, "এখানে তোমরা কে?" এই কথা বলিয়া, সে যেন আপনা আপনি, মৃদুতর স্বরে বলিল, "আমার মত পথে পথে নিশা জাগরণ করে, এমন হতভাগা কে আছে?"

দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া, স্ত্রীলোকদিগের ভয় জন্মিয়াছিল, কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর হইল। কণ্ঠ অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। কুল্‌সম্ বলিল, "আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে?" পুরুষ কহিলেন, "আমরা? তোমরা কয় জন?"

কু। আমরা দুই জন মাত্র।

পু। এ রাত্রে এখানে কি করিতেছ?

তখন দলনী বলিল, "আমরা হতভাগিনী—আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার কি হইবে?"

শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন, অতি সামান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লোকের উপকার হইয়া থাকে, তোমরা যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাক— সাধ্যানুসারে আমি তোমাদের উপকার করিব।"

দ। আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য—আপনি কে?

আগন্তুক কহিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি— দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। ব্রহ্মচারী।"

দ। আপনি যেই হউন, আপনার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে ডুবিয়া মরিতেছে, সে অবলম্বনের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না। কিন্তু যদি আমাদিগের বিপদ্ শুনিতে চান, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে বলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বলিবার নহে।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া তিনি দলনী ও কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে করাঘাত করিয়া 'রামচরণ' বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে আলো জ্বালিতে আজ্ঞা করিলেন।

রামচরণ প্রদীপ জ্বালিয়া, ব্রহ্মচারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী তখন রামচরণকে বলিলেন, তুমি গিয়া শয়ন কর।" শুনিয়া রামচরণ একবার দলনী ও কুল্‌সমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, রামচরণ সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিল না। ঠাকুরজী, এত রাতে দুই জন যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া আসিলেন কেন?—এই ভাবনা তাহার প্রবল হইল। ব্রহ্মচারীকে রামচরণ দেবতা মনে করিত —তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়াই জানিত— সে বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইল না। শেষে রামচরণ সিদ্ধান্ত করিল, "বোধ হয়, এই দুই জন স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন—কি জ্বালা, এ কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না।"

ব্রহ্মচারী একটা আসনে উপবেশন করিলেন - -স্ত্রীলোকেরা ভূম্যাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিলেন। পরে দলনী রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া ব্রহ্মচারী মনে মনে ভাবিলেন, "ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার

তাহা অবশ্যই ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।"

হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পুড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না। ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, "আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে, পত্রের দ্বারা তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করুন। যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন। পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইলে সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।"

দ। পত্র লইয়া যাইবে কে?

ব্র। আমি পাঠাইয়া দিব।

তখন দলনী কাগজ কলম চাহিলেন। ব্রহ্মচারী রামচরণকে আবার উঠাইলেন। রামচরণ কাগজ কলম ইত্যাদি আনিয়া রাখিয়া গেল। দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী ততক্ষণ বলিতে লাগিলেন, "এ গৃহ আমার নহে; কিন্তু যতক্ষণ না রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ এইখানেই থাকুন—কেহ জানিতে পারিবে না, বা কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।"

অগত্যা স্ত্রীলোকেরা তাহা স্বীকার করিল। লিপি সমাপ্ত হইলে, দলনী তাহা ব্রহ্মচারীর হস্তে দিলেন। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থিতি বিষয়ে রামচরণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া ব্রহ্মচারী লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন।

মুঙ্গেরের যে সকল রাজকর্ম্মচারী হিন্দু, ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহাকে চিনিত। সুতরাং, সকল কর্ম্মচারীই তাঁহাকে মানিত।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায়, ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মচারী সূর্য্যোদয়ের পর মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "আমার নাম করিও না; এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও।" মুন্সী বলিলেন, "আপনি উত্তরের জন্য কাল আসিবেন।" কাহার পত্র, তাহা মুন্সী কিছুই জানিলেন না। ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার, পূর্ব্ববর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "কল্য উত্তর আসিবে। কোন প্রকারে অদ্য কাল যাপন কর।"

রামচরণ প্রভাতে আসিয়া দেখিল, সহমরণের কোন উদ্যোগ নাই।

এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল। তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ প্রতাপ

সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত পথ স্বামীর নিকটে শৈবলিনীকে গালি দিতে দিতে আসিয়াছিল। কখনও "অভাগী", কখন "পোড়ারমুখী", কখন "চুলোমুখী" ইত্যাদি প্রিয় সম্বোধনে শৈবলিনীকে অভিহিত করিয়া

স্বামীর কৌতুক বর্দ্ধন করিতে করিতে আসিয়াছিল। ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল। তার পর চন্দ্রশেখর আসিয়া দেশত্যাগী হইয়া গেলেন। তাব পব কিছু দিন অমনি অমনি গেল। শৈবলিনীর বা চন্দ্রশেখরের কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। তখন সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া গহনা পরিতে বসিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুন্দবী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসি-কন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতিশালী নহেন। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন। তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখন কখন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন। শৈবলিনীর বিপদ্‌কালে যে শ্রীনাথ বেদগ্রামে ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরীই বাড়ীর গৃহিণী। তাঁহার মাতা রুগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য। সুন্দরীব আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল; তাহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত।

সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া অলঙ্কার সন্নিবেশপূর্ব্বক পিতাকে বলিল, "আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব—তাহার বিষয়ে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি।" সুন্দরীর পিতা কৃষ্ণকমল চক্রবর্ত্তী কন্যার বশীভূত, একটু আধটু আপত্তি করিয়া সম্মত হইলেন। সুন্দরী, রূপসীর শ্বশুরালয়ে গেলেন—শ্রীনাথ স্বগৃহে গেলেন।

রূপসীর স্বামী কে? সেই প্রতাপ! শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসিপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়ঃস্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে। চন্দ্রশেখর, কাসেম আলি খাঁর শিক্ষাদাতা; তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন। চন্দ্রশেখর, নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিযা দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমীদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা—এবং দেশবিখ্যাত নাম। সুন্দরীর শিবিকা তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। রূপসী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া, সাদরে গৃহে লইয়া গেল। প্রতাপ আসিয়া শ্যালীকে রহস্যসম্ভাষণ করিলেন।

পরে অবকাশমতে প্রতাপ, সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুন্দরী বলিলেন, "আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি, বলি শুন।"

এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীব নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া, প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া, প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, "এত দিন আমাকে এ কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন?"

সু। কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে?

প্র। কি হইবে? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করিব না। আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।

সু। তুমি উপকার করিবে কি না, তা জানিব কি প্রকারে?

প্র। কেন, তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?

সু। জানি। কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড়মানুষ হইলে পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যায়।

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া, অধীর এবং বাক্যশূন্য হইয়া উঠিয়া গেলেন। রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল।

পরদিন প্রতাপ এক পাচক ও এক ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

যে গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুঙ্গেরে সেই প্রতাপের বাসা।

সুন্দরী কিছু দিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া শৈবলিনীকে গালি দিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সুন্দরী, রূপসীর নিকট প্রমাণ করিতে বসিত যে, শৈবলিনীর তুল্য পাপিষ্ঠা, হতভাগিনী আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। এক দিন রূপসী বলিল, "তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছ কেন?"

সুন্দরী বলিল, "তাঁর মুণ্ডপাত করিব ব'লে—তাঁকে যমের বাড়ী পাঠাব ব'লে—তাঁর মুখে আগুন দিব ব'লে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রূপসী বলিল, "দিদি, তুই বড় কুঁদুলী!"

সুন্দরী উত্তর করিল, "সেই ত আমায় কুঁদুলী করেছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ গঙ্গাতীরে

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক। সেই জন্য এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস্ সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিয়ট্ সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিস্‌কে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব একজন চতুর কর্ম্মচারীকে তথায় পাঠান আবশ্যক হইল। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এই সকল কার্য্যের জন্য গভর্নর বান্সিসার্ট ফস্টরকে পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন, এবং আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাটনা যাইবেন। সুতরাং ফস্টরকে কলিকাতায় আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি এ সকল বৃত্তান্তের সম্বাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এজন্য শৈবলিনীকে অগ্রেই মুঙ্গের পাঠাইয়াছিলেন। ফস্টর পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন।

ফস্টর অস্ত্রের নৌকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুঙ্গের আসিয়া তীরে নৌকা বাঁধিলেন। আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইলেন, কিন্তু এমত সময়ে গুরগণ খাঁ নৌকা আটক করিলেন। তখন আমিয়টের সঙ্গে নবাবের বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। অদ্য আমিয়টের সঙ্গে ফস্টরের এই কথা স্থির হইল যে, যদি নবাব নৌকা ছাড়িয়া দেন ভালই; নচেৎ কাল প্রাতে ফস্টর অস্ত্রের নৌকা ফেলিয়া পাটনায় চলিয়া যাইবেন।

ফস্টরের দুইখানি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। একখানি দেশী ভড়—আকারে বড় বৃহৎ—আর একখানি বজরা। ভড়ের উপর কয়েক জন নবাবের সিপাহী পাহারা দিতেছে। তীরেও কয়েক জন সিপাহী। এইখানিতে অস্ত্র বোঝাই—একখানি গুর্‌গণ খাঁ আটক করিতে চাহেন।

বজরাখানিতে অস্ত্র বোঝাই নহে। সেখানি ভড় হইতে হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই। ছাদের উপর একজন 'তেলিঙ্গা' নামক ইংরেজদিগের সিপাহী বসিয়া নৌকা রক্ষণ করিতেছিল।

রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। অন্ধকার রাত্র, কিন্তু পরিষ্কার। বজরার পাহারাওয়ালারা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, একবার ঢুলিতেছে। তীরে একটা কসাড় বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি কাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকাবী স্বয়ং প্রতাপ রায়।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, প্রহরী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায় আসিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন। প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুম্‌দার?" প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফস্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়া ছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া, বজরার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, একজন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমত সময়ে কসাড় বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। বজরার প্রহরী গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ তখন যেখানে নৌকার অন্ধকারে ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন।

বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র, ভড়ের সিপাহীরা "কিয়া হৈ রে?" বলিয়া গোলযোগ করিয়া উঠিল। নৌকার অপরাপর লোক জাগরিত হইল। ফস্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

লরেন্স ফস্টর বাহিরে আসিয়া চারি দিক্ ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার "তেলিঙ্গা" প্রহরী অন্তর্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, তাহার মৃতদেহ ভাসিতেছে। প্রথমে মনে করিলেন, নবাবের সিপাহীরা মারিয়াছে—কিন্তু তখনই কসাড় বনের দিকে অল্প ধূমরেখা দেখিলেন। আরও দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গের দ্বিতীয় নৌকার লোক সকল বৃত্তান্ত কি জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; নগরমধ্যে আলো জ্বলিতেছে—গঙ্গাকূলে শত শত বৃহত্তরণী শ্রেণী, অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—কল কল রবে অনন্ত প্রবাহিণী গঙ্গা ধাবিতা হইতেছেন। সেই স্রোতে প্রহরীর শব ভাসিয়া যাইতেছে। পলকমধ্যে ফস্টর এই সকল দেখিলেন।

কসাড় বনের উপর ঈষত্তরল ধূমরেখা দেখিয়া, ফস্টর স্বহস্তস্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া সেই বনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ফস্টর বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বনান্তরালে লুক্কায়িত শত্রু আছে। ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, যে শত্রু অদৃশ্য থাকিয়া প্রহরীকে নিপাত করিয়াছিল, সে এখনই তাঁহাকেও নিপাত করিতে পাবে। কিন্তু তিনি পলাসীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; দেশী লোকে যে ইংরেজকে লক্ষ্য করিবে, এ কথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। বিশেষ ইংরেজ হইয়া যে দেশী শত্রুকে ভয় করিবে—তাহার মৃত্যু ভাল। এই ভাবিয়া তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া বন্দুক উত্তোলন কবিয়াছিলেন—কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে কসাড়

বনের ভিতর অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল—আবার বন্দুকের শব্দ হইল—ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া, প্রহরীর ন্যায়, গঙ্গাস্রোতোমধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক সশব্দে নৌকার উপরেই পড়িল।

প্রতাপ সেই সময়ে, কটি হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া, বজরার বন্ধনরজ্জুসকল কাটিলেন। সেখানে জল অল্প, স্রোতঃ মন্দ বলিয়া নাবিকেরা নঙ্গর ফেলে নাই। ফেলিলেও লঘুহস্ত, বলবান্ প্রতাপের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত না। প্রতাপ এক লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।

এই ঘটনাগুলি বর্ণনায় যে সময় লাগিয়াছে, তাহার শতাংশ সময় মধ্যেই সে সকল সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রহরীর পতন, ফস্টরের বাহিরে আসা, তাঁহার পতন, এবং প্রতাপের নৌকারোহণ, এই সকলে যে সময় লাগিয়াছিল, ততক্ষণে দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজরার নিকটে আসিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারাও আসিল।

আসিয়া দেখিল, নৌকা প্রতাপের কৌশলে বাহির-জলে গিয়াছে। একজন সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিতে আসিল, প্রতাপ একটা লগি তুলিয়া তাহার মস্তকে মারিলেন। সে ফিরিয়া গেল। আর কেহ অগ্রসর হইল না। সেই লগিতে জলতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রতাপ আবার নৌকা ঠেলিলেন। নৌকা ঘুরিয়া গভীর স্রোতোমধ্যে পড়িয়া বেগে পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিল।

লগি হাতে প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর একজন "তেলিঙ্গা" সিপাহী নৌকার ছাদের উপর জানু পাতিয়া, বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। প্রতাপ লগি ফিরাইয়া সিপাহীর হাতের উপর মারিলেন; তাহার হাত অবশ হইল—বন্দুক পড়িয়া গেল। প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন। ফস্টরের হস্তচ্যুত বন্দুকও তুলিয়া লইলেন। তখন তিনি নৌকাস্থিত সকলকে বলিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবও আমাকে ভয় করেন। এই দুই বন্দুক আর লগির বাড়ী—বোধ-হয়, তোমাদের কয়জনকে একেলাই মারিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে কাহাকেও কিছু বলিব না। আমি হালে যাইতেছি, দাঁড়ীরা সকলে দাঁড় ধরুক। আর আর সকলে যেখানে যে আছ, সেইখানেই থাক। নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শঙ্কা নাই।"

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে এক একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড় ধরিল। প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন। কেহ আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল। ভড়ের উপর হইতে দুই একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল, কিন্তু কাহাকে লক্ষ্য করিতে হইবে, নক্ষত্রালোকে তাহা কিছু কেহ অবধারিত করিতে না পারাতে সে শব্দ তখনই নিবারিত হইল।

তখন ভড় হইতে জন কয়েক লোক বন্দুক লইয়া এক ডিঙ্গিতে উঠিয়া, বজরা ধরিতে আসিল। প্রতাপ প্রথমে কিছু বলিলেন না। তাহারা নিকটে আসিলে, দুইটি বন্দুকই তাহাদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। দুই জন লোক আহত হইল। অবশিষ্ট লোক ভীত হইয়া, ডিঙ্গী ফিরাইয়া পলায়ন করিল।

কসাড় বনে লুক্কায়িত রামচরণ, প্রতাপকে নিষ্কন্টক দেখিয়া এবং ভড়ের সিপাহীগণ কসাড়বন খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ বজ্রাঘাত

সেই নৈশ-গঙ্গাবিচারিণী তরণীমধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিল—শৈবলিনী।

বজরার মধ্যে দুইটি কামরা—একটিতে ফস্টর ছিলেন, আর একটিতে শৈবলিনী এবং তাহার দাসী। শৈবলিনী এখনও বিবি সাজে নাই—পরণে কালোপেড়ে সাড়ী, হাতে বালা, পায়ে মল—সঙ্গে সেই পুরন্দরপুরের দাসী পার্ব্বতী। শৈবলিনী নিদ্রিতা ছিল—শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল—সেই ভীমা পুষ্করিণীর চারি পাশে জলসংস্পর্শ প্রার্থিশাখাবাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত—শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া বহিয়াছে। সরোবরের প্রান্তে যেন এক সুবর্ণনির্ম্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটা শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী যেন উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু রাজহংস তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। শূকর শৈবলিনীপদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ফস্টরের মুখের মত। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে চায়, কিন্তু চরণ মৃণাল হইয়া জলতলে বদ্ধ হইয়াছে—তাহার গতিশক্তি রহিত। এদিকে শূকর বলিতেছে, "আমার কাছে আইস, আমি হাঁস ধরিয়া দিব।" প্রথম বন্দুকের শব্দে শৈবলিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জলে পড়িবার শব্দ শুনিল। অসম্পূর্ণ—ভগ্ন নিদ্রার আবেশে কিছুকাল বুঝিতে পারিল না। সেই রাজহংস—সেই শূকর মনে পড়িতে লাগিল। যখন আবার বন্দুকের শব্দ হইল, এবং বড় গণ্ডগোল হইয়া উঠিল, তখন তাহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরের কামরায় আসিয়া দ্বার হইতে একবার দেখিল—কিছু বুঝিতে পারিল না। আবার ভিতরে আসিল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল। পার্ব্বতীও উঠিয়াছিল। শৈবলিনী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

পা। কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে—সাহেবকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমাদেরই পাপের ফল।

শৈ। সাহেবকে মারিয়াছে, তাতে আমাদের পাপের ফল কি? সাহেবেরই পাপের ফল।

পা। ডাকাত পড়িয়াছে—বিপদ্ আমাদেরই।

শৈ। কি বিপদ্? এক ডাকাতের সঙ্গে ছিলাম, না হয় আর এক ডাকাতের সঙ্গে যাইব। যদি গোরা ডাকাতের হাত এড়াইয়া কালা ডাকাতের হাতে পড়ি, তবে মন্দ কি?

এই বলিয়া, শৈবলিনী ক্ষুদ্র মস্তক হইতে পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত বেণী আন্দোলিত করিয়া একটু হাসিয়া, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর গিয়া বসিল। পার্ব্বতী বলিল, "এ সময়ে তোমার হাসি আমার সহ্য হয় না।"

শৈবলিনী বলিল, "অসহ্য হয়, গঙ্গায় জল আছে, ডুবিয়া মর। আমার হাসির সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি হাসিব। একজন ডাকাতকে ডাকিয়া আন না, একটু জিজ্ঞাসা-পড়া করি।"

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিল, "ডাকিতে হইবে না; তাহারা আপনারাই আসিবে।"

কিন্তু চারি দণ্ডকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না। শৈবলিনী তখন দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমাদের কি কপাল! ডাকাতেরাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না।" পার্ব্বতী কাঁপিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া এক চরে লাগিল। নৌকা সেইখানে কিছুক্ষণ লাগিয়া রহিল। পরে তথায় কয়েক জন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজরায় উঠিয়া প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া সে কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। প্রথমে সে, পার্ব্বতীর মুখপ্রতি চাহিয়া শেষে শৈবলিনীকে দেখিল। শৈবলিনীকে বলিল, "আপনি নামুন।"

'শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে,—কোথায় যাইব?"

রামচরণ বলিল, "আমি আপনার চাকর। কোন চিন্তা নাই—আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।"

শৈবলিনী নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণের সঙ্গে আসিলেন। রামচরণের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামিলেন। পার্ব্বতী সঙ্গে যাইতেছিল—রামচরণ তাহাকে নিষেধ করিল। পার্ব্বতী ভয়ে নৌকার মধ্যেই রহিল। রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকামধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকারূঢ়া হইলেন। রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেল।

তখনও দলনী এবং কুল্‌সম্ সেই গৃহে বাস করিতেছিল। তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বলিয়া যেখানে তাহারা ছিল, সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না। উপরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, রামচরণ আলো জ্বালিয়া রাখিয়া শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী?" রামচরণ সে কথা কানে তুলিল না।

রামচরণ আপনার বুদ্ধি খরচ করিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল, প্রতাপের সেরূপ অনুমতি ছিল না। তিনি রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "পাল্কী জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাইও।" রামচরণ পথে ভাবিল—"এ রাত্রে জগৎশেঠের ফটক খোলা পাইব কিনা? দ্বারবানেরা প্রবেশ করিতে দিবে কি না? জিজ্ঞাসিলে কি পরিচয় দিব? পরিচয় দিয়া কি আমি খুনে বলিয়া ধরা পড়িব? সে সকলে কাজ নাই; এখন বাসায় যাওয়াই ভাল।" এই ভাবিয়া সে পাল্কী বাসায় আনিল।

এদিকে প্রতাপ, পাল্কী চলিয়া গেল দেখিয়া, নৌকা হইতে নামিলেন। পূর্ব্বেই সকলে তাঁহার হাতে বন্দুক দেখিয়া, নিস্তব্ধ হইয়াছিল—এখন তাঁহার লাঠিয়াল সহায় দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। প্রতাপ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আত্মগৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে, রামচরণ দ্বার মোচন করিল। রামচরণ যে তাহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "এখনও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাও। ডাকিয়া লইয়া আইস।"

রামচরণ আসিয়া দেখিল,—লোকে শুনিয়া বিস্মিত হইবে—শৈবলিনী নিদ্রা যাইতেছেন। এ অবস্থায় নিদ্রা সম্ভবে না। সম্ভবে কি না, তাহা আমি জানি না,—আমরা যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি লিখিতেছি। রামচবণ শৈবলিনীকে জাগরিতা না করিয়া প্রতাপের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি ঘুমাইতেছেন—ঘুম ভাঙ্গাইব কি?" শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত হইল—মনে মনে বলিল, চাণক্য পণ্ডিত লিখিতে ভুলিযাছেন; নিদ্রা স্ত্রীলোকের ষোল গুণ। প্রকাশ্যে বলিলেন, "এত পীড়াপীড়িতে প্রয়োজন নাই। তুমিও ঘুমাও—পরিশ্রমের একশেষ হইয়াছে। আমিও এখন একটু বিশ্রাম করিব।"

রামচরণ বিশ্রাম করিতে গেল। তখনও কিছু রাত্রি আছে। গৃহ—গৃহের বাহিরে নগরী—সর্ব্বত্র শব্দহীন, অন্ধকার। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। আপন শয়নকক্ষাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন—দেখিলেন, পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছে।

প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেত বারি বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল-শ্বেত-পদ্ম-রাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির শোভা দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিল না এমত নহে—কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহাব মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি-সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী নিদ্রা যায় নাই—চক্ষু মুদিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন। চক্ষু নিমীলিত দেখিয়া, রামচরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, শৈবলিনী নিদ্রিতা। গাঢ় চিন্তাবশতঃ প্রতাপের প্রথম প্রবেশের পদধ্বনি শৈবলিনী শুনিতে পান নাই। প্রতাপ বন্দুকটি হাতে করিয়া উপরে আসিয়াছিলেন। এখন বন্দুকটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। কিছু অন্যমনা হইয়াছিলেন—সাবধানে বন্দুকটি রাখা হয় নাই; বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এ কি এ? কে তুমি?"

এই বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। প্রতাপ জল আনিয়া তা মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন—সে মুখ শিশির-নিষিক্ত পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল, কেশগুচ্ছ সকল আর্দ্র করিয়া, কেশগুচ্ছ সকল ঋজু করিয়া, ঝরিতে লাগিল—কেশ, পদ্মাবলম্বী শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল।

অচিরাৎ শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। প্রতাপ দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিলেন, "কে তুমি? প্রতাপ? না, কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ।"

শৈ। একবার নৌকায় বোধ হইয়াছিল, যেন তোমার কণ্ঠ কানে প্রবেশ করিল। কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, সে ভ্রান্তি। আমি স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়াছিলাম, সেই কারণে ভ্রান্তি মনে করিলাম।

এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈবলিনী নীরব হইয়া রহিলেন। শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থিরা হইয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ বিনাবাক্যব্যয়ে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, "যাইও না।'

প্রতাপ অনিচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমার এই বাসা।"

শৈবলিনী বস্তুতঃ সুস্থিরা হন নাই। হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাঁহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি, আর একটু নীরব থাকিয়া, ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া পুনরপি বলিলেন, "আমাকে এখানে কে আনিল?"

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি আর আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম,—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?"

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীত ভাবে, প্রায় বাষ্পগদগদ হইয়া বলিলেন, 'যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।

প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তাও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই; কিন্তু তোমার মরণই ভাল।"

শৈবলিনী কাঁদিল। পরে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল,—"আমার মরাই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক—তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হতে?—তোমা হতে! কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।"

প্রতাপ বলিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ! ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোম্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা

উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফস্টর আমার কে?"

শুনিয়া, প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

সেই সময়ে বহির্দ্বারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌

রামচরণ নৌকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে, এবং প্রতাপ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা সিপাহী প্রতাপের আঘাতে অবসন্নহস্ত হইয়া ছাদের উপরে বসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে তটের উপর উঠিল। উঠিয়া যে পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে, সেই পথে চলিল। অতিদূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে জাতিতে মুসলমান। তাহার নাম বকাউল্লা খাঁ। ক্লাইবের সঙ্গে প্রথম যে সেনা বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাহারা মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া, ইংরেজদিগের দেশী সৈনিকগণকে তখন বাঙ্গালাতে তেলিঙ্গা বলিত; কিন্তু এক্ষণে অনেক হিন্দুস্থানী হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজসেনা-ভুক্ত হইয়াছিল। বকাউল্লার নিবাস, গাজিপুরের নিকট।

বকাউল্লা শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে থাকিয়া, প্রতাপের বাসা পর্য্যন্ত আসিল। দেখিল যে, শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তথায় আসিয়া দেখিল, কুঠিতে একটা বড় গোল পড়িয়া গিয়াছে। বজরার বৃত্তান্ত আমিয়ট সকল শুনিয়াছেন। শুনিল, আমিয়ট সাহেব বলিয়াছেন যে, যে অদ্য রাত্রেই অত্যাচারীদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমিয়ট সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল—তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল—বলিল যে, "আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি।" আমিয়ট সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল—কুঞ্চিত ভ্রূ ঋজু হইল—তিনি চারিজন সিপাহী এবং একজন নাএককে বকউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। বলিলেন যে, দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া এখনই আমার নিকটে লইয়া আইস। বকাউল্লা কহিল, "তবে দুই জন ইংরেজ সঙ্গে দিউন—প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ শয়তান—এ দেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না।"

গল্‌ষ্টন্‌ ও জনসন্‌ নামক দুইজন ইংরেজ আমিয়টের আজ্ঞামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন।

গমনকালে গল্‌ষ্টন্‌ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সে বাড়ীর মধ্যে কখন গিয়াছিলে?"

বকাউল্লা বলিল, "না।"

গল্‌ষ্টন্‌ জন্‌সন্‌কে বলিলেন, "তবে বাতি দেশলাইও লও। হিন্দু তেল পোড়ায় না—খরচ হইবে।"

জন্‌সন্‌ পকেটে বাতি ও দীপশলাকা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা তখন, ইংরেজদিগের রণ-যাত্রার গভীর পদবিক্ষেপে রাজপথ বহিয়া চলিলেন। কেহ কথা কহিল না। পশ্চাতে পশ্চাতে চারিজন সিপাহী, নাএক ও বকাউল্লা চলিল। নগর-প্রহরিগণ পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌ সিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসার সম্মুখে নিঃশব্দে আসিয়া, দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল।

রামচরণ অদ্বিতীয় ভৃত্য। পা টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে সুশিক্ষিত হস্ত। বস্ত্রকুঞ্চনে অঙ্গরাগকরণে বড় পটু। রামচরণের মত ফরাশ নাই—তাহার মত দ্রব্যক্রেতা দুর্ল্লভ। কিন্তু এ সকল সামান্য গুণ। রামচরণ লাঠিবাজিতে মুরশিদাবাদ প্রদেশে প্রসিদ্ধ—অনেক হিন্দু ও যবন তাহার হস্তের গুণে ধরাশয়ন করিয়াছিল। বন্দুকে রামচরণ কেমন অভ্রান্তলক্ষ্য এবং ক্ষিপ্রহস্ত, তাহার পরিচয় ফস্টরের শোণিতে গঙ্গাজলে লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সকল অপেক্ষা রামচরণের আর একটি সময়োপযোগী গুণ ছিল—ধূর্ত্ততা। রামচরণ শৃগালের মত ধূর্ত্ত। অথচ অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী।

রামচরণ দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, "এখন দুয়ারে ঘা দেয় কে? ঠাকুর মশায়? বোধ হয়; কিন্তু যা হোক একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি—রাত্রিকালে না দেখিয়া দুয়ার খোলা হইবে না।"

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল। শুনিল, দুই জনে অস্ফুটস্বরে একটা বিকৃত ভাষায় কথা কহিতেছে—রামচরণ তাহাকে "ইণ্ডিল মিণ্ডিল" বলিত—এখনকার লোকে বলে, ইংরেজি। রামচরণ মনে মনে বলিল, রসো, বাবা! দুয়ার খুলি তা বন্দুক হাতে করিয়া—ইণ্ডিল মিণ্ডিলে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা।"

রামচরণ আরও ভাবিল, "বুঝি একটা বন্দুকের কাজ নয়, কর্তাকেও ডাকি।" এই ভাবিয়া রামচরণ প্রতাপকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বার হইতে ফিরিল।

এই সময়ে ইংরেজদিগের ধৈর্য্য ফুরাইল। জন্‌সন্‌ বলিল, অপেক্ষা কেন, লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কপাট ইংরেজি লাথিতে টিকিবে না।"

গল্‌ষ্টন্‌ লাথি মারিল। দ্বার, খড় খড়, ছড় ছড়, ঝন ঝন করিয়া উঠিল। রামচরণ দৌড়িল। শব্দ প্রতাপের কাণে গেলে প্রতাপ উপর হইতে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। সে বার কপাট ভাঙ্গিল না।

পরে জনসন্‌ লাথি মারিল। কপাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

"এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক।" বলিয়া ইংরেজরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীগণ প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে রামচরণের সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। রামচরণ চুপি চুপি প্রতাপকে বলিল. "অন্ধকারে লুকাও—ইংরেজ আসিয়াছে—বোধ হয় আম্‌ বাতের কুঠি থেকে।" রামচরণ আমিয়টের পরিবর্ত্তে আমবাত বলিত।

প্র। ভয় কি?

রা। আট জন লোক।

প্র। আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়ীতে যে কয় জন স্ত্রীলোক আছে, তাহাদেব দশা কি হইবে! তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।

রামচরণ যদি ইংরেজদিগের বিশেষ পরিচয় জানিত, তবে প্রতাপকে কখনই লুকাইতে বলিত না। তাহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণে সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জন্‌সন্ জ্বালিত বর্ত্তিকা একজন সিপাহীর হস্তে দিলেন। বর্ত্তিকার আলোকে ইংরেজেরা দেখিল, সিঁড়ির উপর দুই জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। জন্‌সন বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই?"

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রে সে প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিয়াছিল—সুতরাং ভাল চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভগ্ন হস্তের যাতনা অসহ্য হইয়াছিল—যে কেহ তাহার দায়ে দায়ী। বকাউল্লা বলিল, "হ্যাঁ, ইহারাই বটে।"

তখন ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া ইংরেজেরা সিঁড়ির উপর উঠিল। সিপাহীরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল দেখিয়া, রামচরণ উর্দ্ধশ্বাসে প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জন্‌সন্ তাহা দেখিলেন, নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ, চরণে আহত হইয়া, চলিবার শক্তি রহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক, এবং পলায়নে রামচরণের যে দশা ঘটিল, তাহাও দেখিলেন। প্রতাপ ইংরেজদিগকে স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কেন আসিয়াছ?"

গল্‌ষ্টন্ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ রায়।"

সে নাম বকাউল্লার মনে ছিল। বজরার উপরে বন্দুক হাতে প্রতাপ গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়।" বকাউল্লা বলিল, "জুনাব, এই ব্যক্তি সবদার।"

জন্‌সন্ প্রতাপের এক হাত ধরিল, গল্‌ষ্টন্ আর এক হাত ধরিল। প্রতাপ দেখিলেন, বলপ্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। নাএকের হাতে হাত কড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। গলষ্টন্, পতিত রামচরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "ওটা?" জন্‌সন্ দুই জন সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন যে, "উহাকে লইয়া আইস।" দুই জন সিপাহী রামচরণকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুল্‌সম্ জাগরিত হইয়া মহা ভয় পাইয়াছিল। তাহাবা কক্ষদ্বার ঈষন্মুক্ত করিয়া এই সকল দেখিতেছিল। সিঁড়ির পাশে তাহাদের শয়নগৃহ।

যখন ইংরেজেরা, প্রতাপ ও রামচরণকে লইয়া নামিতেছিলেন, তখন সিপাহীর করস্থ দীপের আলোক, অকস্মাৎ ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে নীলমণিপ্রভ চক্ষুর উপর পড়িল। বকাউল্লা সে চক্ষু দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "ফস্টর সাহেবের বিবি!"

গল্‌ষ্টন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যও ত! কোথায়?"

বকাউল্লা পূর্ব্বকথিত দ্বার দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরে।"

জন্‌সন্ ও গল্‌ষ্টন্ ঐ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলনী এবং কুল্‌সম্‌কে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাদের সঙ্গে আইস।"

দলনী ও কুলসম্ মহা ভীত এবং লুপ্তবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিল। শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পাপের বিচিত্র গতি

যেমন যবনকন্যারা অল্প দ্বার খুলিয়া আপনাদিগের শয়নগৃহ হইতে দেখিতেছিল, শৈবলিনীও সেইরূপ দেখিতেছিল। তিন জনই স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীজাতিসুলভ কুতূহলে তিন জনেই পীড়িতা; তিন জনেই ভয়ে কাতরা; ভয়ের স্বধর্ম্ম ভয়ানক বস্তুর দর্শন পুনঃ পুনঃ কামনা করে। শৈবলিনীও আদ্যোপান্ত দেখিল। সকলে চলিয়া গেলে, গৃহমধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া শয্যোপরি বসিয়া শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবিল, "এখন কি করি? একা, তাহাতে আমার ভয় কি? পৃথিবীতে আমার ভয় নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ্ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না? আত্মহত্যা বড় সহজ—সহজই বা কিসে? এত দিন জলে বাস করিলাম, কই এক দিনও ত ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইত, ধীরে ধীরে নৌকার বাহিরে আসিয়া, জলে ঝাঁপ দিলে কে ধরিত? ধরিত—নৌকায় পাহারা থাকিত। কিন্তু আমিও ত কোন উদ্যোগ করি নাই। মরিতে বাসনা, কিন্তু মরিবার কোন উদ্যোগ করি নাই।—তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে মানুষে মরিতে পারে না। কিন্তু আজ? আজ মরিবার দিন বটে। তবে প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—প্রতাপের কি হয়, তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না।—প্রতাপের কি হয়? যা হৌক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে, তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?"

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদ-গ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল।—যেখানে প্রাচীরপার্শ্বে, শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল—সেই করবীর সর্ব্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল। তুলসী-মঞ্চ—তাহার চারি পার্শ্বে পরিষ্কৃত, সুমার্জ্জিত ভূমি, গৃহপালিত মার্জ্জার, পিঞ্জরে স্ফুটবাক্ পক্ষী, গৃহপার্শ্বে সুস্বাদু আম্রের উচ্চ বৃক্ষ—সকল স্মরণপটে চিত্রিত হইতে লাগিল। কত কি মনে পড়িল! কত সুন্দর, সুনীল, মেঘশূন্য আকাশ, শৈবলিনী ছাদে বসিয়া দেখিতেন; কত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ধবল কুসুম, পরিষ্কার জলসিক্ত করিয়া, চন্দ্রশেখরের পূজার জন্য পুষ্পপাত্র ভরিয়া রাখিয়া দিতেন; কত স্নিগ্ধ, মন্দ, সুগন্ধি বায়ু, ভীমাতটে সেবন করিতেন; জলে কত ক্ষুদ্র তরঙ্গে স্ফটিক বিক্ষেপ দেখিতেন, তাহার তীরে কত কোকিল ডাকিত। শৈবলিনী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "মনে করিয়াছিলাম,

গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব; মনে করিয়াছিলাম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরিয়া যাইব— প্রতাপের গৃহ এবং পুরন্দরপুর নিকট; কুঠির বাতায়নে বসিযা কটাক্ষজাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে ধরিব, সুবিধা বুঝিলে সেখান হইতে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইব, গিয়া প্রতাপের পদতলে লুটাইয়া পুড়িব। আমি পিঞ্জরের পাখী, সংসারের গতি কিছুই জানিতাম না। জানিতাম না যে, মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে; জানিতাম না যে, ইংরেজের পিঞ্জর লোহার পিঞ্জর—আমার সাধ্য কি ভাঙ্গি। অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পবকাল নষ্ট করিলাম।" পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর এ কথা মনে পড়িল না যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে এ কথা বুঝিবে; একদিন প্রায়শ্চিত্ত জন্য সে অস্থি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে, আমরা এ পাপ চিত্রের অবতারণা করিতাম না। পরে সে ভাবিতে লাগিল, "পরকাল? সে ত যে দিন প্রতাপকে দেখিয়াছি, সেই দিন গিয়াছে। যিনি অন্তর্যামী, তিনি সেই দিনেই আমার কপালে নরক লিখিয়াছেন। ইহকালেও আমার নরক হইয়াছে—আমার মনই নরক—নহিলে এত দুঃখ পাইলাম কেন? নহিলে দুই চক্ষের বিষ ফিরিঙ্গীর সঙ্গে এত কাল বেড়াইলাম কেন? শুধু কি তাই, বোধ হয়, যাহা কিছু আমার ভাল,—তাহাতেই অগ্নি লাগে, বোধ হয়, আমারই জন্য প্রতাপ এই বিদপ্গ্রস্ত হইয়াছে,—আমি কেন মরিলাম না?"

শৈবলিনী আবার কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু মুছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, অধর দংশন করিল; ক্ষণকাল জন্য তাহার প্রফুল্ল রাজীবতুল্য মুখ, রুষ্ট সর্পেব চক্রের ভীমকান্তি শোভা ধারণ করিল; সে আবার বলিল, "মরিলাম না কেন?" শৈবলিনী সহসা কটি হইতে একটি 'গেঁজে' বাহির করিল। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছুরিকা ছিল। শৈবলিনী ছুরিকা গ্রহণ করিল। তাহার ফলক নিষ্কোষিত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠেব দ্বারা তৎসহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বলিল, "বৃথা কি এ ছুরি সংগ্রহ করিয়াছিলাম? কেন এত দিন এ ছুরি আমার এ পোড়া বুকে বসাই নাই? কেন,—কেবল আশায় মজিয়া। এখন?" এই বলিয়া শৈবলিনী ছুরিকাগ্রভাগ হৃদয়ে স্থাপিত করিল। ছুরি সেই ভাবে রহিল। শৈবলিনী ভাবিতে লাগিল, "আর এক দিন ছুরি এইরূপে নিদ্রিত ফস্টরের বুকের উপর ধরিয়াছিলাম। সে দিন তাহাকে মারি নাই, সাহস হয় নাই; আজিও আত্মহত্যার সাহস হইতেছে না। এই ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হইয়াছিল—সে বুঝিয়াছিল যে, সে আমার কামরায় প্রবেশ করিলে, এই ছুরিতে হয় সে মরিবে, নয় আমি মরিব। দুরন্ত ইংরেজ ইহার ভয়ে বশ হইয়াছিল,—আমার এ দুরন্ত হৃদয় ইহার ভয়ে বশ হইল না। মরিব? না—আজ নহে। মরি, ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তার পর মরিব।—আর তিনি—যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। এক বার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে

পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভার আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফস্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?" শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়া, সেইরূপ চিন্তাভিভূত রহিল। প্রভাত কালে তাহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখিল। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—মুক্ত গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল। দেখিল চন্দ্রশেখর।

তৃতীয় খণ্ড
পুণ্যের স্পর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ রমানন্দ স্বামী

মুঙ্গেরের এক মঠে, এক জন পরমহংস কিয়দ্দিবস বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম রমানন্দ স্বামী। সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে বিনীত ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। অনেকে জানিতেন, রমানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞান সকল তিনিই জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, "শুন, বৎস চন্দ্রশেখর! যে সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী প্রথমে, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নলরাজা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন। দেখাইলেন, সার্ব্বভৌম মহাপুণ্যাত্মা রাজগণ চিরদুঃখী কদাচিৎ সুখী। পরে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন তাঁহারাও দুঃখী। দানবপীড়িত, অভিশপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন সুরলোকও দুঃখপূর্ণ। শেষে, মনোমোহিনী বাক্‌শক্তির দৈবাবতারণা করিয়া, অনন্ত, অপরিজ্ঞেয়, বিধাতৃহৃদয়মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখাইলেন যে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয়মধ্যে অবশ্য অনুভব করেন। যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই দুঃখরাশি অনুভব করিয়া দুঃখিত হন না? তবে দয়াময় কিসে? দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্তকাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন। যদি বল, তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহার দুঃখ কি? উত্তর এই যে, যিনি নির্ব্বিকার, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারে স্পৃহাশূন্য—তাঁহাকে স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া মানি না। যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিতে পারি না—তিনি দুঃখময়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না; কেন না, তিনি নিত্যানন্দ। অতএব দুঃখ বলিয়া কিছু নাই, ইহাই সিদ্ধ।

রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই; তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ হইতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখ নিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখেরও নিবারণ হয়। দেবগণ জীবদুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির বিকারশূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই।" পরে ঋষিগণের লোকহিতৈষিতা কীর্ত্তন করিয়া ভীষ্মাদি বীরগণের পরোপকারিতার বর্ণনা করিলেন। দেখাইলেন, যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে। তখন রমানন্দ স্বামী শতমুখে পবোপকাব ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণেতিহাস প্রভৃতি মন্থন করিয়া অনর্গল ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রযুক্ত করিতে লাগিলেন। শব্দসাগর মন্থন করিয়া শত শত মহার্ঘ শ্রবণমনোহর, বাক্যপরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন—সাহিত্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, সারবতী, রসপূর্ণা, সদলঙ্কারবিশিষ্টা কবিতানিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন সর্ব্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভান্বিতা ছায়া বিস্তারিত করিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠনির্গত, উচ্চারণকৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব্ব বাক্যসকল চন্দ্রশেখরের কর্ণে তূর্য্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে বাক্যসকল কখন মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল—কখন বীণানিক্কণবৎ মধুর বোধ হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বিস্মিত, মোহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।"

রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নূতন পরিচয়

এদিকে যথাসময়ে, ব্রহ্মচারিদত্ত পত্র নবাবের নিকট পেশ হইল। নবাব জানিলেন, সেখানে দলনী আছেন। তাঁহাকে ও কুলসম্‌কে লইয়া যাইবার জন্য প্রতাপ রায়ের বাসায় শিবিকা প্রেরিত হইল।

তখন বেলা হইয়াছে। তখন সে গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া নবাবের অনুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল।

শৈবলিনী শুনিল, তাঁহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে; অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। কবিগণ আশার প্রশংসায় মুগ্ধ হন। আশা, সংসারের অনেক সুখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মূল। যত পাপ কৃত হয়, সকলই লাভের আশায়। কেবল সৎকার্য্য কোন আশায় কৃত হয় না। যাঁহারা স্বর্গের আশায় সৎকার্য্য করেন, তাঁহাদের কার্য্যকে সৎকার্য্য বলিতে পারি না। আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী, আপত্তি না করিয়া, শিবিকারোহণ করিল।

খোজা, শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এ ত দলনী নহে। আরও দেখিলেন, দলনীও এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী নহে। আরও দেখিলেন যে, এরূপ লোকবিমোহিনী তাঁহার অন্তঃপুরে কেহই নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শৈব। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ন। তুমি আসিলে কেন?

শৈ। রাজভৃত্যগণ আমাকে লইয়া আসিল।

ন। তোমাকে বেগম বলিয়া আনিয়াছে। বেগম আসিলেন না কেন?

শৈ। তিনি সেখানে নাই।

ন। তিনি তবে কোথায়?

যখন গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্ দলনী ও কুল্‌সম্‌কে প্রতাপের গৃহ হইতে লইয়া যায়, শৈবলিনী তাহা দেখিয়াছিল। তাহারা কে, তাহা তিনি জানিতেন না। মনে করিয়াছিলেন, চাকরাণী বা নর্ত্তকী। কিন্তু যখন নবাবের ভৃত্য তাঁহাকে বলিল যে, নবাবের বেগম প্রতাপের গৃহে ছিল, এবং তাঁহাকে সেই বেগম মনে করিয়া নবাব লইতে পাঠাইয়াছেন, তখন শৈবলিনী বুঝিয়াছিল যে, বেগমকেই ইংরেজরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী ভাবিতেছিল।

নবাব শৈবলিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ?''

শৈ। দেখিয়াছি।

ন। কোথায় দেখিলে?

শৈ। যেখানে আমরা কাল রাত্রে ছিলাম।

ন। সে কোথায়? প্রতাপ রায়ের বাসায়?

শৈ। আজ্ঞা হাঁ।

ন। বেগম সেখান হইতে কোথায় গিয়াছেন, জান?

শৈ। দুই জন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। কি বলিলে?

শৈবলিনী পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তর পুনরুক্ত করিলেন। নবাব মৌনী হইয়া রহিলেন। অধর দংশন করিয়া, শ্মশ্রু উৎপাটন করিলেন। গুর্‌গণ খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ইংরেজ বেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল, জান?"

শৈ। না।

ন। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল?

শৈ। তাঁহাকেও উহারা সেই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। তাহার বাসায় আর কোন লোক ছিল?

শৈ। একজন চাকর ছিল, তাঁহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তাঁহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, জান?"

শৈবলিনী এতক্ষণ সত্য বলিতেছিল, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিল। বলিল, "না।"

ন। প্রতাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারে চাকরী করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে হয়?

শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার নাম কি?

শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিল। পাপিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছিল।

নবাব বলিলেন, ''আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।''

শৈবলিনী বলিল, ''আমার গৃহ কোথা—কোথা যাইব?''

নবাব নিস্তব্ধ হইলেন। পরক্ষণে বলিলেন, ''তবে তুমি কোথায় যাইবে?''

শৈ। আমার স্বামীব কাছে। আমার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিন। আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ করিতেছি,—আমার স্বামীকে ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; হয়, আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন নচেৎ আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন। যদি আপনি অবজ্ঞা করিয়া, ইহার উপায না কবেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মবিব। সেই জন্য এখানে আসিয়াছি।

সংবাদ আসিল, গুর্‌গণ খাঁ হাজির। নবাব, শৈবলিনীকে বলিলেন, ''আচ্ছা, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।''

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নূতন সখ

নবাব গুর্‌গণ খাঁকে অন্যান্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ''ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমার বিবেচনায় বিবাদের পূর্ব্বে আমিযটকে অবরুদ্ধ করা কর্তব্য; কেন না, আমিয়ট আমার পরম শত্রু। কি বল?''

গুর্‌গণ খাঁ কহিলেন, ''যুদ্ধে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দূত অস্পর্শনীয। দূতের পীড়ন করিলে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া, আমাদের নিন্দা হইবে।—আর—''

নবাব। আমিয়ট কাল রাত্রে এই সহর মধ্যে এক ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। সে আমার অধিকারে থাকিয়া অপরাধ করে, সে দূত হইলেও আমি কেন তাহার দণ্ডবিধান না করিব?

গুর্। যদি সে এরূপ করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডযোগ্য। কিন্তু তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব?

নবাব। এখনই তাহার বাসস্থানে সিপাহী ও কামান পাঠাইয়া দাও। তাহাকে সদলে ধরিয়া লইয়া আসুক।

গুর্। তাহারা এ সহরে নাই। অদ্য দুই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে।

নবাব। সে কি! বিনা এত্তেলায়?

গুর্। এত্তেলা দিবার জন্য হে নামক এক জনকে রাখিয়া গিয়াছে।

নবাব। এরূপ হঠাৎ, বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি? ইহাতে আমার সহিত অসৌজন্য হইল, তাহা জানিয়াই করিয়াছে।

গুর্। তাহাদের হাতিয়ারের নৌকায় চড়ন্দার ইংরেজকে কে কাল রাত্রে খুন করিয়াছে। আমিয়ট বলে, আমাদের লোক খুন করিয়াছে। সেই জন্য রাগ করিয়া গিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

নবাব। কে খুন করিয়াছে শুনিয়াছ?

গুর্। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

নবাব। আচ্ছা করিয়াছে। তাহার দেখা পাইলে খেলোয়াৎ দিব। প্রতাপ রায় কোথায়?

গুর্। তাহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিযাছে কি আজিমাবাদ পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

নবাব। এতক্ষণ আমাকে এ সকল সম্বাদ দাও নাই কেন?

গুর্। আমি এই মাত্র শুনিলাম।

এই কথাটি মিথ্যা। গুর্গণ খাঁ আদ্যোপান্ত সকল জানিতেন, তাঁহার অনভিমতে আমিয়ট কদাপি মুঙ্গের ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গুর্গণ খাঁর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম, দলনী মুঙ্গেরের বাহির হইলেই ভাল; দ্বিতীয়, আমিয়ট একটু হস্তগত থাকা ভাল, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা উপকার ঘটিতে পারিবে।

নবাব, গুর্গণ খাঁকে বিদায় দিলেন। গুর্গণ খাঁ যখন যান, নবাব তাঁহার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই, "যত দিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, তত দিন তোমায় কিছু বলিব না—যুদ্ধকালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র। তার পর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করিব।"

নবাব তাহার পর মীরমুন্সীকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরওয়ানা পাঠাও যে, যখন আমিয়টের নৌকা মুরশিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে, এবং তাহার সঙ্গের বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া, হুজুরে প্রেরণ করে। স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া কলে কৌশলে ধরিতে হইবে, ইহাও লিখিয়া দি৺। পরওয়ানা তটপথে বাহকেব হাতে যাউক—অগ্রে পঁহুছিবে।

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া আবার শৈবলিনীকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "এক্ষণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না। ইংরেজেরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। মুরশিদাবাদে হুকুম পাঠাইলাম, সেখানে তাহাদিগকে ধরিবে। তুমি এখন—"

শৈবলিনী হাত জোড় করিয়া কহিল, "বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জ্জনা করুন—এখন লোক পাঠাইলে ধরা যায় না কি?"

নাবাব ইংরেজদিগকে ধরা অল্প লোকের কর্ম্ম নহে। অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাইতে হইলে, বড় নৌকা চাই। ধরিতে ধরিতে তাহারা মুরশিদাবাদে পৌঁছিবে। বিশেষ যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া, কি জানি যদি ইংরেজেরা আগে বন্দীদিগকে মারিয়া ফেলে। মুরশিদাবাদে সুচতুর কর্ম্মচারীসকল আছে, তাহারা কলে কৌশলে ধরিবে।

শৈবলিনী বুঝিল যে, তাঁহার সুন্দর মুখখানিতে অনেক উপকার হইয়াছে। নবাব তাঁহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া, তাঁহার সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। নহিলে এত কথা বুঝাইয়া বলিবেন কেন? শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাত যোড় করিল। বলিল, "যদি এ অনাথকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ—তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিতে পারিত না—তিনি যদি এখন হাতিয়ার পান, তবে তাঁহাকে কেহ কয়েদ রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন।"

নবাব হাসিলেন, বলিলেন, "তুমি বালিকা, ইংরেজ কি, তাহা জান না। কে তাঁহাকে সে ইংরেজের নৌকায় উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে?"

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিল, যদি হুকুম হয়, "যদি নৌকা পাই, তবে আমিই যাইব।"

নবাব উচ্চহাস্য করিলেন। হাসি শুনিয়া শৈবলিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল, "প্রভু! না পারি, আমি মরিব—তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি পারি, তবে আমারও কার্য্যসিদ্ধ হইবে, আপনারও কার্য্যসিদ্ধ হইবে।"

নবাব শৈবলিনীর কুঞ্চিত ভ্রূশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, এ সামান্যা স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন, "মরে মরুক, আমার ক্ষতি কি? যদি পারে ভালই—নহিলে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি কার্য্যসিদ্ধি করিবে।" শৈবলিনীকে বলিলেন, "তুমি কি একাই যাইবে।"

শৈ। স্ত্রীলোক, একা যাইতে পারিব না। যদি দযা করেন, তবে সঙ্গে একজন দাসী, একজন রক্ষক, আজ্ঞা করিয়া দিন।

নবাব, চিন্তা করিয়া মসীবুদ্দিন নামে একজন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া প্রণত হইল, নবাব তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে স লও। এবং একজন হিন্দু বাঁদী সঙ্গে লও। ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন তাহাও লও। নৌকার দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ লও। এই সকল লইয়া, এইক্ষণেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর?"

মসীবুদ্দিন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে?"

নবাব। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত ইঁহাকে মান্য করিবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে।

পরে উভয়ে নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া, বিদায় হইল। খোজা যেরূপ করিল, শৈবলিনী দেখিয়া, দেখিয়া, সেইরূপ মাটি ছুঁইয়া পিছু হটিয়া সেলাম করিল। নবাব হাসিলেন।

নবাব গমনকালে বলিলেন, "বিবি, স্মরণ রাখিও। কখনও যদি মুস্কিলে পড়, তবে মীরকাসেমের কাছে আসিও।"

শৈবলিনী পুনর্ব্বার সেলাম করিল। মনে মনে বলিল, "আসিব বৈ কি? হয় ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার কাছে আসিব।"

মসীবুদ্দিন পরিচারিকা ও নৌকা সংগ্রহ করিল। এবং শৈবলিনীর কথামত বন্দুক, গুলি, বারুদ, পিস্তল, তরবারি ও ছুরি সংগ্রহ করিল। মসীবুদ্দিন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, এ সকল কি হইবে? মনে মনে কহিল যে, এ দোসরা চাঁদ সুলতানা।

সেই রাত্রেই তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ কাঁদে

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুইপার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে, সিকতা-শ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতি জ্ঞানে কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত; যত দূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত; তন্মধ্যে

তারকামালা অনন্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণীর শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

এই তরণীশ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজরা আছে—তাহার উপরে সিপাহীর পাহারা। সিপাহীদ্বয়, গঠিত মূর্তির ন্যায়, বন্দুক স্কন্ধে করিয়া স্থির দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিতরে, স্নিগ্ধ স্ফটিক-দীপের আলোকে নানাবিধ মহার্ঘ আসন, শয্যা, চিত্র, পুত্তল প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। ভিতরে কয়জন সাহেব। দুই জনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। এক জন সুরাপান করিতেছেন, ও পড়িতেছেন। এক জন বাদ্যবাদন করিতেছেন।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, সহসা বিকট ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমিয়ট সাহেব জন্সনকে কিস্তি দিতে দিতে বলিলেন, "ও কি ও?"

জন্সন্ বলিলেন, "কাব কিস্তি মাত হইয়াছে।"

ক্রন্দন বিকটতর হইল। ধ্বনি বিকট নহে; কিন্তু সেই জলাভূমির নীরব প্রান্তর মধ্যে এই নিশীথ ক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল।

আমিয়ট খেলা ফেলিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, নিকটে কোথাও শ্মশান নাই। সৈকতভূমির মধ্যভাগ হইতে শব্দ আসিতেছে।

আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সেই বালুকা প্রান্তরমধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট নিকটে গেলেন। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট হিন্দী ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?" স্ত্রীলোকটি তাঁহার হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আমিয়ট পুনঃ পুনঃ তাঁহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী উঠিল। আমিয়ট অগ্রসর হইলেন। রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—পাপিষ্ঠা শৈবলিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হাসে

বজ্‌রার ভিতরে আসিয়া আমিয়ট গল্‌ষ্টন্‌কে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না। তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

গল্‌ষ্টন্ প্রায় আমিয়টের মত পণ্ডিত; কিন্তু ইংরেজ মহলে হিন্দিতে তাঁহার বড় পশার। গল্‌ষ্টন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

শৈবলিনী কথা কহিল না, কাঁদিতে লাগিল।

গ। কেন কাঁদিতেছে?

শৈবলিনী তথাপি কথা কহিল না—কাঁদিতে লাগিল।

গ। তোমার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ।

গ। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

শৈবলিনী তদ্রূপ।

গলষ্টন্ হার মানিলেন। কোন কথার উত্তর দিল না দেখিয়া ইংরেজেরা শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনী সে কথাও বুঝিল না—নড়িল না—দাঁড়াইয়া রহিল।

আমিয়ট বলিলেন, "এ আমাদিগের কথা বুঝে না—আমরা উহার কথা বুঝি না। পোষাক দেখিয়া বোধ হইতেছে, ও বাঙ্গালির মেয়ে। এক জন বাঙালিকে ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বল।"

সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালি মুসলমান। আমিয়ট তাহাদিগের একজনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতেছ কেন?"

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিল। খানাসামা সাহেবদিগকে বলিল, "পাগল।"

সাহেবেরা বলিলেন, "উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি চায়?"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল। শৈবলিনী বলিল, "ক্ষিদে পেয়েচে।"

খানসামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট বলিলেন, "উহাকে কিছু খাইতে দাও।"

খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে বাবুর্চিখানার নৌকায় লইয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে, কেন না, শৈবলিনী পরমা সুন্দরী। শৈবলিনী কিছুই খাইল না। খানসামা বলিল, "খাও না।" শৈবলিনী বলিল, "ব্রাহ্মণের মেয়ে; তোমাদের ছোঁওয়া খাব কেন?"

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে এ কথা বলিল। আমিয়ট সাহেব বলিলেন, "কোন নৌকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই?"

খানসামা বলিল, "এক জন সিপাহী ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েদী একজন ব্রাহ্মণ আছে।"

সাহেব বলিলেন, "যদি কাহারও ভাত থাকে দিতে বল।"

• খানসামা শৈবলিনীকে লইয়া প্রথমে সিপাহীদের কাছে গেল। সিপাহীদের নিকট কিছুই ছিল না। তখন খানসামা, যে নৌকায় সেই ব্রাহ্মণ কয়েদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকায় লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ কয়েদী, প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পান্সীতে, একা প্রতাপ। বাহিরে, আগে পিছে সান্ত্রীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার।

খানসামা বলিল, "ওগো ঠাকুর!" প্রতাপ বলিল, "কেন?"

খা। তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে?

প্র। কেন?

খা। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে। দুটি দিতে পার?

প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না।

বলিলেন, "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।"

খানসামা সান্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। সান্ত্রী বলিল, "হুকুম দেওয়াও।"

খানসামা হুকুম করাইতে গেল। পরের জন্য এত জল বেড়াবেড়ি কে করে? বিশেষ পীরবক্স সাহেবের খানসামা; কখন ইচ্ছাপূর্বক পরের উপকার করে না। পৃথিবীতে যত প্রকার মনুষ্য আছে, ইংরেজদিগের মুসলমান খানসামা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু এখানে পীরবক্সের একটু স্বার্থ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটার খাওয়া দাওয়া হইলে ইহাকে একবার খানসামা মহলে লইয়া গিয়া বসাইব। পীরবক্স শৈবলিনীকে আহার করাইয়া বাধ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রতাপের নৌকায় শৈবলিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল—খানসামা হুকুম করাইতে আমিয়ট সাহেবের নিকট গেল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র। আমিয়ট দেখিয়াছিলেন যে, এই "জেন্টু" স্ত্রীলোকটি নিরুপমা রূপবতী—তাহাতে আবার পাগল শুনিয়া একটু দয়াও হইয়াছিল। আমিয়ট জমাদ্দার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খানসামা আলো আনিয়া দিল। সান্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সেই নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায় পলায়ন।

শৈবলিনী নৌকার ভিতর প্রবেশ করিল। সান্ত্রীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল—নৌকার ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না। শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে, দেখিলেন, শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছে, মুখ ঈষৎ হর্ষপ্রফুল্ল,—মুখমণ্ডল স্থিরপ্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিল। এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে।

শৈবলিনী অতিলঘুস্বরে, কানে কানে বলিল, "হাত ধোও—আমি কি ভাতের কাঙ্গাল?"

প্রতাপ হাত ধুইল। সেই সময়ে শৈবলিনী কানে কানে বলিল, "এখন পলাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্য।"

প্রতাপ সেইরূপ স্বরে বলিল, "আগে তুমি যাও, নচেৎ তুমি বিপদে পড়িবে।"

শৈ। এই বেলা পলাও। হাতকড়ি দিলে আর পলাইতে পারিবে না। এই বেলা জলে ঝাঁপ দাও। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল। আমি পাগল—জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দাও।

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ভাত খাইব না।" তখনি আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

"কি হইল? কি হইল? বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে করিতে নৌকা হইতে বাহির হইলেন। সান্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ?" এই বলিয়া প্রতাপ সিপাহীকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহী পান্সী হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহী পড়িল। "স্ত্রীলোককে রক্ষা কর" বলিয়া প্রতাপ অপর দিকে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণপটু শৈবলিনী

আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ করিয়া চলিলেন।

"কয়েদী ভাগিল" বলিয়া পশ্চাতে সান্ত্রী ডাকিল। এবং প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—পলাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব—সম্মুখে স্ত্রীহত্যা কি প্রকারে দেখিব? তুই বাপু হিন্দু—বুঝিয়া ব্রহ্মহত্যা করিস্।"

সিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্ব্বশেষের নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ কবিয়া যাইতেছিল। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অকস্মাৎ চমকিযা উঠিল। দেখিল যে, যে নৌকায় শৈবলিনী লবেন্স ফস্টরের সঙ্গে বাস করিয়াছিল, এ সেই নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিতা হইয়া ক্ষণকাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, তাহার ছাদে, জ্যোৎস্নার আলোকে, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর একটি সাহেব অর্দ্ধশয়নাবস্থায় রহিয়াছে। উজ্জ্বল চন্দ্ররশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। শৈবলিনী চীৎকার শব্দ করিল—দেখিল, পালঙ্কে লবেন্স ফস্টর। লরেন্স ফস্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে কবিতে চিনিল—শৈবলিনী। লরেন্স ফস্টরও চীৎকার করিয়া বলিল, "পাকড়ো! পাকড়ো! হামারা বিবি!" ফস্টর শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, শয্যাগত, উত্থান শক্তিরহিত।

ফস্টরের শব্দ শুনিয়া চাবি পাঁচ জন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। তাহারা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল,, "পাকড়ো! পাকড়ো! ফস্টর সাহাব ইনাম দেগা।" প্রতাপ মনে মনে বলিল, "ফস্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম দিযাছি—ইচ্ছা আছে আব একবাব দিব।" প্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিল, "আমি ধরিতেছি— তোমরা উঠ।"

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফস্টর বুঝে নাই যে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি প্রতাপ। ফস্টরের মস্তিস্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ অগাধ জলে সাঁতার

দুই জনে সাঁতারিয়া, অনেক দূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকর-সাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই উর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল! তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতাব? জন্মিযা অবধি এই দুরন্ত কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের ত তল আছে,—আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি।

তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া ত জড় প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দেও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না—তারা তেমনি জ্বলে—তীরে বৃক্ষ তেমনি দোলে, জলে চাঁদের

আলো তেমনি খেলে। জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য? স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়।

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষে। শৈবলিনীর চক্ষে নহে। শৈবলিনী নৌকার উপর যে রুগ্ন, শীর্ণ, শ্বেত মুখমণ্ডল দেখিয়াছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই জাগিতেছিল। শৈবলিনী কলের পুত্তলির ন্যায় সাঁতার দিতেছিল। কিন্তু শ্রান্তি নাই। উভয়ে সন্তরণ-পটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।

প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী-শৈ!"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। কত কাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশিমধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল, "চাঁদের? না। সূর্য্য উঠিয়াছে।—শৈ! আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।"

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ!

শৈ। কি?

প্র। মনে পড়ে?

শৈ! কি?

প্র। আর এক দিন এমনি সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিল না। এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল; শৈবলিনী তাহা ধরিল। প্রতাপকে বলিল, "ধর, ভর সহিবে। বিশ্রাম কর।" প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিল। বলিল, "মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?" শৈবলিনী বলিল, "মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

প্র। তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল, "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন, প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব—তোমার হাত।

শৈ। কি চাও, প্রতাপ? যা বল তাই করিব।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশ বর্ণ

ধারণ করিল। নীল জল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। ফস্টর আসিয়া যেন সম্মুখে তরবারি হস্তে দাঁড়াইল। শৈবলিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "কি শপথ, প্রতাপ?"

উভয়ে পাশাপাশি কাষ্ঠ ছাড়িয়া সাঁতার দিতেছিল। গঙ্গার কলকল চলচল জলভঙ্গরব-মধ্যে এই ভয়ঙ্কর কথা হইতেছিল। চারি পাশে প্রক্ষিপ্ত বারিকণা-মধ্যে চন্দ্র হাসিতেছিল। জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য!

"কি শপথ প্রতাপ?"

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি?

প্র। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্র। তবে আমার শপথ?

শৈ। কাছে আইস—হাত দাও।

প্রতাপ নিকটে গিয়া, বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিল। দুই জনের সাঁতার দেওয়া ভার হইল। আবার উভয়ে কাষ্ঠ ধরিল।

শৈবলিনী বলিল, "এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—কত কাল পরে প্রতাপ?"

প্র। আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

শৈবলিনী বলিল, "তোমার শপথ—কি বলিব?"

প্র। শপথ কর, আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী—

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য, প্রাণান্তকর; শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল, "এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?"

প্র। আমি!

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?

প্র। কিছু না—আইস তবে দুই জনে ডুবি।

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে, তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?" প্রকাশ্যে বলিল, তীরে চল।"

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ডুবিল।

তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল। শৈবলিনী টানিল। প্রতাপ উঠিল।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল—বলিল, "প্রতাপ হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল। কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল।

প্রতাপ গদগদ কণ্ঠে বলিল, "চল, তীরে উঠি।"

উভয়ে গিয়া তীরে উঠিল।

পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিল। ছিপ নিকটে ছিল, উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিল। উভয়ের মধ্যে কেহই জানিত না যে, রমানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

এদিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, কয়েদী পলাইল। তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। কিন্তু ছিপ শীঘ্র অদৃশ্য হইল।

রূপসীর সঙ্গে মোকদ্দমায় আরজি পেশ না হইতেই শৈবলিনীর হার হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ রামচরণের মুক্তি

প্রতাপ যদি পলাইল, তবে রামচরণের মুক্তি সহজেই ঘটিল। রাম চরণ ইংরেজের নৌকায় বন্দিভাবে ছিল না। তাহারই গুলিতে যে ফস্টরের আঘাত ও সান্ত্রীর নিপাত ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। তাহাতে সামান্য ভৃত্য বিবেচনা করিয়া আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রাকালে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমার মুনিব বড় বদ্‌জাত, উহাকে আমরা সাজা দিব, কিন্তু তোমাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" শুনিয়া রামচরণ সেলাম করিয়া যুক্তকরে বলিল, "আমি চাষা গোয়ালা—কথা জানি না—রাগ করিবেন না—আমার সঙ্গে আপনার কি কোন সম্পর্ক আছে?"

আমিয়টকে কেহ কথা বুঝাইয়া দিলে, আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। নহিলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন কেন?

আমিয়ট। কি তামাসা?

রা। আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে বলায়, বুঝায় যে, আমি আপনাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছি। আমি গোয়ালার ছেলে, ইংরেজের ভগিনী বিবাহ করিলে আমার জাত যাবে।

দ্বিভাষী আমিয়টকে কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, এ বুঝি এক প্রকার এদেশী খোশামোদ। মনে করিলেন, যেমন নেটিবেরা খোশামোদ করিয়া "মা বাপ" "ভাই" এরূপ সম্বন্ধসূচক শব্দ ব্যবহার করে, রামচরণ সেইরূপ খোশামোদ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধী বলিতেছে। আমিয়ট নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি?"

রামচরণ বলিল, "আমার পা জোড়া দিয়া দিতে হুকুম হউক।"

আমিয়ট হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি কিছু দিন আমাদিগের সঙ্গে থাক, ঔষধ দিব।"

বামচরণ তাহাই চায়। প্রতাপ বন্দী হইয়া চলিলেন, রামচরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং বামচরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েদ ছিল না।

যে রাত্রে প্রতাপ পলায়ন করিল, সেই রাত্রে রামচরণ কাহাকে কিছু না বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গমনকালে, রামচবণ অস্ফুট স্বরে ইণ্ডিলমিণ্ডিলের পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে গেল। পা জোড়া লাগিযাছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ পর্ব্বতোপরে

আজি রাত্রে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ,— তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ় অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার; তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষ রাত্রে ছিপ পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া, তীরে লাগিয়াছিল—বড় বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটি নিভৃত স্থানে ছিপ লাগাইয়াছিল। সেই সময়ে, শৈবলিনী, অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিল। এখন শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অবণ্যচব জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয ছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়াদি-পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে? ভিক্টর হ্যুগো যে সমুদ্রতলবাসী রাক্ষসস্বভাব ভয়ঙ্কর পুরুভুজের বর্ণনা করিয়াছেন, লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অতি স্বচ্ছ স্ফটিকনিন্দিত জলমধ্যে বাস• করে, ইহার বাসগৃহতলে মৃদুল জ্যোতিঃপ্রফুল্ল চারু গৈরিকাদি ঈষৎ জ্বলিতে থাকে। ইহার গৃহে কত মহামূল্য মুক্তা প্রবালাদি কিরণ প্রচার করে; কিন্তু ইহা মনুষ্যের শোণিত পান করে; যে ইহার গৃহসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথায় গমন করে, এই শতবাহু রাক্ষস, ক্রমে এক একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরে; ধরিলে আর কেহ ছাড়াইতে পারে না। শত হস্তে সহস্র গ্রন্থিতে জড়াইয়া ধরে; তখন রাক্ষস, শোণিতশোষক সহস্র মুখ হতভাগ্য মনুষ্যের অঙ্গে স্থাপন করিয়া তাহার শোণিতশোষণ করিতে থাকে।

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই, তাহার সন্ধান করিবে। এ জন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যত দূর পারিল, তত দূর চলিল। ভারতবর্ষের কটিবন্ধস্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইল। গিরি আরোহণ করিলে পাছে, অনুসন্ধানপ্রবৃত্ত কেহ তাহাকে দেখিতে পায়, এজন্য দিবাভাগে গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইল না। বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল। সমস্ত দিন অনাহারে গেল। সায়াহ্নকাল অতীত হইল, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিবে। শৈবলিনী অন্ধকাবে, গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে

শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র লতাগুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কণ্টকে ভগ্ন শাখাগ্রভাগে, বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তাহাতে শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া, এ ভীষণ কণ্টকময়, হিংস্রজন্তুপরিবৃত পার্ব্বত্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এত কাল ঘোরতর পাপে নিমগ্ন হইয়াছিল—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন উপশম হইবে?

অতএব ক্ষতবিক্ষতচরণে, শোণিতাক্ত কলেবরে, ক্ষুধার্ত্ত পিপাসাপীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি আরোহণ করিতে লাগিল। পথ নাই—লতা গুল্ম এবং শিলারাশির মধ্যে দিনেও পথ পাওয়া যায় না—এক্ষণে অন্ধকার। অতএব শৈবলিনী বহু কষ্টে অল্পদূর মাত্র আরোহণ করিল।

এমত সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদশূন্য, অনন্তবিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকার মাত্রাত্মক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর, কণ্টক, এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর পর্ব্বতারোহণ-চেষ্টা বৃথা—শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিল।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাঘ বাত্যা সেই অদ্রিসানুদেশে প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি? এই পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না?

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। এক বিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা! তারপর দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। সে গর্জ্জন, বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণশব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনত মস্তকে পার্ব্বতীয় প্রস্তরাসনে শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষ লতা গুল্মাদির শাখা সকল বায়ুতাড়িত হইয়া প্রহত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহত হইতেছে। শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম বেগে আসিয়া শৈবলিনীর উরুদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে।

তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্ব সুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থ-সাধিকা, সর্ব্ব কামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করি নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া ভুবন-মোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা

জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল—ঝড় থামিল না—কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী বুঝিল যে, জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্ব্বতে আরোহণ অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। তখন তাহার গার্হস্থ্য-সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্যোদয়ও দেখিতে পাইব না। পুনঃ পুনঃ যে মৃত্যুকে ডাকিয়াছি, অদ্য সে নিকট। এমত সময় সেই মনুষ্যশূন্য পর্ব্বতে, সেই অগম্য বনমধ্যে, সেই মহাঘোর অন্ধকারে, কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী প্রথমে মনে করিল, কোন বন্য পশু। শৈবলিনী সরিয়া বসিল। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্যহস্তের স্পর্শ—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শৈবলিনী ভয়বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "তুমি কে? দেবতা না মনুষ্য?" মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে; কেন না, দেবতা দণ্ডবিধাতা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শৈবলিনী বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। শৈবলিনী উষ্ণ নিশ্বাসস্পর্শ স্কন্ধদেশে অনুভূত করিল। দেখিল, এক ভুজ শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইল—আর এক হস্তে শৈবলিনীর দুই পদ একত্রিত করিয়া বেড়িয়া ধরিল। শৈবলিনী দেখিল, তাহাকে উঠাইতেছে। শৈবলিনী একটু চীৎকার করিল—বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে অনভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। শৈবলিনী ভাবিল যে, এ যেই হউক, লরেন্স ফস্টর নহে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রতাপ কি করিলেন

প্রতাপ জমিদার, এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়েব অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র। এ কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বপুরুষগণের এই অখ্যাতি শুনিয়া, বোধ হয়, কোন জমিদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না; কেন না, অন্যত্র দেখিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গৌববে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশমর্য্যাদায় পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশমর্য্যাদার বিশেষ গর্ব্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা নর্ম্মন্ বা স্কন্দেনেবীয় নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ

মর্য্যাদা ছিল; তাঁহারা গোচোর; বিরাটের উত্তরগোগৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই. এক বাঙ্গালি জমিদারের এরূপ কিঞ্চিৎ বংশমর্য্যাদা আছে।

তবে অন্যান্য প্রাচীন জমিদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য বা দুর্দ্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না; এমন কি, দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন।

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সেই রাত্রি প্রভাতে প্রতাপ, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; কিছুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া, তাহাকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতা । নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি। আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম পথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে, তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে।" অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফস্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে, এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফস্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফস্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসৎকার করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্তব্য; কেন না, ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফস্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গেরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ দুর্গমধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অসুরদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? ফস্টর কি ধৃত হইবে না?

তারপর মনে ভাবিলেন, যাহার যেমন শক্তি, তাহার কর্তব্য এই কার্য্যে নবাবের সাহায্য করে। কাষ্ঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।

তারপর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না? আমি কি করিতে পারি?

তারপর মনে ভাবিলেন, আমার সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে—দস্যু আছে। তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কার্য্য হইতে পারে?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুটপাট হইতে পারে। যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের রসদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানেই রসদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের দ্রব্য সামগ্রী যাইতেছে, সেইখানেই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ, এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যত দূর পারি, তত দূর তাহা করিব।

তার পর ভাবিলেন, আমি কেন এত করিব? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল; চতুর্থ, এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে; পঞ্চম, নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই একখানা বড় বড় পরগণা পাইতে পারিব। অতএব আমি ইহা করিব।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোশামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশে আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল, কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়া দুঃখিত হইল। প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যুসম্বাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল, কিন্তু বলিল, "যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল। তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা আর কোন্ মুখে না বলিব?"

প্রতাপ, রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছে।

শুনিয়া গুর্‌গণ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শৈবলিনী কি করিল

মহান্ধকারময় পর্ব্বতগুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ। নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্বতস্থ রন্ধ্রপথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপটাপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু—কে জানে?—সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইলেন। ভয়? তাহাও নহে। মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে—শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। শৈবলিনীর ভয় নাই—কেন না, জীবন তাঁহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল—ফেলিতে পারিলেই ভাল। বাকী যাহা—সুখ, ধর্ম্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছে—আর যাইবে কি? কিসের ভয়?

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল যে আশা হৃদয়মধ্যে সযত্নে, সঙ্গোপনে পালিত করিয়াছিল, সেই দিন বা তাহার পূর্ব্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল; যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়াছে; চিত্ত নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্ব্বতারোহণ শ্রান্তি; বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ; শরীরও নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য; তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানবচিত্ত আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্দ্ধনিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় রহিল। গুহাতলস্থ উপলখণ্ড সকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দু-কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃত জীবসকল—চর্ম্ম-মাংসাদি-বর্জ্জিত—কেবল অস্থি ও বৃহৎ, ভীষণ, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়-বিশিষ্ট্য—ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্ব্বত হইতে ধৃত করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইল। সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোকমাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলেই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্ত্তে লৌহসূচী সকল অগ্রভাগ ঊর্ধ্ব করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস্—গঙ্গায়, প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্। শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার দিবে! মহাকায় পুরষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহার জন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিল যে, সেই বেত্র জ্বলন্ত লোহিত লৌহনির্ম্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীব পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্ভীর সকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিল; রুধিরস্রোতঃ বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধিরস্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিলেন—ডুবিলেন না। মধ্যে মধ্যে পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়া চাহিয়া দেখিয়া, "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে, তাহা চক্ষে প্রবেশ মাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বিষসংযোগে যেরূপ জ্বালা সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল যে, শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়াও উন্মত্তার ন্যায় হইল। কর্ণে, অতি কঠোর, কর্কশ ভয়াবহ শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল—হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার, পর্ব্বতবিদারণ, অশনিপতন, শিলাঘর্ষণ, জলকল্লোল, অগ্নিগর্জ্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন, সকলই এককালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহাতে

শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল—কখনও বা শীতে শত সহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল, "প্রাণ যায়! রক্ষা কর!" তখন অসহ্য পূতিগন্ধবিশিষ্ট এক বৃহৎ কদর্য কীট আসিয়া শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর! এ নরক! এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

মহাকায় পুরুষ বলিলেন, 'আছে।" স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত চীৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর ফুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিল, "আমার কি হবে! আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, "আছে।"

এ কি এ? শৈবলিনী কি সত্য সত্যই নরকে? শৈবলিনী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়?"

গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, "দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।"

এ কি দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, "কি সে ব্রত? কে আমায় শিখাইবে?"

উত্তর—আমি শিখাইব।

শৈ—তুমি কে?

উত্তর—ব্রত গ্রহণ কর।

শৈ—কি করিব?

উত্তর—তোমার ও চীনবাস ত্যাগ করিয়া, আমি যে বসন দিই, তাই পর। হাত বাড়াও।

শৈবলিনী হাত বাড়াইল। প্রসারিত হস্তের উপর এক খণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি করিব?"

উত্তর—তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈ। বেদগ্রাম। সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর—হাঁ—গিয়া গ্রাম প্রান্তে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ভূতলে শয়ন করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ফলমূলপত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না।

শৈ। আর?

উত্তর—জটা ধারণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে গ্রামে আপনার পাপ কীর্ত্তন করিবে।

শৈ। আমার পাপ যে বলিবার নয়! আর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

উত্তর—আছে।

শৈ। কি?

উত্তর। মরণ।

শৈ। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইল না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যেই হউন, জানিতে চাহি না। পর্ব্বতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর একটি কথার উত্তর করুন, আমার স্বামী কোথায়?"

উত্তর—কেন?

শৈ। আর কি তাহার দর্শন পাইব না?

উত্তর। তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈ। কত বৎসর পরে?

উত্তর—দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈ। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কত দিন বাঁচিব? যদি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মরিয়া যাই?

উত্তর—তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈ। কোন উপায়েই কি তৎপূর্ব্বে সাক্ষাৎ পাইব না? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর—যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ, দিনরাত্র কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন, কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও; তাহাতে পরিতোষজনক ভোজন করিও না—যেন ক্ষুধানিবারণ না হয়। কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না—বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি এই অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া, সরল চিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাতাস উঠিল

শৈবলিনী তাহাই করিল—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইল না—কেবল এক একবার দিনান্তে ফলমূলান্বেষণে বাহির হইত। সাত দিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিল না। প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল—কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু স্পর্শ করিতে পায় না। ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ—মন নিরুদ্ধ—সর্ব্বত্র স্বামী। স্বামী চিত্তবৃত্তিসমূহের একমাত্র অবলম্বন হইল। অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পায় না—সাত দিন সাত রাত কেবল স্বামিমুখ দেখিল। ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে পায় না—কেবল স্বামীর জ্ঞান-পরিপূর্ণ, স্নেহবিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে পাইল—ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবলমাত্র তাঁহার পুষ্পপত্রের পূর্ব্বরাশির গন্ধ পাইতে লাগিল—ত্বক্ কেবল চন্দ্রশেখরের আদরের স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল। আশা আর কিছুতেই নাই—আর কিছুতে ছিল না; স্বামিসন্দর্শন কামনাতেই রহিল। স্মৃতি কেবল শ্মশ্রুশোভিত, প্রশস্ত ললাট প্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল—কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুর্লভ সুগন্ধী-পুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল, সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী সন্দেহ নাই। নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট ক্ষুধাপীড়িত; চিত্ত অন্য-চিন্তাশূন্য; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। এই অবস্থায়, অবসন্ন শরীরে, অবসন্ন মনে, একাগ্রচিত্তে, স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

বিকৃতি? না দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজ বিশিষ্ট, সুন্দরগঠন, সুকুমারে বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট—প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখা-বিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন—জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্র জ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎ রঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর, সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্রশোভিত শালতরু,—মাধবীজড়িত দেবদারু কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পবিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাব স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কুলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে আমি? তাঁহার কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান,—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে বেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? সমুদ্রে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কন্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ! আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?

যে বলিয়াছিল, এইরূপে স্বামি ধ্যান কর, সে অনন্ত মানবহৃদয়-সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে। জানে যে, এই মন্ত্রে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান যায়,—জানে যে, এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফল মূল খাইল না—ষষ্ঠ দিবসে ফল মূল আহরণে গেল না—সপ্তম দিবস প্রাতে ভাবিল, স্বামিদর্শন পাই না পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন; শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুন্‌গুন্ করিতেছে।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে

শৈবলিনী চেতনা হারাইল। সে নানা বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল, সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে, অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে, সকলের মিলিত নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প সকল বন্যার জলেব ন্যায় সরিয়া গেল। কখন দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্ব্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে। আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; এমত সময়ে চন্দ্রশেখব আসিযা সেই অগ্নিপর্ব্বোতমধ্যে এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল, কুণ্ডমধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল, তীবে কুসুম সকল বিকশিত হইল, নদীজলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখন দেখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলি... পর্ব্বতে লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র ে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তৎ-ই ভিন্ন শিরা হইয়া প্রা- করিল, শৈবলিনী দেখিল, তাহার মুখ ফস্টরের মুখের ন্য . ।

রাত্রিশেযে শৈবলিনী দেখিলেন, ।লিনীর মৃত্যু হইয়াছে অ' ৎগন আছে। দেখিলেন, পিশাচে, তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্য' -থ উড়িতেছে। দেখিলেন, কত কৃষ্ণমেঘের সমুদ্র, কত বিদ্যুদগ্নিরাশি পার হইয় তাহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কত গগনবাসী অপ্সরা কিন্নরাদি মেঘতরঙ্গ মধ্য হইতে মুখমণ্ডল উত্থিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিলেন, কত গগনচারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী স্বর্ণ-মেঘে আরোহণ করিয়া, স্বর্ণকলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া, কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,—শৈবলিনীর পাপময় দেহস্পৃষ্ট পবনস্পর্শে তাহাদের জ্যোতিঃ নিবিয়া যাইতেছে। কত গগনচারিণী ভৈরবী রাক্ষসী, অন্ধকারবৎ শরীর প্রকাণ্ড অন্ধকার মেঘের উপর হেলাইয়া ভীম বাত্যায় ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতেছে,—শৈবলিনীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখের জল পড়িতেছে, তাহারা হাঁ করিয়া আহার করিতে আসিতেছে। দেখিলেন, কত দেব দেবীর বিমানের, কৃষ্ণতাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে; পাছে পাপিষ্ঠা শৈবলিনীশবের ছায়া বিমানের পবিত্র ছায়ায় লাগিলে শৈবলিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাঁহারা বিমান সরাইয়া লইতেছেন। দেখিলেন, নক্ষত্রসুন্দরীগণ নীলাম্বরমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—বলিতেছে—"দেখ, ভগিনি, দেখ, মনুষ্য-কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে!" কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে; কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে; কোন তারা অসতীর নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে। পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, তার পর আরও ঊর্ধ্বে, আরও মেঘ, আরও তারা পার হইয়া আরও ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। অতি ঊর্ধ্বে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই। শব্দ নাই—কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কলকল ঘরঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—যেন অতিদূরে; অধোভাগে, শত সহস্র সমুদ্র এককালে গর্জ্জিতেছে। পিশাচেরা বলিল, "ঐ নরকের কোলাহল শুনা

যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও।" এই বলিয়া পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণগতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। শবের মুখে, নাসিকায়, রক্তবমন হইতে লাগিল। ক্রমে নরকের গর্জ্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পূতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল, তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল, মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—"কোথায় তুমি, স্বামী! কোথায় প্রভু! স্ত্রীজাতির জীবনসহায়, আরাধনার দেবতা, সর্ব্বে সর্ব্বমঙ্গল! কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে সহস্র, সহস্র, সহস্র, সহস্র, প্রণাম! আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারে না—আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

তখন, অন্ধ, বধির, মৃতা শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল যে, কে তাহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাঁহার অঙ্গের সৌরভে দিক্ পূরিল; সেই দুরন্ত নরক-রব সহসা অন্তর্হিত হইল, পূতিগন্ধের পরিবর্তে কুসুমগন্ধ ছুটিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন, এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর প্রভাতকূজন শুনা যাইতেছে—কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাঁহার মাথা রহিয়াছে—কাহার মুখমণ্ডল, তাঁহার মস্তকোপরে, গগনোদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ এ প্রভাতান্ধকারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে? শৈবলিনী চিনিলেন, চন্দ্রশেখর—ব্রহ্মচারী-বেশে চন্দ্রশেখর!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ নৌকা ডুবিল

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী উঠিয়া বসিল, চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল; মাথা ঘুরিল; শৈবলিনী পড়িয়া গেল; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে ঘর্ষিত হইল। চন্দ্রশেখর তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর করিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন।

শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃ পতিত হইয়া বলিল, "এখন আমার দশা কি হইবে!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে কেন?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিল, রোদন সম্বরণ করিল—স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "বোধ হয় আমি আর অতি অল্প দিন বাঁচিব।" শৈবলিনী শিহরিল—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "অল্প দিন বাঁচিব—মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? কেন বিশ্বাস করিবে? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি?"

শৈবলিনী কাতরতার বিকট হাসি হাসিল।

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈ। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফস্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফস্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন; ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, গমনোন্মুখ হইয়া, মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, "শৈবলিনী, দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত!"

শৈবলিনী হাতযোড় করিল,—বলিল, "আর একবার বসো! বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই।" আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—'বসো—তোমায় ক্ষণেক দেখি।"

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মহত্যায় পাপ আছে কি?" শৈবলিনী স্থিরদৃষ্টে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিল, তাঁহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম জলে ভাসিতেছিল।

চন্দ্র। আছে। কেন মরিতে চাও?

শৈবলিনী শিহরিল। বলিল, "মরিতে পারিব না—সেই নরকে পড়িব।"

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক হইতে উদ্ধার হইবে।

শৈ। এ মনোনরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি?

চন্দ্র। সে কি?

শৈ। এ পর্ব্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন বলিতে পারি না—আমি রাত্রিদিন নরক-স্বপ্ন দেখি।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, 'শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে—যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। দেখিলেন, তাহার শীর্ণ বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—চক্ষুঃ বিস্ফারিত, পলকরহিত হইল—নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত, বিস্ফারিত হইতে লাগিল—শরীর কণ্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

শৈবলিনী কথা কহিল না, পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভয় পাইতেছ?"

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ।

চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেকক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "প্রভু! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী। তুমি না রাখিলে কে রাখে?"

শৈবলিনী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন। উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল। শৈবলিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "কি দেখিতেছিলে?"

শৈ। সেই নরক!

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী ক্ষণ পরে বলিল, "আমি মরিতে পারিব না—আমার ঘোরতর নরকের ভয় হইয়াছে। মরিলেই নরকে যাইব। আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু একাকিনী, আমি দ্বাদশ বৎসব কি প্রকারে বাঁচিব? আমি চেতনে অচেতনে কেবল নবক দেখিতেছি।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে, এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যরা ইহাকে বায়ুরোগ বলেন। তুমি বেদগ্রামে গিয়া গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধান করিবেন—চিকিৎসা কবিতে পারিবেন।"

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদিল—দেখিল, গুহাপ্রান্তে সুন্দরী দাঁড়াইয়া, প্রস্তরে উৎকীর্ণা—অঙ্গুলি তুলিয়া দাঁড়াইযা আছে। দেখিল, সুন্দরী অতি দীর্ঘাকৃতা, ক্রমে তালবৃক্ষপরিমিতা হইল, অতি ভয়ঙ্করী! দেখিল, সেই গুহাপ্রান্তে সহসা নবক সৃষ্ট হইল—সেই পূতিগন্ধ, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্জ্জন, সেই উত্তাপ, সেই শীত, সেই সর্পারণ্য, সেই কর্দয্য কীটরাশিতে গগন অন্ধকার। দেখিল, সেই নরকে পিশাচেরা কন্টকের রজ্জুহস্তে, বৃশ্চিকের বেত্রহস্তে নামিল—রজ্জুতে শৈবলিনীকে বাঁধিয়া, বৃশ্চিকবেত্রে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল; তালবৃক্ষপরিমিতা প্রস্তরময়ী সুন্দবী হস্তোত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল—"মার্! মার্! আমি বারণ কবিয়াছিলাম! আমি নৌকা হইতে ফিরাইতে গিয়াছিলাম, শুনে নাই! মার্! মার্! যত পাবিস্ মার্! আমি উহার পাপের সাক্ষী! মার্! মার্!" শৈবলিনী যুক্তকরে, উন্নত আননে, সজল-নয়নে সুন্দরীকে মিনতি করিতেছে, সুন্দরী শুনিতেছে না; কেবল ডাকিতেছে, "মার্! মাব্! অসতীকে মার্! আমি সতী, ও অসতী মার্! মার্!" শৈবলিনী, আবার সেইরূপ দৃষ্টিস্থির লোচন বিস্ফারিত করিয়া বিশুষ্ক মুখে, স্তম্ভিতের ন্যায় রহিল। চন্দ্রশেখর চিন্তিত হইলেন—বুঝিলেন, লক্ষণ ভাল নহে। বলিলেন, "শৈবলিনী! আমার সঙ্গে আইস।"

প্রথমে শৈবলিনী শুনিতে পাইল না। পরে চন্দ্রশেখর, তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া দুই তিন বার সঞ্চালিত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

সহসা শৈবলিনী দাঁড়াইয়া উঠিল, অতি ভীতস্বরে বলিল, "চল, চল, চল, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, এখান হইতে শীঘ্র চল!" বলিয়াই, বিলম্ব না করিয়া গুহাদ্বারাভিমুখে ছুটিল, চন্দ্রশেখরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিল। দ্রুত চলিতে, গুহার অস্পষ্ট আলোকে পদে শিলাখণ্ড বাজিল; পদস্খলিত হইয়া শৈবলিনী ভূপতিতা হইল। আর শব্দ নাই। চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

তখন চন্দ্রশেখর, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া, যথায় পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অতি ক্ষীণা নির্ঝরিণী নিঃশব্দে জলোদ্গার করিতেছিল—তথায় আনিলেন—মুখে জলসেক করাতে, এবং অনাবৃত স্থানের অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিল—বলিল, "আমি কোথায় আসিয়াছি?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি।"

শৈবলিনী শিহরিল—আবার ভীতা হইল। বলিল, "তুমি কে?"—চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, "কেন এরূপ করিতেছ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন?

শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল,

"স্বামী আমার সোণার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে;
তেকাটাতে এলে, সখা, বুঝি পথ ভুলে?
তুমি কি লরেন্স ফস্টর?"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে দেবীর প্রভাবে এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণমন্দির অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদুস্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, "শৈবলিনী কে? রসো রসো! একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। এক দিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; মেয়েটি ব্যাঙ্ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙ্টিকে গিলিয়া ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। হ্যাঁ গা সাহেব! তুমি কি লরেন্স ফস্টর?"

চন্দ্রশেখর গদ্গদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে? এ কি করিলে?"

শৈবলিনী গীত গাইল,—

"কি করিলে প্রাণসখী, মনচোরে ধরিয়ে,
ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে।"

বলিতে লাগিল, "মনচোর কে? চন্দ্রশেখর। ধরিল কাকে? চন্দ্রশেখরকে। ভাসিল কে? চন্দ্রশেখর। দুই কূল কি? জানি না। তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমিই চন্দ্রশেখর।"

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল— কোন কথা না বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চল্"

শৈবলিনী বলিল, "আমাকে মারিবে না।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনীও উঠিল। চন্দ্রশেখর বিষণ্ণবদনে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—কখন হাসিতে লাগিল—কখন কাঁদিতে লাগিল—কখন গায়িতে লাগিল।

পঞ্চম খণ্ড

প্রচ্ছাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আমিয়টের পরিণাম

মুরশিদাবাদে আসিয়া ইংরেজের নৌকাসকল পৌঁছিল। মীরকাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সম্বাদ আসিল যে, আমিয়ট পৌঁছিয়াছে।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমিয়ট আপ্যায়িত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ পরিশেষে আমিয়টকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন।

আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রফুল্লমনে নহে। এদিকে মহম্মদ তকি, দূরে অলক্ষিতরূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায়।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে, ইংরেজেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্তব্য কি না। গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌ এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্তব্য নহে। সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। আমিয়ট বলিলেন, "যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং অসদ্ভাব যত দূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন আবার ইহাদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহার কি?" আমিয়ট স্থির করিলেন, নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

এদিকে যে নৌকায় দলনী ও কুল্‌সম্‌ বন্দিস্বরূপে সংরক্ষিতা ছিলেন, সে নৌকাতেও নিমন্ত্রণের সম্বাদ পৌঁছিল। দলনী ও কুল্‌সম্‌ কানে কানে কথা কহিতে লাগিল। দলনী বলিল, "কুল্‌সম্‌—শুনিতেছ? বুঝি মুক্তি নিকট।"

কু। কেন?

দ। তুই যেন কিছুই বুঝিস্‌ না; যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে—তাহাদের যে নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার ভিতর কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বুঝি আজি ইংরেজ মরিবে।

কু। তাতে কি তোমার আহ্লাদ হইয়াছে?

দ। নহে কেন? একটা রক্তারক্তি না হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে, তাহারা মরিলে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আমার আহ্লাদ বৈ নাই।

কু। কিন্তু মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমাদের আটক রাখা ভিন্ন ইহাদেব আর কোন অভিসন্ধি দেখা যায় না। আমাদের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য করিতেছে না। কেবল আটক। আমরা স্ত্রীজাতি, যেখানে যাইব, সেইখানেই আটক।

দলনী বড় রাগ করিল। বলিল, "আপন ঘরে আটক থাকিলেও আমি দলনী বেগম, ইংরেজের নৌকায় আমি বাঁদী। তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে, বলিতে পারিস্‌?"

কু। তা ত বলিয়াই রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যেমন হে সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনি নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি। হে সাহেবকে ছাড়িয়া দিলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে সাহেবের কোন অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদেরও অনিষ্ট ঘটিবে; নহিলে ভয় কি?

দলনী আরও রাগিল, বলিল, "আমি তোর হে সাহেবকে চিনি না, তোর ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাই না। ছাড়িয়া দিলেও তুই বুঝি যাইবি না?"

কুল্‌সম্‌ রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিল, "যদি আমি না যাই, তবে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাও?"

দলনীর রাগ বাড়িতে লাগিল, বলিল, "তাও কি সাধ না কি?"

কুল্‌সম্‌ গম্ভীরভাবে বলিল, "কপালের লিখন কি বলিতে পারি?"

দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, বড় জোরে একটা ছোট কিল উঠাইল। কিন্তু কিলটি আপাততঃ পুঁজি করিয়া রাখিল—ছাড়িল্‌ না। দলনী আপন কর্ণের নিকট সেই কিলটি উত্থিত করিয়া—

কৃষ্ণকেশগুচ্ছ সংস্পর্শে যে কর্ণ, সভ্রমর প্রস্ফুট কুসুমবৎ শোভা পাইতেছিল, তাহার নিকট কমল-কোরক তুল্য বদ্ধ মুষ্টি স্থির করিয়া বলিল, "তোকে আমিয়ট দুই দিন কেন ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, সত্য কথা বল্ ত?"

কু। সত্য কথা ত বলিয়াছি, তোমার কোন কষ্ট হইতেছে কি না—তাহাই জানিবার জন্য। সাহেবদিগের ইচ্ছা, যত দিন আমরা ইংরেজের নৌকায় থাকি, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি। জগদীশ্বর করুন, ইংরেজ আমাদের না ছাড়ে।

দলনী কিল আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া বলিল, "জগদীশ্বর করুন, তুমি শীঘ্র মর।"

কু। ইংরেজ ছাড়িলে, আমরা ফের নবাবের হাতে পড়িব। নবাব তোমাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমায় ক্ষমা করিবেন না, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারি। আমার এমন মনে হয় যে, যদি কোথায় আশ্রয় পাই, তবে আর নবাবের হুজুরে হাজির হইব না।

দলনী রাগ ত্যাগ করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, "আমি অনন্যগতি। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।"

এদিকে আমিয়ট আপনার আজ্ঞাধীন সিপাহীগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। জন্সন্ বলিলেন, "এখানে আমরা তত বলবান্ নহি—রেসিডেন্সির নিকট নৌকা লইয়া গেলে হয় না?"

আমিয়ট বলিলেন, "যেদিন, একজন ইংরেজ দেশী লোকের ভয়ে পলাইবে, সেই দিন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে। এখান হইতে নৌকা খুলিলেই মুসলমান বুঝিবে যে, আমরা ভয়ে পলাইলাম। দাঁড়াইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না। কিন্তু ফস্টর পীড়িত। শত্রুহস্তে মরিতে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সিতে যাইতে অনুমতি কর। তাহার নৌকায় বেগম ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে উঠাইয়া দাও। এবং দুই জন সিপাই সঙ্গে দাও। বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক।"

সিপাহীগণ সজ্জিত হইলে, আমিয়টের আজ্ঞানুসারে নৌকার মধ্যে সকলে প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিল। ঝাঁপের বেড়ার নৌকায় সহজেই ছিদ্র পাওয়া যায়, প্রত্যেক সিপাহী এক এক ছিদ্রের নিকটে বন্দুক লইয়া বসিল। আমিয়টের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুল্সম্ ফস্টরের নৌকায় উঠিল। দুই জন সিপাহী সঙ্গে ফস্টরের নৌকা খুলিয়া গেল। দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাঁহাকে সম্বাদ দিতে গেল।

এ সম্বাদ শুনিয়া এবং ইংরেজগণের আসিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, মহম্মদ তকি, ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। আমিয়ট উত্তর করিলেন যে, কারণবশতঃ তাঁহারা নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছু দূরে আসিয়া, একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। সেই শব্দের সঙ্গে, তীর হইতে দশ বারোটা বন্দুকের শব্দ হইল। আমিয়ট দেখিলেন, নৌকার উপর গুলিবর্ষণ হইতেছে এবং স্থানে স্থানে নৌকার ভিতরে গুলি প্রবেশ করিতেছে।

তখন ইংরেজ সিপাহীরাও উত্তর দিল। উভয় পক্ষে, উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়াতে শব্দে বড় হুলস্থূল পড়িল। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। মুসলমানেরা তীরস্থ গৃহাদির অন্তরালে লুক্কায়িত; ইংরেজ এবং তাহাদিগের সিপাহীগণ নৌকামধ্যে লুক্কায়িত। এরূপ যুদ্ধে বারুদ খরচ ভিন্ন অন্য ফলের আশু কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন, মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ও বর্শা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ ইংরেজেরা ভীত হইল না।

স্থির চিত্তে নৌকামধ্য হইতে দ্রুতাবতরণপ্রবৃত্ত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিয়ট, গলস্টন, জন্‌সন্‌, স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতি বাবে এক এক জনে এক এক জন যবনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যেরূপ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবনশ্রেণীর উপর যবনশ্রেণী নামিতে লাগিল। তখন আমিয়ট বলিলেন, 'আব আমাদিগের রক্ষার কোন উপায় নাই। আইস আমরা বিধর্ম্মী নিপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি।''

ততক্ষণে মুসলমানেরা গিয়া আমিয়টের নৌকায় উঠিল। তিন জন ইংরেজ এক ইহযা এককালীন আওয়াজ করিলেন। ত্রিশূলবিভিন্নের ন্যায় নৌকারূঢ় যবনশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নৌকা হইতে জলে পড়িল।

আরও মুসলমান নৌকার উপর উঠিল। আরও কতকগুলা মুসলমান মুদ্গবাদি লইযা নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকাব তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায, কল কল শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট সঙ্গীদিগকে বলিলেন, ''গোমেষাদির ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিব কেন? বাহিরে আইস, বীরের ন্যায় অস্ত্রহস্তে মরি।''

তখন তরবারি হস্তে তিন জন ইংরেজ অকুতোভয়ে, সেই অগণিত যবনগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন যবন, আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, ''কেন মরিবেন? আমাদিগেব সঙ্গে আসুন।''

আমিয়ট বলিলেন, 'মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে, ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদেব রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জ্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।''

''তবে মর।'' এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল। দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গলস্টন সেই পাঠানের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিলেন।

তখন দশ বার জন যবন গলস্টনকে ঘেরিয়া প্রহার করিতে লাগিল। এবং অচিরাৎ, বহু লোকের প্রহারে আহত হইয়া গলস্টন ও জন্‌সন্‌ উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপর শুইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ আবার সেই

তৎপূর্ব্বেই ফস্টর নৌকা খুলিয়া গিয়াছিল।

যখন রামচরণের গুলি খাইয়া লরেন্স ফস্টর গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রতাপ বজরা খুলিয়া গেলে পর, হাতিয়ারের নৌকার মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িযা ফস্টরের দেহের সন্ধান করিয়া উঠাইয়াছিল; সেই নৌকার পাশ দিয়াই ফস্টরের দেহ ভাসিযা যাইতেছিল। তাহারা ফস্টরকে উঠাইয়া নৌকায় রাখিয়া আমিয়টকে সম্বাদ দিয়াছিল।

আমিয়ট সেই নৌকার উপর আসিলেন। দেখিলেন, ফস্টর অচেতন, কিন্তু প্রাণ নির্গত হয় নাই। মস্তিষ্ক ক্ষত হইয়াছিল বলিয়া চেতনা বিনষ্ট হইয়াছিল। ফস্টরের মরিবারই অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। আমিয়ট চিকিৎসা জানিতেন, রীতিমত তাঁহাব চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বকাউল্লার প্রদত্ত সন্ধান মতে, ফস্টরের নৌকা খুঁজিয়া ঘাটে আনিলেন।

ফস্টরের পরমায়ু ছিল-সে চিকিৎসায় বাঁচিল। আবার পরমায়ু ছিল, মুরশিদাবাদে মুসলমান-হস্তে বাঁচিল। কিন্তু এখন সে রুগ্ন—বলহীন—তেজোহীন,—আর সে সাহস—সে দম্ভ নাই। এক্ষণে সে প্রাণভয়ে ভীত, প্রাণভয়ে পলাইতেছিল। মস্তিষ্কের আঘাত জন্য, বুদ্ধিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছিল।

ফস্টর দ্রুত নৌকা চালাইতেছিল—তথাপি ভয়, পাছে মুসলমান পশ্চাদ্ধাবিত হয়। প্রথম সে কাশিমবাজারের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইবে মনে করিয়াছিল—তাহাতে ভয় হইল, পাছে মুসলমান গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। সুতরাং সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিল। এ স্থলে ফস্টর যথার্থ অনুমান করিযাছিল। মুসলমানেরা অচিবাৎ কাশিমবাজারে গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া তাহা লুঠ করিল।

ফস্টর দ্রুতবেগে কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, সৈদাবাদ, বাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। যে কোন নৌকা পশ্চাতে আইসে, মনে করে, যবনের নৌকা আসিতেছে। দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কোন মতেই সঙ্গ ছাড়িল না।

ফস্টর তখন রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভ্রান্ত বুদ্ধিতে নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। একবার মনে করিল যে, নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া পলাই। আবার ভাবিল, পলাইতে পারিব না—আমার সে বল নাই। আবার ভাবিল, জলে ডুবি—আবার ভাবিল, জলে ডুবিলে বাঁচিলাম কই। আবার ভাবিল যে, এই দুইটা স্ত্রীলোককে জলে ফেলিয়া নৌকা হাল্কা কবি—নৌকা আরও শীঘ্র যাইবে।

অকস্মাৎ তাহার এক কুবুদ্ধি উপস্থিত হইল। এই স্ত্রীলোকদিগের জন্য যবনেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। দলনী যে নবাবের বেগম, তাহা সে শুনিয়াছিল—মনে ভাবিল, বেগমের জন্যই মুসলমানেরা ইংরেজের নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না। সে স্থির করিল যে, দলনীকে নামাইয়া দিবে।

দলনীকে বলিল, "ঐ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের পাছু পাছু আসিতেছে দেখিতেছ?"

দলনী বলিল, "দেখিতেছি।"

ফ। উহা তোমাদের লোকের নৌকা,—তোমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।

এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল? কিছুই না, কেবল ফস্টরের বিকৃত বুদ্ধিই ইহার কারণ,—সে রজ্জুতে সর্প দেখিল। দলনী যদি বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে এ কথায় সন্দেহ করিত। কিন্তু যে যাহার জন্য ব্যাকুল হয়, সে তাহার নামেই মুগ্ধ হয়, আশায় অন্ধ হইয়া বিচারে পরাঙ্মুখ হয়। দলনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সে কথায় বিশ্বাস করিল—বলিল, "তবে কেন ঐ নৌকায় আমাদের উঠাইয়া দাও না। তোমাকে অনেক টাকা দিব।"

ফ। আমি তাহা পারিব না। উহারা আমার নৌকা ধরিতে পারিলে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

দ। আমি বারণ করিব।

ফ। তোমার কথা শুনিবে না। তোমাদের দেশের লোক স্ত্রীলোকের কথা গ্রাহ্য করে না।

দলনী তখন ব্যাকুলতাবশতঃ জ্ঞান হারাইল—ভাল মন্দ ভাবিয়া দেখিল না। যদি ইহা নিজামতের নৌকা না হয়, তবে কি হইবে, তাহা ভাবিল না; এ নৌকা যে নিজামতের নহে,

সে কথা তাহার মনে আসিল না। ব্যাকুলতাবশতঃ আপনাকে বিপদে নিক্ষেপ করিল, বলিল, "তবে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও।"

ফস্টর সানন্দে সম্মত হইল। নৌকা তীরে লাগাইতে হুকুম দিল।

কুল্‌সম্ বলিল, "আমি নামিব না। আমি নবাবের হাতে পড়িলে, আমাব কপালে কি আছে বলিতে পাবি না। আমি সাহেবেব সঙ্গে কলিকাতায় যাইব—সেখানে আমাব জানা শুনা লোক আছে।"

দলনী বলিল, "তোর কোন চিন্তা নাই। যদি আমি বাঁচি, তবে তোকেও বাঁচাইব।"

কুল্‌সম্। তুমি বাঁচিলে ত?

কুল্‌সম্ কিছুতেই নামিতে বাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই শুনিল না।

ফস্টর কুল্‌সম্‌কে বলিল, 'কি জানি, যদি তোমার জন্য নৌকা পিছু পিছু আইসে। তুমিও নাম।"

কুল্‌সম্ বলিল, "যদি আমাকে ছাড়, তবে আমি ঐ নৌকায় উঠিয়া, যাহাতে নৌকাওযালারা তোমার সঙ্গ না ছাড়ে, তাহাই করিব।"

ফস্টর ভয় পাইয়া আর কিছু বলিল না—দলনী কুল্‌সমের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া নৌকা হইতে উঠিল। ফস্টর নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। তখন সূর্য্যাস্তের অল্পমাত্র বিলম্ব আছে।

ফস্টরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল। যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফস্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিল, সে নৌকাও নিকটে আসিল। প্রতি ক্ষণে দলনী মনে করিতে লাগিল যে, নৌকা এইবার তাঁহাকে তুলিয়া লইবার জন্য ভিড়িবে; কিন্তু নৌকা ভিড়িল না। তখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না, এই সন্দেহে দলনী অঞ্চল ঊর্দ্ধোত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল। তথাপি নৌকা ফিরিল না। বাহিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় দলনীর চমক হইল—এ নৌকা নিজামতের কিসে সিদ্ধান্ত করিলাম। অপরের নৌকা হইতেও পারে! দলনী তখন ক্ষিপ্তার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সেই নৌকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিল। "এ নৌকায় হইবে না" বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ফস্টরের নৌকা তখন দৃষ্টির অতীত হইযাছিল—তথাপি সে কূলে কূলে দৌড়িল, তাহা ধরিতে পারিবে বলিয়া দলনী কূলে কূলে দৌড়িল। কিন্তু বহুদূরে দৌড়িয়া নৌকা ধরিতে পারিল না। পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—এক্ষণে অন্ধকার হইল। গঙ্গাব উপরে আর কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে কেবল বর্ষাব নববারি-প্রবাহের কলকল ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। তখন হতাশ হইয়া দলনী, উন্মূলিত ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় বসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে দলনী, আর গঙ্গাগর্ভমধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। অন্ধকারে উঠিবার পথ দেখা যায না। দুই একবার পড়িয়া উঠিল। উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, চারি দিক্ চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কোন দিকে কোন গ্রামের কোন চিহ্ন নাই—কেবল অনন্ত প্রান্তর, আর সেই কলনাদিনী নদী; মনুষ্যের ত কথাই নাই—কোন দিকে আলো দেখা যায় না—গ্রাম দেখা যায় না—বৃক্ষ দেখা যায়

না—পথ দেখা যায় না—শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন কোন জন্তু দেখা যায় না—কলনাদিনী নদী-প্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে দেখা যায়। দলনী মৃত্যু নিশ্চয় করিল।

সেইখানে প্রান্তরমধ্যে নদীর অনতিদূরে দলনী বসিল। নিকটে ঝিল্লী রব করিতে লাগিল—নিকটেই শৃগাল ডাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, দলনী মহাভয় পাইয়া দেখিল, সেই প্রান্তরমধ্যে, এক দীর্ঘাকার পুরুষ একা বিচরণ করিতেছে। দীর্ঘাকৃত পুরুষ, বিনা বাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

আবার সেই! এই দীর্ঘাকৃত পুরুষ শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নৃত্যগীত

মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ জগৎশেঠ এবং মাহতাবচন্দ জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তথায় শ্বেতমর্ম্মরবিন্যাসশীতল মণ্ডপমধ্যে, নর্ত্তকীর রত্নাভরণ হইতে সেই অসংখ্য দীপমালারশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল। জলে জল বাঁধে—আর উজ্জ্বলেই উজ্জ্বল বাঁধে। দীপরশ্মি, উজ্জ্বল প্রস্তরস্তম্ভে—উজ্জ্বল স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত মসনদে, উজ্জ্বল হীরকাদি-খচিত গন্ধপাত্রে, শেঠদিগের কণ্ঠবিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তাহারে,—আর নর্ত্তকীর প্রকোষ্ঠ, কণ্ঠ, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জ্বল মধুরে মিশাইতেছিল। উজ্জ্বলে মধুরে মিশিতেছিল! যখন নৈশ নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবর লোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন স্বচ্ছ নীল সরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি, বালসূর্য্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে বিভিন্ন হইতে থাকে, নীল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালার উপর দীর্ঘ রশ্মি সকল নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কল কণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে, ডায়মনকাটা মল-ভানু লুটাইতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন সন্ধ্যাকালে, গগনমণ্ডলে, সূর্য্যতেজ ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন, তোমার গৃহিণী কর্ণাভরণ দোলাইয়া তিরস্কার করিতে করিতে তোমার পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন চন্দ্র-কিরণ-প্রদীপ্ত গঙ্গাজলে বায়ু-প্রপীড়নে সফেন তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চাঁদের আলোতে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন স্পার্ক্লিংশ্যাম্পেন তরঙ্গ তুলিয়া স্ফটিকপাত্রে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দক্ষিণ বায়ু মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন সন্দেশময় ফলাহারের পাতে, রজত মুদ্রা দক্ষিণা মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন প্রদীপমালার আলোকে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া, রমণী সঙ্গীত করে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল—কিন্তু শেঠদিগের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই মিশিল না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে মিশিল, গুর্‌গণ খাঁ।

বাঙ্গালা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই

পাটনার এলিস্ সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু মুঙ্গের হইতে মুসলমান সৈন্য প্রেরিত হইয়া, পাটনাস্থিত মুসলমান সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া, পাটনা পুনর্ব্বার মীরকাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। এলিস্ প্রভৃতি পাটনাস্থিত ইংরেজেরা মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া, মুঙ্গেরে বন্দিভাবে আনীত হয়েন। এক্ষণে উভয় পক্ষে প্রকৃতভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুর্‌গণ খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্য গীত উপলক্ষ মাত্র—জগৎশেঠেরা বা গুর্‌গণ খাঁ কেহই তাহা শুনিতেছিলেন না। সকলে যাহা করে, তাঁহারাও তাহাই করিতেছিলেন। শুনিবার জন্য কে কবে সঙ্গীতের অবতারণা করায়?

গুর্‌গণ খাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—তিনি মনে করিলেন যে, উভয় পক্ষ বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইলে, তিনি উভয় পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলাষ সিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সেনাগণ তাঁহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বশীভূত হইবে না—শেঠকুবেরগণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব শেঠদিগের সঙ্গে পরামর্শ গুর্‌গণ খাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এদিকে, কাসেম আলি খাঁও বিলক্ষণ জানিতেন যে, যে পক্ষকে এই কুবেরযুগল অনুগ্রহ করিবেন, সেই পক্ষ জয়ী হইবে। জগৎশেঠেরা যে মনে মনে তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন; কেন না, তিনি তাহাদিগের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। সন্দেহবশতঃ তাহাদিগকে মুঙ্গেরে বন্দিস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। তাহারা সুযোগ পাইলেই তাঁহার বিপক্ষের সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা স্থির করিয়া তিনি শেঠদিগকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শেঠেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তাহারা ভয়প্রযুক্ত মীরকাসেমের প্রতিকূলে কোন আচরণ করেন নাই; কিন্তু এক্ষণে অন্যথা রক্ষার উপায় না দেখিয়া, গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে মিলিল। মীরকাসেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিনা কারণে জগৎশেঠদিগের সঙ্গে গুর্‌গণ খাঁ দেখা সাক্ষাৎ করিলে, নবাব সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন বিবেচনায়, জগৎশেঠেরা এই উৎসবের সৃজন করিয়া, গুর্‌গণ এবং অন্যান্য রাজামাত্যবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

গুর্‌গণ খাঁ নবাবের অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য অমাত্যগণ হইতে পৃথক বসিয়াছিলেন। জগৎশেঠেরা যেমন সকলের নিকট আসিয়া এক একবার আলাপ করিতেছিলেন—গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে সেইরূপ মাত্র —অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতেছিলেন না। কিন্তু কথাবার্ত্তা অন্যের অশ্রাব্য স্বরে হইতেছিল। কথোপকথন এইরূপ—

গুর্‌গণ খাঁ বলিতেছেন, "আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুঠি খুলিব—আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন?"

মাহতাবচন্দ। কি মত?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্য।

মাহ। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার না আরম্ভ করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

গুর্‌গণ খাঁ বলিলেন, "যদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকার আঞ্জামটা আপনাদিগের করিতে হইবে—আমি শারীরিক পরিশ্রম করিব।"

সেই সময়ে মনিয়া বাই নিকটে আসিয়া সনদী খেয়াল গাইল,—"শিখে হো ছল ভালা"

ইত্যাদি। শুনিয়া মাহতাব হাসিয়া বলিলেন, "কাকে বলে? যাক্—আমরা রাজি আছি—আমাদের মূলধন সুদে আসলে বজায় থাকিলেই হইল—কোন দায়ে না ঠেকি।"

এইরূপে এক দিকে বাইজি কেদার, হাম্বির, ছায়ানট ইত্যাদি রাগ ঝাড়িতে লাগিল, আর এক দিকে গুর্‌গণ খাঁ ও জগৎশেঠ রূপেয়া, নোক্‌সান, দশনী প্রভৃতি ছেঁদো কথায় আপনাদিগের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইলে গুর্‌গণ বলিতে লাগিলেন, "একজন নূতন বণিক কুঠি খুলিতেছে, কিছু শুনিয়াছেন?"

মাহ। না—দেশী না বিলাতী?

গুর্। দেশী।

মাহ। কোথায়?

গুর্। মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানে। যেখানে পাহাড় যেখানে জঙ্গল, যেখানে মাঠ, সেইখানে তাহার কুঠি বসিতেছে।

মাহ। ধনী কেমন?

গুর্। এখনও বড় ভারী ধনী নয়—কিন্তু কি হয় বলা যায় না।

মাহ। কার সঙ্গে তাহার লেনদেন?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠির সঙ্গে।

মাহ। হিন্দু না মুসলমান?

গুর্। হিন্দু।

মাহ। নাম কি?

গুর্। প্রতাপ রায়।

মাহ। বাড়ী কোথায়?

গুর্। মুরশিদাবাদের নিকট।

মাহ। নাম শুনিয়াছি—সে সামান্য লোক।

গুর্। অতি ভয়ানক লোক।

মাহ। কেন সে হঠাৎ এ প্রকার করিতেছে?

গুর্। কলিকাতার বড় কুঠির উপর রাগ।

মাহ। তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে—সে কিসের বশ?

গুর্। কেন সে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা না জানিলে বলা যায় না। যদি অর্থলোভে বেতনভোগী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কিনিতে কতক্ষণ? জমিজমা তালুক মুলুকও দিতে পারি। কিন্তু যদি ভিতরে আর কিছু থাকে?

মাহ। আর কি থাকিতে পারে? কিসে প্রতাপ রায় এত মাতিল?

বাইজি সে সময়ে গাহিতেছিল, "গোরে গোরে মুখ পরা বেশর শোহে।"

মাহতাবচন্দ্র বলিলেন, "তাই কি? কার গোরা মুখ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দলনী কি করিল?

মহাকায় পুরুষ দলনীর পাশে আসিয়া বসিল।

দলনী কাঁদিতেছিল, ভয় পাইয়া রোদন সম্বরণ করিল, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। আগন্তুকও নিঃশব্দে রহিল।

যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীব আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল।

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে, বেগম কাজে কাজেই তাঁহার হস্তগতা হইবেন। সুতরাং অনুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। পরে যখন মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইযা, কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইযা, মহম্মদ তকি সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। লোকপরম্পরায় তখন শুনা যাইতেছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজেরা মীরজাফরকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার মস্‌নদে বসাইবেন। যদি ইংরেজেরা যুদ্ধজয়ী হয়েন, তবে মীরকাসেম এ প্রবঞ্চনা শেষে জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ বাঁচিতে পারিলেই অনেক লাভ। পরে যদিই মীরকাসেম জয়ী হয়েন, তবে তিনি যাহাতে প্রকৃত ঘটনা কখন না জানিতে পারেন, এমত উপায় করা যাইতে পারে। আপাততঃ কোন কঠিন আজ্ঞা না আসে। এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া তকি এই রাত্রে নবাবের সমীপে মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ এক আরজি পাঠাইতেছিলেন।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তকি তাঁহাকে আনিয়া যথাসম্মানপূর্ব্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে হুজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইংরেজদিগের সঙ্গী খানসামা, নাবিক, সিপাহী পভৃতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে, বেগম আমিয়টের উপপত্নীস্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং এ সকল কথা স্বীকার করিতেছেন। তিনি এক্ষণে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত। বলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কলিকাতায় গিয়া আমিয়ট সাহেবের সুহৃদ্‌গণের নিকট বাস করিব। যদি না ছাড়িয়া দাও, তবে আমি পলাইয়া যাইব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও, তবে আত্মহত্যা করিব।" এমত অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন. কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। তকি এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন।

অশ্বারোহী দূত সেই রাত্রেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল।

কেহ কেহ বলে, দূরবর্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে। এ কথা যে সত্য, এমন নহে; কিন্তু যে মুহূর্তে মুরশিদাবাদ হইতে অশ্বারোহী দূত, দলনীবিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল, সেই মুহূর্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সেই মুহূর্তে তাঁহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, প্রথম কথা কহিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে হউক, অমঙ্গলসূচনায় হউক, যাহাতে হউক, সেই মুহূর্তে দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল।

পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষ বলিল, "তোমায় চিনি। তুমি দলনী বেগম।"

দলনী শিহরিল।

পার্শ্বস্থ পুরুষ পুনরপি কহিল, "জানি, তুমি এই বিজন স্থানে দুরাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ।"

দলনীর চক্ষের প্রবাহ আবার ছুটিল। আগন্তুক কহিল, "এক্ষণে তুমি কোথা যাইবে?

সহসা দলনীর ভয় দূর হইয়াছিল। ভয় বিনাশের দলনী বিশেষ কারণ পাইয়াছিল। দলনী কাঁদিল। প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন পুনরপি করিলেন। দলনী বলিল, "যাইব কোথায়? আমার যাইবার স্থান নাই। এক যাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেক দূর। কে আমাকে সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইবে?"

আগন্তুক বলিলেন, "তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পবিত্যাগ কর।'

দলনী উৎকণ্ঠিতা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "কেন?"

"অমঙ্গল ঘটিবে।"

দলনী শিহরিল, বলিল, "ঘটুক। সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।"

"তবে উঠ। আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। মহম্মদ তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমার কথা শুন। এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তুমি সেখানে যাইও না।"

"আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাইব।"

"তোমার কপালে মুঙ্গের দর্শন নাই।"

দলনী চিন্তিত হইল। বলিল, "ভবিতব্য কে জানে? চলুন, আপনার সঙ্গে আমি মুরশিদাবাদে যাইব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "তাহা জানি। আইস।"

দুই জনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদে চলিল। দলনী-পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল।

ষষ্ঠ খণ্ড

সিদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ব্বকথা

পূর্ব্বকথা যাহা বলি নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব। চন্দ্রশেখরই যে পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মচারী, তাহা জানা গিয়াছে।

যেদিন আমিয়ট, ফস্টরের সহিত, মুঙ্গের হইতে যাত্রা করিলেন, সেই দিন সন্ধান করিতে করিতে রমানন্দ স্বামী জানিলেন যে, ফস্টর ও দলনীবেগম প্রভৃতি একত্রে আমিয়টের সঙ্গে গিয়াছেন। গঙ্গাতীরে গিয়া চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাকে এ সংবাদ অবগত করাইলেন, বলিলেন, "এখানে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন কি—কিছুই না। তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন কর। শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাইব। তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ, অদ্য হইতে তাহার কার্য্য কর। এই যবনকন্যা, ধর্ম্মিষ্ঠা, এক্ষণে বিপদে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহার পশ্চাদনুসরণ কর; যখনই পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপায় করিও। প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী, তোমার জন্যই এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত; তাহাকে এ সময়ে

ত্যাগ করিতে পারিবে না। তাহাদের অনুসরণ কর।" চন্দ্রশেখর নবাবের নিকট সম্বাদ দিতে চাহিলেন, রমানন্দ স্বামী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "আমি সেখানে সম্বাদ দেওয়াইব।" চন্দ্রশেখর গুরুর আদেশে, অগত্যা, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া আমিয়টের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামীও সেই অবধি, শৈবলিনীকে কাশী পাঠাইবার উদ্যোগে উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অকস্মাৎ জানিলেন যে, শৈবলিনী পৃথক্ নৌকা লইয়া ইংরেজের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রমানন্দ স্বামী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন! এ পাপিষ্ঠা কাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, ফস্টরের না চন্দ্রশেখরের? রমানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন, "বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আবার আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।" এই ভাবিয়া তিনিও সেই পথে চলিলেন।

রমানন্দ স্বামী, চিরকাল পদব্রজে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন,—উৎকৃষ্ট পরিব্রাজক। তিনি তটপন্থে, পদব্রজে, শীঘ্রই শৈবলিনীকে পশ্চাৎ করিয়া আসিলেন; বিশেষ তিনি আহার নিদ্রার বশীভূত নহেন, অভ্যাসগুণে সে সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ক্রমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে ধরিলেন। চন্দ্রশেখর তীরে রমানন্দ স্বামীকে দেখিয়া, তথায় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "একবারও নবদ্বীপে, অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বঙ্গদেশে যাইব, অভিলাষ করিয়াছি; চল তোমার সঙ্গে যাই।" এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরের নৌকায় উঠিলেন।

ইংরেজের বহর দেখিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র তরণী নিভৃতে রাখিয়া তীরে উঠিলেন। দেখিলেন, শৈবলিনীর নৌকা আসিয়াও, নিভৃতে রহিল। তাঁহারা দুই জনে তীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রতাপ শৈবলিনী সাঁতার দিয়া পলাইল। দেখিলেন, তাহারা নৌকায় উঠিয়া পলাইল। তখন তাঁহারাও নৌকায় উঠিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাহারা নৌকা লাগাইল, দেখিয়া তাঁহারাও কিছু দূরে নৌকা লাগাইলেন। রমানন্দ স্বামী অনন্তবুদ্ধিশালী,—চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "সাঁতার দিবার সময় প্রতাপ ও শৈবলিনীতে কি কথোপকথন হইতেছিল, কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে?"

চ। না।

র। তবে, অদ্য রাত্রে নিদ্রা যাইও না। উহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

উভয়ে জাগিয়া রহিলেন। দেখিলেন, শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হইতে উঠিয়া গেল। ক্রমে তীরবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। প্রভাত হয়, তথাপি ফিরিল না। তখন রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার মনে কি আছে। চল, উহার অনুসরণ করি।"

তখন উভয়ে সতর্কভাবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার পর মেঘাড়ম্বর দেখিয়া রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তোমার বাহুতে বল কত?"

চন্দ্রশেখর, হাসিয়া, একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর এক হস্তে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "উত্তম। শৈবলিনীর নিকটে গিয়া অন্তরালে বসিয়া থাক, শৈবলিনী আগতপ্রায় বাত্যায় সাহায্য না পাইলে স্ত্রীহত্যা হইবে। নিকটে এক গুহা আছে। আমি তাহার পথ চিনি। আমি যখন বলিব, তখন তুমি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিও।"

চ। এখনই ঘোরতর অন্ধকার হইবে, পথ দেখিব কি প্রকারে?

র। আমি নিকটেই থাকিব। আমার এই দণ্ডাগ্রভাগ তোমার মুষ্টিমধ্যে দিব। অপর ভাগ আমার হস্তে থাকিবে।

শৈবলিনীকে গুহায় রাখিয়া, চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলে, রমানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন, "আমি এতকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন কবিলাম, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?" এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "নিকটে এক পার্ব্বত্য মঠ আছে, সেইখানে অদ্য গিয়া বিশ্রাম কর। শৈবলিনীর পক্ষে যৎকর্ত্তব্য সাধিত হইলে তুমি পুনরপি যবনীর অনুসরণ করিবে। মনে জানিও, পরহিত ভিন্ন তোমার ব্রত নাই। শৈবলিনীর জন্য চিন্তা করিও না, আমি এখানে রহিলাম। কিন্তু তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি যদি আমার মতে কার্য্য কর, তবে শৈবলিনীর পরমোপকার হইতে পারে।"

এই কথার পর চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রমানন্দ স্বামী তাহাব পর, অন্ধকারে, অলক্ষ্যে, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর যাহা ঘটিল, পাঠক সকলই জানেন।

উন্মাদগ্রস্ত শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দ স্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে?"

রমানন্দ স্বামী, শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। চিন্তা করিও না। তুমি এইখানে দুই এক দিন বিশ্রাম কর। পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও। যে গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইহাকে রাখিও। যাঁহারা ইহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ইহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিও। প্রতাপকেও সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

গুরুর আদেশ মত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ হুকুম

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুর্‌গণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্ব্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সম্বাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না। মীরকাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।"

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকটে গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি খাঁ সাহেব! আমাকে বেইজ্জৎ করিতেছেন কেন?"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন।"

দলনী হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল?"

মহম্মদ তকি বলিলেন, "না বিশ্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন।"

দ। তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই।

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের সহিমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন। দলনী পরওয়ানা পড়িয়া, হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? মরিবে সেই জন্য?"

মহ। আপনি ভীতা হইবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি।

দ। ও হো! তোমার কিছু মতলব আছে! তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?

মহ। তবে শুনুন। আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি আমিয়টের নৌকায় তাহার উপপত্নীস্বরূপ ছিলেন, সেই জন্য এই হুকুম আসিয়াছে।

শুনিয়া দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। স্থিরবারিশালিনী ললাট-গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল—ভ্রূধনুতে চিন্তা-গুণ দিল—মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদ গণিল। দলনী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছিলেন? মহম্মদ তকি আনুপূর্ব্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

তখন দলনী বলিলেন, "দেখি, পরওয়ানা আবার দেখি।"

মহম্মদ তকি পরওয়ানা আবার দলনীর হস্তে দিল। দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন, যথার্থ বটে। জাল নহে। "কই বিষ?"

"কই বিষ?" শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "বিষ কেন?"

দ। পরওয়ানায় কি হুকুম আছে?

মহ। আপনারে বিষপান করাইতে।

দ। তবে কই বিষ?

মহ। আপনি বিষপান করিবেন না কি?

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না?

মহম্মদ তকি মর্ম্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, 'যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন, "যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিল। সুন্দরী—নবীনা—সবে মাত্র যৌবন-বর্ষায় রূপের নদী পুরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গ-মুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত বর্ষায় একত্রে মিশিয়াছে। যাকে দেখিতেছি—সে দুঃখে ফাটিতেছে—কিন্তু আমার দেখিয়া কত সুখ! জগদীশ্বর! দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন? এই যে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত, প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ-নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব? সয়তান আসিয়া তকির কানে কানে বলিল,—"হৃদয়মধ্যে।"

তকি বলিল, "শুন সুন্দরী—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।"

শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন।

মহম্মদ তকির বিষ দান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, [illegible]ত চাহিতে চাহিতে ধীরে, ধীরে ফিরিয়া গেল।

তখন দলনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"ও রাজরাজেশ্বর! শাহান্‌শাহা! বাদশাহের বাদশাহ! এ গরীব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ! বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা! হে রাজাধিরাজ—জগতের আলো-অনাথার ভরসা—পৃথিবীপতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার সাগর—কোথায় রহিলে? আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার দুঃখ।"

করিমন নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের পবিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। তাহাকে ডাকিয়া, দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "লুকাইয়া হকিমের নিকট হইতে আমাকে এমত ঔষধ আনিয়া দাও, যেন আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙ্গে। মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাকি যাহা থাকে, তুমি লইও।"

করিমন, দলনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া বুঝিল। প্রথমে সে সম্মত হইল না—দলনী পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। শেষে মূর্খ লুব্ধ স্ত্রীলোক, অধিক অর্থের লোভে, স্বীকৃত হইল।

হকিম ঔষধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সম্বাদ দিল,—"করিমন বাঁদি আজ এই মাত্র হকিম মেরজা হবীবের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছে।"

মহম্মদ তকি করিমনকে ধরিলেন। করিমন স্বীকার করিল। বলিল, "বিষ দলনী বেগমকে দিয়াছি।"

মহম্মদ তকি শুনিয়াই দলনীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন, দলনী আসনে ঊর্ধ্বমুখে, ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে, যুক্তকরে বসিয়া আছে—বিস্ফারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জল-ধারার পর জলধারা গণ্ড বহিয়া বস্ত্রে আসিয়া পড়িতেছে—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছে।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের পাত্র পড়িয়া আছে?"

দলনী বলিলেন, "ও বিষ। আমি তোমার মত নিমকহারাম নহি—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। তোমার উচিত—অবশিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে, ধীরে, শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সম্রাট্ ও বরাট

মীরকাসেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হঠিয়া আসিয়াছিল। ভাঙ্গা কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল—আবার যবনসেনা, ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুঃপার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিলেন।

মীরকাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমীর হোসেন একদা

জানাইল যে, একজন বন্দী তাঁহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর। তাহার কোন বিশেষ নিবেদন আছে—হুজুরে নহিলে তাহা প্রকাশ করিবে না।

মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কে?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "একজন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারন্ হেস্টিংস সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বাস্তবিক বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অপরাধ হইয়া থাকে, গোলাম হাজির আছে"। এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয়া নবাবকে শুনাইলেন।

ওয়ারেন্ হেস্টিংস লিখিয়াছেন, "এ স্ত্রীলোক কে, তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভাল মন্দ কিছু জানি না।"

নবাব পত্র শুনিয়া, স্ত্রীলোককে সম্মুখে আনিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন—নবাব দেখিলেন—কুল্‌সম্।

নবাব রুষ্ট হইযা তাহাকে বলিলেন, "তুই কি চাহিস্ বাঁদী—মরিবি—?"

কুল্‌সম্ নবাবের প্রতি স্থিব দৃষ্টি করিয়া কহিল, "নবাব! তোমার বেগম কোথায়! দলনী বিবি কোথায়!" আমীর হোসেন কুল্‌সমের বাক্যপ্রণালী দেখিয়া ভীত হইল এবং নবাবকে অভিবাদন করিয়া সরিয়া গেল।

মীরকাসেম বলিলেন, "যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও সেইখানে শীঘ্র যাইবে।"

কুল্‌সম্ বলিল, আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। পথে শুনিলাম, লোকে রটাইতেছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছে। সত্য কি?"

নবাব। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার দুষ্কর্ম্মের সহায়—তুই কুক্কুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি—

কুল্‌সম্ আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এবং যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারি দিক্ হইতে সৈনিক, ওমরাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রভৃতি অসিয়া পড়িল—একজন কুল্‌সমের চুল ধরিযা তুলিতে গেল। নবাব নিষেধ করিলেন—তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সরিয়া গেল। তখন কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল। 'আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলিব, শুনন। আমার এক্ষণই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না। এই সময় শুনুন।"

"শুনুন, সুবে বাঙ্গালা বেহারের, মীরকাসেম নামে, এক মূর্খ নবাব আছে। দলনী নামে তাহার বেগম ছিল। সে নবাবের সেনাপতি গুর্‌গণ খাঁর ভগিনী।"

শুনিয়া কেহ আর কুল্‌সমের উপর আক্রমণ করিল না। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল—সকলেরই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। নবাবও কিছু বলিলেন না—কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "গুর্‌গণ খাঁ ও দৌলত উন্নেছা ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন মীরকাসেমেব গৃহে বাঁদীস্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।"

কুল্‌সম্ তাহার পরে, যে রাত্রে তাহারা দুই জনে গুর্‌গণ খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে, প্রত্যাবর্তন আর নিষেধ, ব্রহ্মচারীর সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি, ইংরেজগণকৃত আক্রমণ এবং শৈবলিনীভ্রমে দলনীকে হরণ, নৌকায় কারাবাস, আমিয়ট প্রভৃতির মৃত্যু, ফস্টরের সহিত তাহাদিগের পলায়ন, শেষে দলনীকে গঙ্গাতীরে ফস্টরকৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল, "আমার স্কন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব? আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম—সে কথা যাউক। মনে করিয়াছিলাম, নিজামতের নৌকা পশ্চাৎ আসিতেছে—বেগমকে তুলিয়া লইবে—নহিলে আমি তাঁহাকে ছাড়িব কেন? কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইয়াছি— বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফস্টরকে সাধিয়াছি যে, আমাকেও নামাইয়া দাও—সে নামাইয়া দেয় নাই। কলিকাতায় গিয়া যাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকেই সাধিয়াছি যে, আমাকে পাঠাইয়া দাও —কেহ কিছু বলে নাই। শুনিলাম, হেষ্টিংস্ সাহেব বড় দয়ালু—তাঁহার কাছে কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলাম—তাঁহারই কৃপায় আসিয়াছি। এখন তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর—আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।"

এই বলিয়া কুল্‌সম্ কাঁদিতে লাগিল।

বহুমূল্য সিংহাসনে, শত শত রশ্মি-প্রতিঘাতী রত্নরাজির উপরে বসিয়া, বাঙ্গালার নবাব,—অধোবদনে। এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড তাঁহার হস্ত হইতে ত স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—বহু যত্নেও ত রহিল না। কিন্তু যে অজেয় রাজ্য, বিনা যত্নে থাকিত—সে কোথায় গেল। তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কণ্টকে যত্ন করিযাছেন—কুল্‌সম্ সত্যই বলিয়াছে—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ!

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব"—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর, প্রবাহমধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া মীরকাসেম বলিতে লাগিলেন,—"শুন বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজউদ্দৌল্লার ন্যায়, ইংরেজ বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব—"

আলি ইব্রাহিম খাঁ?"

ইব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন। নবাব বলিলেন, "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

ইব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া তাম্বুর বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, "আর কেহ আমার উপকার করিবে?"

সকলেই যোড়হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, "কেহ সেই ফস্টরকে আনিতে পার?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে কলিকাতায় চলিলাম।"

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, "আর সেই শৈবলিনী কে? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে?"

মহম্মদ ইর্‌ফান যুক্তকরে নিবেদন করিল, "অবশ্য এত দিন সে দেশে আসিয়া থাকিবে, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া মহম্মদ ইর্‌ফান বিদায় হইল।

তাহার পরে নবাব বলিলেন, "যে ব্রহ্মচারী মুঙ্গেরে বেগমকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাঁহাব কেহ সন্ধান করিতে পার?"

মহম্মদ ইর্‌ফান বলিল, "হুকুম হইলে শৈবলিনীর সন্ধানের পব ব্রহ্মচাবীর উদ্দেশে মুঙ্গের যাইতে পারি।"

শেষ কাসেম আলি বলিলেন, "গুর্‌গণ খাঁ কত দূর?"

অমাত্যবর্গ বলিলেন, "তিনি ফৌজ লইয়া উদয়নালায় আসিতেছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পৌঁছেন নাই।" নবাব মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, "ফৌজ! ফৌজ! কাহার ফৌজ!"

একজন কে চুপি চুপি বলিলেন, "তাঁরি!"

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া 'দলনী! দলনী!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এ সংসারে নবাবি এইরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ জন্‌ স্ট্যালকার্ট

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কুল্‌সমের সঙ্গে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্‌সম্‌ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফস্টরের কার্য্য সকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ইতিহাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কর্ম্মঠ লোক কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক সময়ে পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্যরক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্য রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয় সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহাবা ওয়ারেন্‌ হেস্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে সক্ষম তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাঁহার দ্বাবা রাজ্যস্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেন না, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।

ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তখন তিনি গবর্ণর হন নাই। কুল্‌সম্‌কে বিদায় করিয়া তিনি ফস্টরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, ফস্টর পীড়িত। প্রথমে তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। ফস্টর উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিল।

তাহার পরে, তাহার অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীত হইয়া, ফস্টর তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ কৌন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফস্টরকে

পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংসের ইচ্ছা ছিল যে, ফস্টরকে বিচারালয়ে উপস্থিত করেন; কিন্তু সাক্ষীদিগের কোন সন্ধান নাই, এবং ফস্টরও নিজকার্য্যের অনেক ফলভোগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাতে বিরত হইলেন।

ফস্টর তাহা বুঝিল না। ফস্টর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। সে মনে করিল, তাহার লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। সে ক্ষুদ্রাশয়, অপরাধী ভৃত্যদিগের স্বভাবানুসারে পূর্ব্বপ্রভুদিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইল। তাহাদিগের বৈরিতাসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ডাইস্ সম্বর নামে একজন সুইস্ বা জার্ম্মান মীরকাসেমের সেনাদলমধ্যে সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়-নালায় যবন-শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফস্টর উদয়নালায় তাঁহার নিকট আসিল। প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমরু মনে ভাবিল, ইহা দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমরু ফস্টরকে গ্রহণ করিল। ফস্টর আপন নাম গোপন করিয়া, জন্ ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া সমরুর শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আমীর হোসেন ফস্টরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত তখন লরেন্স ফস্টর সমরুর তাম্বুতে।

আমীর হোসেন, কুল্‌সম্‌কে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফস্টরের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অনুচরবর্গের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, একজন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান সৈন্যভুক্ত হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমীর হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

যখন আমীর হোসেন্ সমরুর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফস্টর একত্রে কথাবার্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করিলে সমরু জন ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া তাঁহার নিকট ফস্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ষ্ট্যালকার্টের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমীর হোসেন, অন্যান্য কথার পর ষ্ট্যালকার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন "লরেন্স ফস্টর নামক একজন ইংরেজকে আপনি চিনেন?"

ফস্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকাপানে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃত কণ্ঠে কহিল, "লরেন্স ফস্টর? কই—না।"

আমীর হোসেন, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন তাহার নাম শুনিয়াছেন?"

ফস্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল, "নাম—লরেন্স ফস্টর—হাঁ—কই? না।"

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ষ্ট্যাল্‌কার্ট আর ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না। দুই একবার উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমীর হোসেন অনুরোধ করিয়া তাহাকে বসাইলেন। আমীর হোসেনের মনে হইতেছিল যে, এ ফস্টরের কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না।

ফস্টর কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার টুপি লইয়া মাথায় দিয়া বসিল। আমীর হোসেন জানিতেন যে, এটি ইংরেজদিগের নিয়মবহির্ভূত কাজ। আরও, যখন ফস্টর টুপি মাথায় দিতে যায়, তখন তাহার শিরস্থ কেশশূন্য আঘাত-চিহ্নের উপর দৃষ্টি পড়িল। ষ্ট্যালকার্ট কি আঘাত-চিহ্ন ঢাকিবার জন্য টুপি মাথায় দিল?

আমীর হোসেন বিদায় হইলেন। আপন শিবিরে আসিয়া কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন, তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।" কুল্‌সম্ তাঁহার সঙ্গে গেল।

কুল্সম্‌কে সঙ্গে লইয়া আমীব হোসেন পুনর্ব্বাব সমরুব তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। কুল্সম্‌ বাহিরে রহিল। ফস্টর তখন সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনাব অনুমতি হয়, তবে আমার একজন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে। বিশেষ কার্য্য আছে।"

সমরু অনুমতি দিলেন। ফস্টবেব হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান করিল। আমীব হোসেন হাসিয়া হাত ধবিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। কুল্সম্‌কে ডাকিলেন। কুল্সম্‌ আসিল। ফস্টবকে দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীব হোসেন কুল্সম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ?"

কুল্সম্‌ বলিল, "লরেন্স ফস্টর।"

আমীর হোসেন ফস্টরেব হাত ধরিলেন। ফস্টর বলিল, "আমি কি কবিয়াছি?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারীর জন্য নবাব নাজিমেব অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।" সমরু সঙ্গে প্রহরী দিলেন, আমীব হোসেন ফস্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ আবার বেদগ্রামে

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশ বাঁখারি পাড়ার লোক পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে—উরগজাতি নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ কবিতেছে। ঘরের কপাট সকল চোরে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘর খোলা—ঘরে দ্রব্যসামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া গিয়াছে—কতক সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিযা তুলিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া জল বসিয়াছে। কোথাও পচিয়াছে, কোথাও ছাতা ধরিয়াছে। ইন্দুর, আরসুলা, বাদুড় পালে পালে বেড়াইতেছে। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর হাত ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিরীক্ষণ করিলেন যে, ঐখানে দাঁড়াইয়া, পুস্তকরাশি ভস্ম করিযাছিলেন। চন্দ্রশেখব ডাকিলেন, "শৈবলিনি।"

শৈবলিনী কথা কহিল না; কক্ষদ্বারে বসিয়া পূর্ব্বস্বপ্নদৃষ্ট কববীব প্রতি নিরীক্ষণ কবিতেছিল। চন্দ্রশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল না—বিস্ফারিত-লোচনে চারি দিক্‌ দেখিতেছিল—একটু একটু টিপি টিপি হাসিতেছিল—একবার স্পষ্ট হাসিযা অঙ্গুলির দ্বারা কি দেখাইল।

এদিকে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিযাছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। দেখিল, চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারীর বেশ। শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "তা, ওকে এনেছ, বেশ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল।"

কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছে, তবু শৈবলিনী সরিলও না, ঘোমটাও টানিল না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। সুন্দরী ভাবিল, "এ বুঝি ইংরেজি ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের সংসর্গে শিখিয়া আসিয়াছে!" এই ভাবিয়া শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড়ে না ঠেকে। হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, "কি লা! চিনতে পারিস্?"

শৈবলিনী বলিল, "পারি—তুই পার্ব্বতী।"

সুন্দরী বলিল, "মরণ আর কি, তিন দিনে ভুলে গেলি?"

শৈবলিনী বলিল, 'ভুলব কেন লো—সেই যে তুই আমার ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেরে গুঁড়া নাড়া কল্লুম। পার্ব্বতী দিদি একটি গীত গা না?

আমার মরম কথা তাই লো তাই।
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ?
মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাঁদ।

কিছু ঠিক পাই নে পার্ব্বতী দিদি—কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আসবে—সে যেন আসে না—কোথা যেন এয়েছি, সেখানে যেন আসি নাই—কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি না।"

সুন্দরী বিস্মিতা হইল।—চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন। সুন্দরী নিকটে আসিলে তাহার কর্ণে বলিলেন, "পাগল হইয়া গিয়াছে।"

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্চকে হইল, তার পরে পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জলবিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর এক দিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকাসহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিল—ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না। শৈবলিনীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে নাই।—তাহা হইলে পার্ব্বতী নাম মনে পড়িবে কেন? কিন্তু প্রকৃত কথা মনে পড়ে না—বিকৃত হইয়া, বিপরীতে বিপরীত সংলগ্ন হইয়া মনে আসে। সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না।

সুন্দরী, প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইলে পরে সেই ভগ্ন গৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, প্রতিবাসিনীরা একে একে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল; আবশ্যক সামগ্রী সকল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এদিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন।

ত্বরায় তাঁহাকে দেখিতে বেদগ্রামে আসিলেন।

সেই দিন রমানন্দ স্বামীও সেই স্থানে পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিলেন। আহ্লাদ সহকারে সুন্দরী শুনিলেন যে, রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে, চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ঔষধ প্রয়োগের শুভ লগ্ন অবধারিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ যোগবল না PSYCHIC FORCE?

ঔষধ কি, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য, চন্দ্রশেখর বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সহজে জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অন্যাপেক্ষা তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশনব্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয় দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন—পারমার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।

অবধারিত কালে চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈবলিনীর জন্য, শয্যা রচনা করিতে বলিলেন; সুন্দরীর নিযুক্তা পরিচারিকা শয্যা রচনা করিয়া দিল।

চন্দ্রশেখর তখন সেই শয্যায় শৈবলিনীকে শুয়াইতে অনুমতি করিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক শয়ন করাইল—শৈবলিনী সহজে কথা শুনে না। সুন্দরী গৃহে গিয়া স্নান করিবে—প্রত্যহ করে।

চন্দ্রশেখর তখন সকলকে বলিলেন, "তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবামাত্র আসিও।"

সকলে বাহিরে গেলে, চন্দ্রশেখর করস্থ ঔষধপাত্র মাটিতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে বলিলেন, "উঠিয়া বস দেখি।"

শৈবলিনী, মৃদু মৃদু গীত গায়িতে লাগিল—উঠিল না। চন্দ্রশেখর স্থিরদৃষ্টিতে তাহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে গণ্ডূষ গণ্ডূষ করিয়া এক পাত্র হইতে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, "ঔষধ আর কিছু নহে, কমণ্ডলুস্থিত জলমাত্র। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ইহাতে কি হইবে?" স্বামী বলিয়াছিলেন, "কন্যা ইহাতে যোগবল পাইবে।"

তখন চন্দ্রশেখর তাহার ললাট, চক্ষু প্রভৃতির নিকট নানা প্রকার বক্রগতিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল, অচিরৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িল—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইল।

তখন চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী, নিদ্রাবস্থায় বলিল, "আজ্ঞে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি কে?"

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ নিদ্রিতা—কহিল, "আমার স্বামী।"

চ। তুমি কে?

শৈ। শৈবলিনী।

চ। এ কোন্ স্থান?

শৈ। বেদগ্রাম—আপনার গৃহ।

চ। বাহিরে কে কে আছে?

শৈ। প্রতাপ ও সুন্দরী এবং অন্যান্য ব্যক্তি।

চ। তুমি এখান হইতে গিয়াছিলে কেন?

শৈ। ফস্টর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া।

চ। এ সকল কথা এত দিন তোমার মনে পড়ে নাই কেন?

শৈ। মনে ছিল—ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না।

চ। কেন?

শৈ। আমি পাগল হইয়াছি।

চ। সত্য সত্য, না কাপট্য আছে?

শৈ। সত্য সত্য, কাপট্য নাই।

চ। তবে এখন?

শৈ। এখন এ যে স্বপ্ন—আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

চ। তবে সত্য কথা বলিবে?

শৈ। বলিব।

চ। তুমি ফস্টরের সঙ্গে গেলে কেন?

শৈ। প্রতাপের জন্য।

চন্দ্রশেখর চমকিয়া উঠিলেন—সহস্রচক্ষে বিগত ঘটনা সকল পুনর্দ্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতাপ কি তোমার জার?"

শৈ। ছি! ছি!

চ। তবে কি?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়াছিলেন কেন?

চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে দিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা হইতে পলাইল, সে দিনে, গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে?"

শৈ। পড়ে।

চ। কি কি কথা হইয়াছিল?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বলিল। শুনিয়া চন্দ্রশেখর মনে মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি ফস্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন?"

শৈ। বাস মাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চ। বাস মাত্র—তবে কি তুমি সাধ্বী?

শৈ। প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—এজন্য আমি সাধ্বী নহি--মহাপাপিষ্ঠা।

চ। নচেৎ?

শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সতী।

চ। ফস্টর সম্বন্ধে?

শৈ। কায়মনোবাক্যে।

চন্দ্রশেখর খর খর দৃষ্টি করিযা, হস্ত সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "সত্য বল।"

নিদ্রিতা যুবতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, "সত্যই বলিয়াছি।"

চন্দ্রশেখর আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, "তবে ব্রাহ্মণকন্যা হইয়া জাতিভ্রষ্টা হইতে গেলে কেন?"

শৈ। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। বলুন আমি জাতিভ্রষ্টা কি না। আমি তাহার অন্ন খাই নাই- তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি। হিন্দু পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকায় বাস করিয়াছি বটে—কিন্তু গঙ্গার উপর।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন;—অনেক ভাবিলেন—বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি—স্ত্রীহত্যা করিতে বসিযাছিলাম।" ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন?"

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

চ। এ সকল কথা কে জানে?

শৈ। ফস্টর আর পার্ব্বতী।

চ। পার্ব্বতী কোথায়?

শৈ। মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে মরিয়া গিয়াছে।

চ। ফস্টর কোথায়?

শৈ। উদয়নালায়, নবাবের শিবিরে।

চন্দ্রশেখর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রোগের কি প্রতিকার হইবে—বুঝিতে পার?"

শৈ। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন- -তৎপ্রসাদে জানিতে পারিতেছি- আপনার শ্রীচরণকৃপায়, আপনার ঔষধে আরোগ্যলাভ করিব।

চ। আরোগ্যলাভ করিলে, কোথা যাইতে ইচ্ছা কর?

শৈ। যদি বিষ পাই ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

চ। মরিতে চাও কেন?

শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়?

চ। কেন, আমার গৃহে?

শৈ। আপনি আর গ্রহণ করিবেন?

চ। যদি করি?

শৈ। তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি। কিন্তু আপনি কলঙ্কী হইবেন।

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার যোগবল নাই—রমানন্দ স্বামীর যোগবল পাইয়াছি,—বল ও কিসের শব্দ?"

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

চ। কে আসিতেছে?

শৈ। মহম্মদ ইর্‌ফান্—নবাবের সৈনিক।

চ। কেন আসিতেছে?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

চ। ফস্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, না তৎপূর্ব্বে?

শৈ। না। দুই জনকে আনিতে এক সময় আদেশ করেন।

চ। কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা যাও।

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর সকলকে ডাকিলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন যে, "এ নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও। সম্প্রতি, নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে। তোমরা সঙ্গে যাইও।"

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ইহাকে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এখনই শুনিবে, চিন্তা নাই।"

মহম্মদ ইর্‌ফান্ আসিলে, প্রতাপ তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। চন্দ্রশেখর আদ্যোপান্ত সকল কথা রমানন্দ স্বামীর কাছে গোপনে নিবেদিত করিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আগামী কল্য আমাদের দুই জনকেই নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ দরবারে

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে, বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছিলেন—শেষ রাজা, কেন না, মীরকাসেমের পর যাঁহারা বাঙ্গালার নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।

বার দিয়া, মুক্তাপ্রবালরজতকাঞ্চনশোভিত উচ্চাসনে, নবাব কাসেম আলি খাঁ, মুক্তাহীরামণ্ডিত হইয়া শিরোদেশে উষ্ণীষোপরে উজ্জ্বলতম সূর্য্যপ্রভ হীরকখণ্ড রঞ্জিত করিয়া, দরবারে বসিয়াছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ভৃত্যবর্গ যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া, নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দিগণ উপস্থিত?"

মহম্মদ ইর্‌ফান্ বলিলেন, "সকলেই উপস্থিত।" নবাব, প্রথমে লরেন্স ফস্টরকে আনিতে বলিলেন।

লরেন্স ফস্টর আনীত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

লরেন্স ফস্টর বুঝিয়াছিলেন যে, এবার নিস্তার নাই। এতকালের পর ভাবিলেন, "এত কাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি—এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব।"

"আমার নাম লরেন্স ফস্টর।"

নবাব। তুমি কোন্ জাতি?

ফস্টর। ইংরেজ।

ন। ইংরেজ আমার শত্রু—তুমি শত্রু হইয়া আমার শিবিরে কেন আসিয়াছিলে?

ফ। আসিয়াছিলাম, সে জন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না।

নবাব ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিলেন, বলিলেন, "জানিলাম তুমি ভয়শূন্য। সত্য কথা বলিতে পারিবে?"

ফ। ইংরেজ কখন মিথ্যা কথা বলে না।

ন। বটে। তবে দেখা যাউক। কে বলিয়াছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন, তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইর্‌ফান্ চন্দ্রশেখরকে আনিলেন। নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া কহিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভাল। বাঁদী কুল্‌সম্ কোথায়?

কুল্‌সম্ আসিল।

নবাব ফস্টরকে কহিলেন, "এই বাঁদীকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। কে এ?

ফ। আপনার দাসী।

ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইর্‌ফান্, তকি খাঁকে বদ্ধাবস্থায় আনীত করিলেন।

তকি খাঁ এত দিন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন পক্ষে যাই; এই জন্য শত্রুপক্ষে আজিও মিলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের সেনাপতিগণ চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন। আলি ইব্রাহিম্ খাঁ অনায়াসে তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, "কুল্‌সম্! বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে?"

কুল্‌সম্ আনুপূর্ব্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে, সজলনয়নে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনা! আমি এই আম দরবারে, এই পাপিষ্ঠ, স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন! সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।"

মহম্মদ তকি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে?"

কুল্‌সম্, বিস্ফারিতলোচনে, গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমার সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর! আপনার বুকের উপর হাত দে—আমার সাক্ষী তুই।—যদি আর কাহারও কথার প্রয়োজন থাকে, এই ফিবিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর।"

ন। কেমন, ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।

ফস্টর যাহা জানিত, স্বরূপ বলিল। তাহাতে সকলেই বুঝিল দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন, চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য, আমিও তাহার একজন সাক্ষী। আমি সেই ব্রহ্মচারী।"

কুল্‌সম্ তখন চিনিল। বলিল "ইনিই বটে।"

তখন চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন, "রাজন্, যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা প্রশ্ন করুন।"

নবাব বুঝিলেন,—বলিলেন, "তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।"

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বলিয়াছ চন্দ্রশেখর নাম শুনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর। তুমি তাহার—"

চন্দ্রশেখরের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ফস্টর বলিল, "আপনি কষ্ট পাইবেন না। আমি স্বাধীন—মরণ ভয় করি না। এখানে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা। আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

নবাব অনুমতি করিলেন, "তবে শৈবলিনীকে আন।"

শৈবলিনী আনীতা হইল। ফস্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা,—জীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাসপরিহিতা—অরঞ্জিতকুন্তলা—ধূলিধূসরা। গায়ে খড়ি—মাথায় ধূলি,—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক দৃষ্টি। ফস্টর শিহরিল।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। এ কে?

ফ। শৈবলিনী,—চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে—অনুমতি করুন। —আমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিপ্রায়, কুক্কুরদংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফস্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল—হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইল—বলিল, "আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়—অন্য প্রকাব মৃত্যু আজ্ঞা করুন।"

ন। না। এ দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিম্বদন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে—তাহার পরে তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুর নিযুক্ত করে। কুক্কুরে দংশন করিলে, ক্ষতমুখে লবণ বৃষ্টি করে! কুক্কুরেরা মাংস ভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্দ্ধভক্ষিত অপরাধী অর্দ্ধমৃত হইয়া প্রোথিত থাকে। কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি খাঁর প্রতি সেই মৃত্যুর বিধান করিলাম।

বন্ধনযুক্ত তকি খাঁ আর্ত পশুর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফস্টর জানু পাতিয়া ভূমে বসিয়া, যুক্তকরে, ঊর্ধ্বনয়নে জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল—মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি কখন তোমাকে ডাকি নাই, কখন তোমাকে ভাবি নাই, চিরকাল পাপই করিয়াছি! তুমি যে আছ, তাহা কখন মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজি আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে ডাকিতেছি—হে নিরুপায়ের উপায়—অগতির গতি! আমায় রক্ষা কর।"

কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে। ফস্টরও ডাকিল।

নয়ন বিনত করিতে ফস্টরের দৃষ্টি তাম্বুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক জটাজুটধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রুবিভূষিত, বিভূতিরঞ্জিত পুরুষ, দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। ফস্টর সেই চক্ষু প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে তাহার চিত্ত দৃষ্টির বশীভূত হইল। ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই জটাজুটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে সজলজলদগম্ভীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে

প্রবেশ করিল। ফস্টর শুনিল যেন কেহ বলিতেছে, "আমি তোকে কুক্কুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার?"

ফস্টর একবার সেই ধূলিধূসরিতা উন্মাদিনী-প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল, "না।"

সকলেই শুনিল, "না। আমি শৈবলিনীর জার নহি।"

সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল। নবাব প্রশ্ন করিলেন, কি চন্দ্রশেখর, কি কে করিল, ফস্টর তাহা বুঝিতে পারিল না—কেবল শুনিল যে, গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল যে, "তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন?"

ফস্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে; সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতে দুজনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য।' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই। কখন তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" সকলে এ কথা শুনিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শৈবলিনীকে তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছের অন্ন খাওয়াইলে?"

ফস্টর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই, সে নিজে রাঁধিত।"

প্রশ্ন। কি রাঁধিত?

ফস্টর। কেবল চাউল—অন্নের সঙ্গে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছু খাইত না।

প্রশ্ন। জল?

ফ। গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত।

এমত সময়ে সহসা—শব্দ হইল, "ধূরূম্-ধূরূম্ ধুম্ ধুম্।"

নবাব বলিলেন, "ও কি ও?"

ইর্‌ফান্ কাতরস্বরে, বলিল, "আর কি? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।"

সহসা তাম্বু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। "দুড়ুম্ দুড়ুম্ দুম্" আবার কামান গর্জ্জিতে লাগিল। আবার! বহুতর কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল।—ভীম নাদ লম্ফে লম্ফে নিকটে আসিতে লাগিল—রণবাদ্য বাজিল—চারি দিক্ হইতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল—অশ্বের পদাঘাত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—ধূমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইলে—দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। সুষুপ্তিকালে যেন জলোচ্ছ্বাসে উছলিয়া, ক্ষুব্ধ সাগর আসিয়া বেড়িল।

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ, এবং ভৃত্যগণ, *ঠেলাঠেলি* করিয়া তাম্বুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্‌সম্, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফস্টর ইহারাও বাহির হইল। তাম্বুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী বলিলেন, "চন্দ্রশেখর! অতঃপর কি করিবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এক্ষণে, শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি প্রকারে? চারি দিকে গোলা বৃষ্টি হইতেছে। চারি দিক্ ধূমে অন্ধকার — কোথায় যাইব?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "চিন্তা নাই,— দেখিতেছ না, কোন্ দিকে যবনসেনাগণ পলায়ন করিতেছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্—বলবান্—এবং কৌশলময় দেখিতেছি—বোধ হয় ইহারা এক দিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল আমরা পলায়ন-পরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হই। তোমার আমার জন্য চিন্তা নাই, কিন্তু এই বধূর জন্য চিন্তা।"

তিন জনে পলায়নোদ্যত যবন-সেনার পশ্চাদগামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, সম্মুখে এক দল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা—রণমত্ত হইয়া দৃঢ় পর্ব্বতরন্ধ্র-পথে নির্গত হইয়া ইংরেজরণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে, তাহাদিগের নায়ক, অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে, প্রতাপ। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দেখিয়া বিমনা হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে বিমনা হইয়া বলিলেন, "প্রতাপ!" এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফের।"

"আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন, নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি।"

এই বলিয়া প্রতাপ, তিন জনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থানে স্থাপিত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। তিনি পর্ব্বতমালামধ্যস্থ নির্গমন পথ সকল সবিশেষ অবগত ছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে, সমর-ক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গেলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখরের নিকট, দরবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। তৎপরে চন্দ্রশেখর প্রতাপকে বলিলেন, "প্রতাপ, তুমি ধন্য, তুমি যাহা জান, আমিও তাহা জানি।"

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া চন্দ্রশেখরের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখর বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, 'এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

প্র। কেন, স্বামীর ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই?

চ। এ পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিল---শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া, হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিল--- প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্য স্বরে প্রতাপকে বলিল, "আমার একটা কথা কাণে কাণে শুনিবে; আমি দূষণীয় কিছুই বলিব না।"

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম?"

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্যে সত্যই পাগল হইয়াছিলাম?

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল। শৈবলিনী, তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে

বলিলেন, "চুপ। এক্ষণে কিছু বলিও না। আমি নিজেই সকল বলিব—কিন্তু তোমার অনুমতিসাপেক্ষ।"

প্র। আমার অনুমতি কেন?

শৈ। স্বামী যদি আমায় পুনর্ব্বাব গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবাব লুকাইয়া রাখিয়া, তাহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়?

প্র। কি করিতে চাও?

শৈ। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া, ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, "বলিও! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনী?

শৈ। যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাতপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

গমনকালে চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাও।"

প্রতাপ বলিলেন, "যুদ্ধে"।

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যাইও না। যাইও না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "ফস্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম।"

চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্‌গা ধরিলেন। বলিলেন, "ফস্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ কবিয়া, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "আপনিই মনুষ্যমধ্যে ধন্য। আমি ফস্টরকে কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অশ্বারোহণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, "প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন?"

প্রতাপ, মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া, রমানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। দুই এক দিন পরে সাক্ষাৎ হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি প্রতাপেব জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি।" রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। সেই ধূমময়, আহতের আর্তচীৎকারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে, প্রতাপকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও শবের উপর শব স্তূপীকৃত হইয়াছে— কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ "জল! জল!" করিয়া আর্তনাদ করিতেছে—কেহ মাতা, ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু প্রভৃতির নাম করিয়া ডাকিতেছে। রমানন্দ স্বামী সেই সকল শবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত অশ্বারোহী রুধিরাক্ত কলেবরে, আহত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অস্ত্র ফেলিয়া পলাইতেছে, অশ্বপদে কত হতভাগ্য আহত যোদ্ধৃবর্গ দলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত পদাতিক, রিক্তহস্তে উর্দ্ধশ্বাসে, রক্তপ্লাবিত হইয়া পলাইতেছে; তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। শ্রান্ত হইয়া রমানন্দ স্বামী এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেইখান দিয়া একজন সিপাহী পলাইতেছিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলেই পলাইতেছ,— তবে যুদ্ধ করিল কে?"

সিপাহী বলিল, "কেহ নহে। কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথা?" সিপাহী বলিল, "গড়ের সম্মুখে দেখুন।" এই বলিয়া সিপাহী পলাইল।

রমানন্দ স্বামী গড়ের দিকে গেলেন। দেখিলেন, যুদ্ধ নাই, কয়েক জন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একত্রে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন, দেখিলেন, সেই প্রতাপ! আহত, মৃতপ্রায়, এখনও জীবিত।

রমানন্দ স্বামী জল আনিয়া তাঁহার মুখে দিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে চিনিয়া প্রণামের জন্য, হস্তোত্তোলন করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

স্বামী বলিলেন, "আমি অমনিই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আরোগ্য লাভ কর।"

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন, "আরোগ্য? আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব নাই। আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।"

রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জ্জেয় রণে আসিলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আপনি কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন?"

স্বামী বলিলেন, "যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, তখন তাহার আকারেঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে। এবং বোধ হয়, তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদিগের নিষেধ

সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে, প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীব চিত্ত, কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল; আর কেহ কখন রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত স্বর্গভোগ করিবে সন্দেহ নাই।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দ স্বামী বিলতে লাগিলেন, "শুন বৎস! আমি তোমাব অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল, "কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আমি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইযাছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী—আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন, তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"

রমানন্দ স্বামী নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণ-শয্যায়, অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পবকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।

তাৎপর্য ও টীকা

উপক্রমণিকা—প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

বিবাদের মালা—মালা নিয়ে প্রতাপ ও শৈবলিনীর মধ্যে বিবাদ। এই বিবাদ নাটকীয়। কেননা এই মালা উভয়ের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম সূচিত করেছিল। তাছাড়া এই কথাটিতে ইংরেজি প্রবচন 'A bone of contention'-এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। **সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিল**—সন্ধ্যাকালের বর্ণনায় অপূর্ব কাব্যময়তা লক্ষ করা যায়। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল—নৌকা শব্দটির দ্বারা প্রতাপ শৈবলিনীর বহমান জীবনের রূপ ব্যঞ্জিত করেছেন। **দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জ্বলিতেছে**—দাঁড়ের জলে অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণাভ কিরণ পড়ায় তা সোনার মতো মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে—গঙ্গায় প্রতাপ ও শৈবলিনী ডুব দিয়েছিল। প্রতাপ পরিকল্পনা অনুযায়ী ডুব দিল, কিন্তু শৈবলিনী বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা থাকায় ডুবতে পারল না। দুজনের এই মানসিকতা উপন্যাসের শেষেও চিত্রিত হয়েছে। তাই এই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। **প্রণয় বলিতে হয় বল**—বাল্যপ্রেম যে প্রণয়ের পূর্বলক্ষণ তা বোঝাতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে। **বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিঞ্চিৎ অভিসম্পাত আছে**—এই উক্তির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্য প্রেমের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। এই দুই কিশোর-কিশোরীর প্রেম সামাজিক বাধার জন্য যথাযোগ্য পরিণতি লাভ করতে পারেনি বলেই লেখকের এই ধরনের উক্তি। **এই প্রথম হিসাবে ভুল**—শৈবলিনী জীবনে অনেক ভুল করেছে এবং সেইসব ভুল থেকে তার পরিণতিও ভয়াবহ হয়েছে। কিন্তু বালিকা শৈবলিনীর প্রথম ভুল হল সামাজিক বিধি বিধান না জেনে প্রতাপের সঙ্গে তার বিয়ে হবে এটা সুনিশ্চিত বলে বিশ্বাস করা। **সৌন্দর্যের ষোল কলা পুরিতে লাগিল**—কিশোরী শৈবলিনীর পরিপূর্ণ যৌবন বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার। কারণ চাঁদের ষোল কলা পূর্ণ হলে তখন চাঁদ হয় পূর্ণ চাঁদ। **প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই**—শৈবলিনী প্রতাপের মধ্যেই নিজের জীবনকে সার্থক করে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল। প্রতাপকে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা তাকে নতুন জীবনের স্বাদ পেতে স্বপ্নবিভোর করে তুলেছিল। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল প্রতাপকে সে জীবনে পেতে পারবে না তখন পৃথিবীর সব আকর্ষণ তার কাছ থেকে বিদায় নিল। **এই আমাদের বিয়ে**—বাইরের সমাজ প্রতাপ ও শৈবলিনীর মিলনকে স্বীকৃতি না দিলেও উভয়ের হৃদয়ের মিলন গঙ্গাবক্ষে সংসাধিত হওয়ায় এই উক্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না—প্রতাপ ও শৈবলিনীর মধ্যে যে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক রয়েছে তা চন্দ্রশেখর জানতে পারলেন না। **তিনি গৃহস্থ, অথচ**

সংসারী নহেন—যিনি গৃহে বাস করেন তাঁকে গৃহস্থ বলা চলে। আর সংসারী তিনি যিনি সংসারের সঙ্গে হৃদয়ের বিভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু চন্দ্রশেখর গৃহস্থ হলেও মাতৃবিয়োগের পর তাঁর আপনজন বলতে কেউ ছিল না বলেই তাঁর সংসারে আসক্তি ছিল না। **সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না** —চন্দ্রশেখরের ভয় ছিল সুন্দরী স্ত্রী শাস্ত্রালোচনায় বাধাস্বরূপ হতে পারে, তাই এই উক্তি। **সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল**—চন্দ্রশেখর মনে মনে সুন্দরী স্ত্রী গ্রহণ করবেন না সিদ্ধান্ত করলেও সুন্দরী স্ত্রী লাভ করে সেই ব্রত ভঙ্গ হল বলেই এই উক্তি।

প্রথম খণ্ড ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

দলনী বেগম—দলনী মীরকাসেমের পত্নী। তিনি উপকাহিনির নায়িকা। চরিত্রটি ঐতিহাসিক না হলেও ঐতিহাসিক সজীবতা লাভ করেছে। **মীরকাসেম খাঁ**—ইনি নবাব মীরজাফর-এর জামাতা। এর শাসনকাল ১৭৬১-১৭৬৪ খ্রিঃ। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা মীরজাফরকে নামমাত্র নবাব করে এ দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা হয়ে বসে। মীরকাসেম নবাব হয়েই ইংরেজদেরকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী প্রদান করেন। কিন্তু মনে মনে তিনি ইংরেজদের কর্তৃত্ব পছন্দ করতেন না। ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এঁর শাসনকালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীগণ বিনা শুল্কে ব্যবসা করছিলেন। মীরকাশেম তখন সব ব্যবসায়ীর কাছ থেকে শুল্ক আদায় বন্ধ রাখেন। এতে কোম্পানি ও কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ইংরেজরা মীরকাসেমের সর্বনাশ সাধনে শহর অধিকার করে নেয়। তখন মীরকাসেম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু তিনি তিনটি যুদ্ধে পরপর পরাজিত হলেন। এই যুদ্ধগুলির মধ্যে উদয়নালার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর মীরকাসেম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগল সম্রাট শাহ আলম-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বক্সারে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধেও পরাজিত হয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হন। **ভুজঙ্গরাশিতুল্য**—সাপের মতো। **তাঞ্জাম**—সুসজ্জিত চতুর্দোল। **দলনীর দুর্ভাগ্য**—দলনীর দুর্ভাগ্য এই যে নবাব তার গান শুনে গাইতে বলেছিলেন। কিন্তু লজ্জা ও ভীরুতাবশত সে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না। **মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়**—স্থলপদ্ম পূর্ণ বিকশিত হয় সূর্যকিরণ সম্পাতে। কিন্তু আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন থাকে তখন স্থলপদ্ম ফুটতে পারে না। তেমনি দলনীও তার স্বাভাবিক রূপ-গুণ লজ্জাবশত প্রকাশ করতে পারেনি। **ক্ষণকালীন কণ্ঠাগত প্রণয় সম্বোধনের ন্যায়**—নায়িকা নায়কের উপর অভিমানিনী হলে কিছুক্ষণ রাগ করে থাকার পর পুনরায় প্রণয় সম্ভাষণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে এবং তখন তার লজ্জাবশত আর তার মুখে কথা ফুটতে চায় না। অভিমানিনী দলনীরও সেরূপ অবস্থা হয়েছিল। **বরতরফ করিয়া**—বরখাস্ত করে। **বহাল করি**—নিয়োগ করি। **আপনি গণিতে জানেন**—'সয়ের মতাক্ষরীণ' গ্রন্থে মীরকাসেম-এর জ্যোতিষ শাস্ত্রানুশীলনের উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ভীমা পুষ্করিণী—বেদগ্রামে অবস্থিত এই দীঘি, যেখানে লরেন্স ফস্টর শৈবলিনীকে দেখেছিল। **বাপীজলমধ্যে**—পুষ্করিণীর জলের মধ্যে। **প্রফুল্ল রাজীববৎ**—প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতো। **সৌদামিনী**—বিদ্যুৎ। **মন্দ পদে**—ধীর গতিতে। **ব্রহ্মপুত্র**—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ভগবান ব্যাসদেব এই গ্রন্থের রচয়িতা। **আজি এত অসময়ে বিদ্যুৎ কেন**—শৈবলিনীর অকস্মাৎ হাসার কি কারণ ঘটল তা বুঝতে না পেরে চন্দ্রশেখর স্ত্রীকে লক্ষ করে এই রসিকতাপূর্ণ উক্তি করেছেন। **প্রমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয়ত্ব**—দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কিত জটিল তত্ত্ব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

লরেন্স ফস্টর—একজন ইংরেজ ও নির্লজ্জ কামুক চরিত্র। **অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত**—অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাবী আমলে যেসব ইংরেজ এদেশে আসত তারা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে মুনাফা লাভ করত। ইংরেজ বণিকদের অর্থ লালসা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা বোঝাতে এই উক্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

প্রভাত বাতোত্থিত—প্রভাতকালীন বায়ু থেকে উত্থিত। **বীচিশ্রেণী**—তরঙ্গমালা। **আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই**—সুন্দরীর এই কথার মধ্য দিয়ে হিন্দু নারীর তেজস্বিতাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

আমি গণিতে পারিলাম না—চন্দ্রশেখর গণনা করে যখন দেখলেন দলনীর ভবিষ্যৎ ঘোর অমঙ্গলপূর্ণ তখন তিনি সেকথা নবাবকে জানাতে চাইলেন না। চন্দ্রশেখর সেজন্যই গণনা বিষয়ে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে ভান করলেন। **চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহেন**—চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণ নয়। তাই এই উক্তি। **এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম**—চন্দ্রশেখর দার্শনিক বলেই তিনি জানেন এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই পরমেশ্বরের সৃষ্টি। **সচ্চিদানন্দ**—জগদীশ্বর ব্রহ্মের স্বরূপ। **উৎফুল্ল কমলাননা**—যে নারীর মুখ প্রকাশিত পদ্মের মতো। **মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি**—ধর্মসংহিতা। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, অপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ণ, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, গৌতম, শতাতপ, বশিষ্ঠ—এই কুড়িজন তপস্বী রচিত ধর্মশাস্ত্রের নাম স্মৃতি। **ন্যায়**— গৌতম ঋষি প্রণীত তর্কশাস্ত্রের নাম ন্যায়। **বেদান্ত**—ব্যাসদেবের দর্শনশাস্ত্র। **সাংখ্য**—কপিলমুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। **কল্পসূত্র**—বেদাঙ্গ বিশেষ। **আরণ্যক**—বেদের অংশ। **উপনিষদ**—জ্ঞানকাণ্ড ও ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

কুল্‌সম্—দলনী বেগমের পরিচারিকা। **কিস্তি**—মাল বোঝাই বড় নৌকা। **গুরগণ খাঁ**—নবাব মীরকাসেমের প্রধান সেনাপতি। **বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথলেন**—মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনির সমন্বয়ের জন্য দুই নারীকে এক সূত্রে গ্রথিত করলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

তীরে বসিয়া ঢেউ গনিলে কি হইবে—কুল্‌সম্ বুঝেছিল সৌভাগ্য অর্জনের জন্য সাহসের প্রয়োজন। তাই এই উক্তি। **গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম**—গুরগণ খাঁ একসময় গজে মেপে কাপড় বেচত, তখন সে গরীব ছিল। **আমি কর্তার গোলামের গোলাম**—মীরকাশেম ইংরেজের অধীন ছিলেন, গুরগণ আবার মীরকাসেমেব অধীন তাই এই উক্তি। **আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি**—ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধের সম্ভাবনায় দলনী চিন্তায় অধীর হয়ে পড়ায় চোখে অন্ধকার দেখছে। **ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নূরজাহান হইবে**—মেহেরউন্নিসা ছিলেন শের আফগানের স্ত্রী। স্বামীব মৃত্যুব পর সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করে ভারতেশ্বরী নূরজাহান নামে খ্যাত হন। গুর্‌গণ তাঁর বোন দলনীকে মেহেরউন্নিসাব উপমা দিয়ে বলেছিল যদি দলনীর স্বামী মারা যায় তাহলে সেও মেহেরউন্নিসার মতো সৌভাগ্যবতী হতে পারে। **ছিন্নবল্লরীবৎ**—ছেঁড়া লতার মতো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ঈশ্বর আমার বিচারকর্তা—দলনীর পাপ পুণ্যবোধ থাকায় সে তার কৃতকর্মের জন্য ঈশ্বরের কাছে বিচার চেয়েছে। যে ডুবিয়া মরিতেছে, সে অবলম্বনের যোগ্যতা বিচাব করে না-- দলনী নবাবের বেগম হয়েও চন্দ্রশেখরের মতো দরিদ্র ব্রাহ্মণেব সাহায্য গ্রহণ করতে দ্বিধা করল না। এটি একটি ইংরেজি প্রবাদবাক্যের অনুসরণে রচিত। সেটি হল—'A drowning man catches at a straw.'। **ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে**—দলনীর ভবিষ্যৎ গণনা চন্দ্রশেখর নিজেই করেছিলেন। সুতরাং কি ঘটবে তার পূর্বাভাষ তিনি আগেই পেয়েছিলেন তাই এই উক্তি। **মুন্সী রামগোবিন্দ রায়**—ইতিহাসে মীরকাসেমের এই নামীয় কোন কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে নায়েব নাজিম রাজা রামনারায়ণ রায়ের উল্লেখ আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

তুমি উপকার করিবে কিনা, তাহা জানিব কি প্রকারে— সুন্দরী কৌশলে প্রতাপের মনের খবর জানবার জন্য এই প্রশ্ন করেছে। **রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল**—প্রতাপের রাগ দেখে সুন্দরী আশ্বস্ত হল। কারণ রুষ্ট হয়ে শৈবলিনী চন্দ্রশেখর উদ্ধার চেষ্টার যে শপথ নিয়েছে, তাতে সুন্দরীর মনে আনন্দ হল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

আজিমাবাদের কুঠিতে—পাটনার কুঠিতে। **তেলিঙ্গা**—সিপাইদের এই নামে ডাকা হত। **হুকুমদার**—ইংরেজি 'Who comes there'-এই বাক্যটিকে দেশীয় সিপাইরা 'হুকুমদার' রূপে উচ্চারণ করত। কসাড় বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হলে-প্রতাপের চাকর রামচরণ কসাড় বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে এই গুলি নিক্ষেপ করেছিল। **কিয়া হৈরে**— এই হিন্দী প্রশ্নবোধক বাক্যের অর্থ হল'কি হইল'?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল—এই স্বপ্নটি রূপক। এই স্বপ্নে যে রাজহংসের কথা বলা হয়েছে সে প্রতাপ রায়, প্রস্ফুটিত পদ্মটি শৈবলিনী নিজে, আর শূকরটি লরেন্স ফষ্টর। পদ্মের মৃণাল আসলে বিবাহিত জীবনের বন্ধন। **বাপীতীর**—পুষ্করিণীর তীর। **শ্বেত বন্দরের**—লরেন্স ফষ্টর শ্বেতাঙ্গ বলে এই নাম। **গোরা ডাকাত**—লরেন্স ফষ্টরকে বলা হয়েছে। **এ অবস্থায় নিদ্রা সম্ভবে না**—যে পরিস্থিতির মধ্যে শৈবলিনীকে আসতে হয়েছে সে অবস্থায় মানসিক শান্তি না থাকায় ঘুম আসার সম্ভাবনা ছিল না। **তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহৃত হইতে লাগিল**—প্রতাপ বহুদিন পরে শৈবলিনীকে দেখতে পেয়ে অতীত দিনের স্মৃতিগুলি একসঙ্গে ভীড় করে আসতে লাগল। সমুদ্রে যেমন একটি ঢেউয়ের পর আর একটি ঢেউ এসে পড়ে তেমনি প্রতাপের স্মৃতিপটে শৈবলিনী সংক্রান্ত এক একটি ঘটনা ভীড় করে এল। **শৈবলিনী পালঙ্কে মূৰ্ছিত হইয়া পড়িলেন**—হঠাৎ মানুষের মনে তীব্র সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হলে তার চেতনা লোপ পায়। ঠিক তেমনি শৈবলিনী প্রতাপকে দেখে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন। এই মূর্চ্ছা তার অস্বাভাবিক আনন্দ চাঞ্চল্যের জন্য। **কিন্তু তোমার মরণই ভাল**—শৈবলিনী ফষ্টর এর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে তার প্রতি অনুরাগবশত নয়, বরং প্রতাপকে পাওয়ার জন্য সে ফষ্টরকে অবলম্বন করেছে। পরবর্তীকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে বিহারীকে পাওয়ার জন্য বিনোদিনী মহেন্দ্রের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। **প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল**—শৈবলিনী যখন জানাল যে প্রতাপের প্রতি সুগভীর প্রেমের জন্যই সে ঘর ছেড়ে ফষ্টরের সঙ্গে বেরিয়েছে তখন প্রতাপ এই খবরে স্তম্ভিত হল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ

হিন্দু তেল পোড়ায় না খরচ হইবে—গলষ্টনের এই ব্যঙ্গোক্তি হিন্দুদের প্রতি। ইংরেজরা সারাদিন কাজ করে রাতে আমোদ-প্রমোদ করার জন্য তেল পোড়ায় অর্থাৎ খরচ করে। কিন্তু হিন্দুরা তা করে না বলে এই উক্তি। **রণযাত্রার গভীর পদবিক্ষেপে**—ইংরেজ জাতির শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে এই উক্তি। সমস্ত কাজই সামরিক শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন করা তাদের জাতীয় স্বভাব। **ইন্ডিল-মিন্ডিলে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা**—ইন্ডিল-মিন্ডিল অর্থাৎ ইংরেজি ভাষাভাষী ব্যক্তি। রামচরণ অশিক্ষিত হলেও তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মাধ্যমে সে উপলব্ধি করেছে যে ইংরেজরা বিশ্বাসের অযোগ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ

যবন কন্যারা—মুসলমান কন্যারা অর্থাৎ দলনী ও কুল্‌সম। ভয়ের স্বধর্ম ভয়ানক বস্তুর দর্শন পুনঃ পুনঃ কামনা করে—কাবো মনে ভয় এলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক বস্তু বারবার তার কাছে আবির্ভূত হতে থাকে। গলষ্টন যখন প্রতাপকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন এই দুটি নারী যদি ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ থাকত তবে তাদের কোন বিপদ আসত না। কিন্তু তারা ঘরের দরজা ফাঁক করে সবকিছু দেখতে চেষ্টা করে বলেই তাদেব বিপদে পড়তে হয়েছিল। **কেন গৃহত্যাগ করিলাম ...... সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না**—শৈবলিনীর হৃদয়ে পাপাচরণের এই প্রথম প্রতিক্রিয়া। শৈবলিনী গৃহত্যাগের পর যে আশা করেছিল, তা যখন নিরাশায় পরিণত হল তখন এই অনুশোচনা। **জানিতাম না যে মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে**—এখানে শৈবলিনী বুঝতে পেরেছে, নিয়তিই সব। কাবণ ইচ্ছা করলেই মানুষ নিজের ইচ্ছামত সবকিছু করতে পারে না। কথাটি ইংরেজি প্রবাদবাক্য 'Man Proposes, God disposes'-এরই প্রতিধ্বনি। **ফিরিঙ্গী**—ইংরেজ। **প্রফুল্ল রাজীবতুল্য**—প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো। **রুষ্ট সর্পের চক্রের ভীমকান্তি শোভা ধারণ করিল**—ক্রুদ্ধ সাপের ফণায় যে চক্র অঙ্কিত দেখা যায়, তা যেমন ভযঙ্কব তেমনি সুন্দর। আত্মহত্যায় উন্মুখ শৈবলিনীর মুখশ্রীও সর্পের ফণায় অঙ্কিত চক্রের মতো ভীষণ ও সুন্দর রূপ পেয়েছে—এই উপমা প্রয়োগ করে শৈবলিনীর অবস্থাটিকে বোঝান হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

পরমহংস—সন্ন্যাসী বিশেষ। 'যে মহাত্মা নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হয়ে শুধু তত্ত্বমার্গে ভ্রমণ করেন। যিনি সবসময় শুদ্ধ চিত্তে থাকিয়া শুধু প্রাণ ধারণোপযোগী দান মাত্র পরিগ্রহ কবেন, যাঁহার লাভালাভ উভয়েই তুল্যজ্ঞান, যাঁহার আশ্রয় নাই; দেবপ্রাঙ্গণ, বৃক্ষমূল, নদীপুলিন প্রভৃতি সাধারণ ভোগ্য ভূমিই যাঁহার আশ্রয় যাহাব কোন বিষয়েই যত্ন বা সমতা নাই, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বরে চিত্ত অর্পণ পূর্বক শুভাশুভ কর্ম ক্ষযার্থ সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাকেই পরমহংস বলা হয়।' দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? অপরের দুঃখে ব্যথিত হয়েই মানুষ দয়া বা সহানুভূতি দেখায়। তাই দুঃখানুভূতি থেকেই দয়ার সঞ্চার। **যেই পরোপকারী সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে**—যথার্থ সুখ নিজের স্বার্থের মধ্যে নয়, পরোপকার বৃত্তির মধ্যে। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এব 'আমার মন' প্রবন্ধেও সমধর্মী উক্তি করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল—বুদ্ধিমতী শৈবলিনী যখন উপলব্ধি করল নবাবের সামনে উপস্থিত হওয়ার একটা সুযোগ এসেছে, তখন তার মাথায় হঠাৎ এক দুঃসাহসিক মতলব দেখা দিল। সে স্থির করল, নবাবের কাছে প্রতাপের স্ত্রী রূপসী বলে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রতাপের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করবে। **শিবিকা**—পাল্কি। **অধর দংশন করিয়া শ্মশ্রু উৎপাটন করিলেন**—এতে নবাবের ক্রোধের পরিচয উদঘাটিত হয়েছে। কারণ নবাব ক্রোধবশত ঠোঁট কামড়ালেন ও দাড়ি উপড়ে ফেললেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

এত্তেলা-সংবাদ তাঁহার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—নবাব গুরগণের প্রতি এই বাঁকা দৃষ্টি দিলেন এই কারণে যে, গুরগণ যে নবাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তা তিনি অনুমান করতে পেরেছেন। **মসীবুদ্দিন**—নবাবের বিশ্বাসী ও সাহসী একজন খোজা। **এ দোশরা চাঁদ সুলতানা**—ইতিহাসে যে চাঁদ সুলতানার নাম বিখ্যাত হয়ে রয়েছে তিনি হলেন আহম্মদ নগরের রাজকন্যা ও বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহের পত্নী। আদিল শাহের মৃত্যু হলে আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের রাজারা সম্মিলিতভাবে বিজাপুর অবরোধ করেন। চাঁদ সুলতানা তখন প্রবল পরাক্রমে তাদের বাধা দেন। তাছাড়া তিনি মোঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে চিরন্তন খ্যাতি লাভ করেছেন। শৈবলিনীর সাহস ও বিক্রম দেখে মসীবুদ্দিন-এর চাঁদ সুলতানার কথা মনে পড়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে—একটি সুন্দর উপমার মাধ্যমে মানবভাগ্যের রূপকে ঔপন্যাসিক এই উক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। নদী-রেখা বহুদূরে অস্পষ্টতার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে। মানুষের ভাগ্যও তো বেশিদূর দেখা যায় না। কিন্তু দূর নিরীক্ষিত হওয়ার পর তাও ভবিষ্যতের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে যায়। **বালুকণার অপেক্ষা মানুষের গৌরব কি?**—অসীম, বিরাট, অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ তার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করে। তখন তার মনে হয় সমুদ্রোপকূলে সীমাহীন বালুকা বেলায় সে একটা সামান্য বালুকণার মতোই তুচ্ছ সাধারণ অবস্থায় মানুষ নিজেকে নিয়ে গৌরব করে, কিন্তু অনন্তের মধ্যে এসে দাঁড়ালে তার সেই অহমিকা লোপ পায়, নিজেকে তখন সে ক্ষুদ্র বলে উপলব্ধি করতে পারে। **সতরঞ্জ**—দাবা। **কিস্তি দিতে দিতে**—দাবার চাল দিতে দিতে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

অমোঘ অস্ত্র—অব্যর্থ অস্ত্র। **সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র**—বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি প্রবাদ বাক্যের মতো। **জেন্টু স্ত্রীলোকটি**—ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকটি। **অবগুণ্ঠন**—ঘোমটা। **অপনীত**—দূর হওয়া। **বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে**—বীর পুরুষের উপযুক্ত বীরাঙ্গনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি—প্রতাপ ও শৈবলিনী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিয়ে চলেছে। তারা উভয়ে চিন্তামগ্ন। কিন্তু উভয়ের মানসিকতা ভিন্ন। কারণ প্রতাপের মন সংসারের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে উদার অনন্ত আকাশে আশ্রয় লাভ করেছে। অনন্ত আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রতাপের মনে হয়েছে, কবে ঐ রহস্যের অনন্ত আকাশে সাঁতার কাটতে যেতে পারবে। সেই সাঁতারের সঙ্গে ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতারের তুলনাই চলতে পারে না। প্রতাপের হৃদয় যখন এ ধরনের দার্শনিক চিন্তায় বিভোর তখন শৈবলিনীর হৃদয় আপন অদৃষ্টের চিন্তায় আচ্ছন্ন। শৈবলিনী নিজের

জীবনের অনন্ত সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। যে অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে সে সাঁতরে চলেছে সেখানে ডুবলে কি সে তল পাবে? গঙ্গার তো তল আছে, কিন্তু এই রহস্যসমুদ্রের তল নেই বলেই শৈবলিনীর এই উক্তি। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যরাশিও যে দুঃখপীড়িত মানুষের হৃদয়ে সময়ে সময়ে বিষবৎ বলে মনে হতে পারে, প্রকৃতি সে বিষয়ে একেবারেই ভ্রূক্ষেপহীন প্রকৃতি অচেতন বলেই এরূপ সম্ভব হয়। **শৈবলিনী কলের পুত্তলির ন্যায় সাঁতার দিতেছিল**—শৈবলিনীর মন তার ভবিষ্যতের ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়েছিল-ফষ্টর এর রোগা মুখ দেখে তার মনে নতুন দুর্ভাবনার উদয় হচ্ছিল এই মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তিই তার দেহ মনকে স্ফূর্তিহীন করে ফেলেছে। **আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?**—শৈবলিনীর এই বিষাদ করুণ উক্তির অর্থ এই যে, যে হৃদয় বেদনার আঘাতে ভেঙে গিয়েছে, যে হৃদয়ে সুখের আশা চিরতরে লুপ্ত হয়েছে, তাতে আবার পুরাতন সুখময় স্মৃতি জাগাবার চেষ্টা কেন? **তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল** –কিছুক্ষণ আগেও শৈবলিনীর চোখের সামনে তারার দীপ্তির মতো আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল কিন্তু সে আলো স্থায়ী হল না। প্রতাপ না জানি কি কঠিন শপথের কথা বলবে এই ভেবে তার মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। **আইস তবে দুইজনে ডুবি**—প্রতাপ বুঝেছে, এই ধরনের শপথ গ্রহণ করা শৈবলিনীর পক্ষে কতটা বিপজ্জনক। কিন্তু এছাড়া বা উপায় কি? সে উপায় হল উভয়ের একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করা। **জীবন নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল** শৈবলিনীর জীবনে এতদিন আত্মসুখ কামনাই ছিল প্রবল, এখন তার জীবনের গতি বিপরীতমুখে ধাবিত হল। সে আত্মসুখ বিসর্জন দিয়েও প্রতাপের জীবন রক্ষায় সচেষ্ট হল। **তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব** প্রেমিক প্রেমিকার দৈহিক মিলনে যখন অন্তরায় উপস্থিত হয় তখন কল্পনায় ও চিন্তায় সে মিলনের অভাব কিছু পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু প্রতাপ শৈবলিনীর কাছ থেকে সেই চিন্তাশ্রয়ী মিলনসুখটুকু কেড়ে নিতে চেয়েছে। **শৈবলিনী মরিল**—প্রতাপের প্রেমের মধ্যেই শৈবলিনী এতদিন জীবিত ছিল। সে প্রেমের অবসানের অর্থ শৈবলিনীর আত্মিক মৃত্যু।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ

ইডিল মিডিলের ইংরাজেরা পা জোড়া লাগিয়াছিল পলায়নের ক্ষিপ্রতা দেখে তা অনুমান করা যেতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ

শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল—এখানে শৈবলিনী চরিত্রের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে মনোবল, যে সংযম থাকলে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে প্রেমাস্পদের কল্যাণ ও সমাজের কল্যাণের জন্য শূন্যতাকেও বরণ করে নেওয়া যায় শৈবলিনীর সেই দিকটি এখানে উদঘাটিত হয়েছে। **এ যেই হউক, লরেন্স ফষ্টর নহে**—নির্জন পর্বতগাত্রে কে কি উদ্দেশ্যে অন্ধকার রাতে তাকে দুহাতে তুলে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে

তা শৈবলিনী বুঝল না। কিন্তু অর্ধচৈতন্য অবস্থায়ও সে ঠিক বুঝতে পারল এ যেই হোক, অন্তত ফস্টর নয়।

চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

এখন তাহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে - জীবনধারণের জন্য যে আশা যে স্বপ্ন প্রয়োজন সেই আশা ও স্বপ্ন যখন শৈবলিনীর জীবনে হারিয়ে গেল, তখন তার ডুবে মরা যে অসম্ভব নয়, সে কথাই মনে হল প্রতাপের। **ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুঠপাট হইতে পারে** শৈবলিনীর প্রতি অনুরাগে তার হারিয়ে যাওয়ায় প্রতাপ ইংরেজদের প্রতি প্রতিশোধলিপ্সু হয়ে উঠলেন। 'নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই একখানা বড় বড় পরগণা পাইতে পারিব'--ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের কারণ হিসাবে এই উক্তি প্রতাপের মহত্ত্বকে প্রমাণ করে না। **গুরগণ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন**—ইংরেজের বিরুদ্ধে ও নবাবের পক্ষে প্রতাপ রায় একটি বিপুল শক্তি সংঘবদ্ধ করে তুলছে, বিশ্বাসঘাতক গুরগণ খাঁর মনস্কামনা সহজে সিদ্ধ হবে না ভেবে সে চিন্তিত হল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

উপলশয্যায়—পাথরের শয্যা। **পর্ব্বতারোহণ প্রাপ্তি** —পর্বতে ওঠার জন্য ক্লান্তি। **বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ**— ঝড়বৃষ্টির কারণে কষ্ট। এই সাতদিন সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও—রমানন্দ স্বামীর শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত কালে এই নির্দেশ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ -মন নিরুদ্ধ-সর্বত্র স্বামী-স্বামী— শৈবলিনীর স্বামী ফিরে পাওয়ার জন্য স্বামী তন্ময়তার পরীক্ষা এই উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। **ত্বক্ কেবল চন্দ্রশেখরের আদরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিল**— শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের স্পর্শ অনুভব করল। যে এত ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল, সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী সন্দেহ নেই —রমানন্দ স্বামী যেহেতু মনুষ্যচরিত্রের কোন সংবাদই রাখেন না, তাই তাঁর নির্দেশিত ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। **শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল**--এই ভোলাবার জন্যই শৈবলিনীর উপর রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু সত্যসত্যই তা হয়নি, কারণ শৈবলিনী কোন দিনই প্রতাপকে ভুলতে পারেনি। ব্রহ্মচারী বেশে চন্দ্রশেখর-এর দ্বারা রোমান্সের উপযোগী অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

তাহার শীর্ণ বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—চক্ষু বিস্ফারিত, পলক রহিত হইল, নাসারন্ধ্র সংকুচিত, বিস্ফারিত হইতে লাগিল—শরীর কন্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল—শৈবলিনীর নরক স্বপ্ন দর্শনের মানসবিক্রিয়া এখানে প্রকাশিত। **শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল**—এখানে শৈবলিনীর উন্মাদ অবস্থার লক্ষণ প্রকাশিত।

পঞ্চম খণ্ড ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রফুল্ল মনে নহে—আমিয়ট তকি খাঁর চেয়ে রাজনৈতিক কূটকৌশলে কম ছিলেন না। তাই তকি খাঁর নিমন্ত্রণটা যে একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র, ইংরেজদের বন্দী করাই যে তাঁর উদ্দেশ্য, তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আমিয়ট। কিন্তু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের অর্থ তখনই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা। সেই অনিবার্য সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব এড়াবার চেষ্টাতেই আমিয়ট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র আনন্দ হয়নি। **আমরা স্ত্রী-জাতি-যেখান যাইব, সেখানেই আটক**—বুদ্ধিমতী কুল্‌সম্ ইংরেজদের হাতে নিজেদের বন্দীদশাকে স্ত্রীজাতির সাধারণ অবস্থা বলে বর্ণনা করে পরিস্থিতি লঘু করার চেষ্টা কবেছেন। আমি অনন্যগতি, মরিতে হয তাহারি চরণে পতিত হইয়া মরিব---পতিব্রতা দলনীর প্রতি প্রেমের পরাকাষ্ঠার উদাহরণ। সেজন্য স্বামীর হাতে মরণকেও সৌভাগ্য বলে মনে করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

সে রজ্জুতে সর্প দেখিল—ভয় পেলে মানুষ অতি সাধারণ ব্যাপারেও ভয়াবহ বলে কল্পনা করে। ফষ্টর-এরও সে ধরনের ভীতিকর অবস্থা। পেছনে একটি নৌকা দেখেই সে মনে করল তা শত্রুব নৌকা, অথচ সত্যিকার ঘটনা তা নয়। **আশায় অন্ধ হইয়া বিচারে পরাঙ্মুখ হয়**—ভয় পেলে মানুষ যেমন বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তেমন অতিরিক্ত আশার জন্যও মানুষের বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। ফষ্টর ভীতির কারণে তার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে দলনী তাব বিচাববুদ্ধি বিসর্জন দিল মুক্তিলাভের অত্যধিক আশায়। পিছনেব নৌকাটি সত্যিই যে নবাবের নৌকা তা পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না। সে ফষ্টরের কথাতে বিশ্বাস করে নিজের বিপদ ডেকে আনল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—ঐশ্বর্যের দীপ্তি ও সৌন্দর্যের মাধুর্য যখন একত্রিত হয তখনই তাকে উজ্জ্বল ও মধুরের সমাবেশ বলা চলে। শেঠ ভাইদের সুরম্য প্রাসাদের অপরূপ চোখ ঝলসানো সাজসজ্জা, নর্তকীদেব মণিমাণিক্যময় গায়ের অলংকার ঐশ্বর্যের প্রতীক। আর গায়িকাদের কণ্ঠের অপূর্ব সঙ্গীত মধুর পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক। **শুনিবার জন্য কে কবে সঙ্গীতের অবতারণা করায়**—তথাকথিত সঙ্গীতরসিকদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই শ্লেষোক্তি লক্ষণীয়। সঙ্গীতানুষ্ঠান তো অনেকই হয়, কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীতরসিক কজন মেলে? সঙ্গীত আসরে মানুষ মিলিত হয় কিন্তু অনেক সময় তাদের মন গানের প্রতি নিবদ্ধ না থেকে নানা ধবনের স্থূল বিষয়ে মন নিবদ্ধ থাকে। **মীরকাসেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য**—শেঠদের প্রতি মীরকাসেম অসদ্ব্যবহার করেছেন বলে শেঠরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার ইচ্ছা করেছেন। গুরগণ খাঁও বাংলার মসনদ অধিকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য মীরকাসেমের ধ্বংস কামনা করেন। **মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্য** মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করার অর্থ মীরকাসেমের শাসন ক্ষমতার অবসান ঘটানো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল—একে ভাবী অমঙ্গলের ছায়াপাত বলা যেতে পারে অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল—পতিব্রতা দলনীর এই উক্তি তার পতি-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত। শৈবলিনীর বিপরীতে এই চরিত্র বেশ উজ্জ্বল। **দলনী-পতঙ্গ বহ্নিমুখ বিবিক্ষু হইল**—অগ্নিশিখা পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে বলেই পতঙ্গ তার দিকে ছুটে যায়। অগ্নিশিখা যে তাকে ভস্মীভূত করবে এ চিন্তা পতঙ্গের মনে উদিত হয় না। এ ধরনের অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ছুটে চলাই পতঙ্গের স্বভাব। দলনীকেও পতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সে পতিগত প্রাণা, তাই সে নবাবের কাছে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সেখানে ফিরে গেলে যে তার অমঙ্গল ঘটবে তা জানিয়ে দিলেও সে তাতে কর্ণপাত করে না। ভাগ্যের পরিহাসে নিজের মৃত্যুকে সে নিজেই ডেকে আনে।

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল—রমানন্দ স্বামী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, সুতরাং সবরকম সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন থাকাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর প্রিয় শিষ্য চন্দ্রশেখর-এর পত্নী ব্যভিচারিণী হবে, অথচ তিনি ঔদাসীন্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করবেন তা সম্ভবপর নয়। শৈবলিনীকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনাও তো তাঁরই কর্তব্য। সুতরাং সন্ন্যাসী হয়েও তাঁকে চন্দ্রশেখরের পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করতে হল। **এ সমুদ্রের কি তল নাই?**—স্ত্রীলোকের চরিত্র চিরকালই অজ্ঞাত রহস্যে ভরা। সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা যেরূপ অসাধ্য, স্ত্রী চরিত্রের রহস্যভেদ করাও সেরূপ অসাধ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্বাণ হইল— সেনাপতি গুর্‌গণ খাঁ-এর উপর নবাবের বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি মনে করেছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে গুর্‌গণ খাঁ-এর সাহায্যেই তিনি বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবেন। কিন্তু সঙ্কটমুহূর্তে নবাব যখন গুর্‌গণের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পেলেন, তখন তাঁর সব আশা-ভরসা নির্মূল হল। **নবাবের এই সময় বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল**—উদয়নালার যুদ্ধের পর বন্দী ইংরেজদেরকে নবাব হত্যার যে আদেশ দিয়েছিলেন তা তাঁর বুদ্ধি বিকৃতির কারণ। এই বুদ্ধিবিকৃতি না ঘটলে দলনীকে হত্যার আদেশ দেবেন কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

বরাট—ক্ষুদ্র ব্যক্তি। **ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল**—ইংরেজ সৈন্যের হাতে মীরকাসেমের ভাগ্য বিপর্যয় এখানে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি ঐতিহাসিক সত্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮)—ভারতের গভর্ণর জেনারেল। প্রথমে তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরানী হয়ে আসেন, পরে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন-১৭৭৪ সালে। তাঁর শাসনকালে রাজা চৈত সিং ও অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অযথা অত্যাচার করা হয়। তাঁর সময়ে 'সুপ্রিম কোর্ট' ও 'চিফ জাস্টিস'-এর পদ গঠিত হয়। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি তাঁর সময়ের প্রসিদ্ধ ঘটনা। এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন ও বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন তাঁর সময়ে হয়েছিল। বিলাতে ফিরে গেলে পার্লামেন্ট তাঁকে এই সমস্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করে, কিন্তু বিচারে তিনি নিরপরাধ সাব্যস্ত হন। **পরপীড়ক**—অপরকে যন্ত্রণাদানকারী। **কোপাবিষ্ট হল**—ক্রোধোন্মত্ত হল। **সমরু**—মীরকাসেমের একজন সৈনিক (১৭২০-১৭৭৮)। তিনি একজন জার্মান কসাইর সন্তান বলে বর্ণিত। তিনি ভারতের ফরাসী সৈন্যদলে প্রবেশ করে সমরু (Samroo) নাম গ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম ছিল Walter Reinhard।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

স্ত্রী জাতিই সংসারের রত্ন—সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। কারণ তাঁরা মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, দয়া-সহানুভূতি গুণগুলির আধার। তাই স্ত্রী-জাতিকে রত্ন বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

আত্মশুদ্ধি—নিজেকে ইন্দ্রিয় সংযম, উপবাস প্রভৃতি দ্বারা পবিশুদ্ধ করে তোলা। **জিতেন্দ্রিয়**—যিনি নিজের ইন্দ্রিয়গুলির বশীভূত না থেকে সেগুলির উপর আধিপত্য করতে সক্ষম হয়েছেন। **পারমার্থিক**—পার্থিব সব চিন্তা ত্যাগ করে ইষ্ট চিন্তা হল পারমার্থিক চিন্তা। **প্রতাপ কি তোমার জার**—যোগ প্রভাবে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর কাছ থেকে জানতে চাইল প্রতাপ কি তার প্রেমিক। পুরন্দরপুর প্রতাপের জমিদারী। **নচেৎ সম্পূর্ণ সতী**—ছেলেবেলাকার বন্ধু প্রতাপকে ভালোবাসা যদি পাপ না হয় তাহলে শৈবলিনী সম্পূর্ণ সতী। **স্ত্রী হত্যা করিতে বসিয়াছিলাম**—শৈবলিনীর মুখে আনুপূর্বিক ঘটনা শুনে চন্দ্রশেখরের মনে আক্ষেপ জন্মেছিল যে অন্যান্যদের মতো তিনিও শৈবলিনীকে পাপিষ্ঠা মনে করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ

মুক্তাপ্রবল রজত-কাঞ্চন শোভিত উচ্চাসনে—নবাব মীরকাসেম নানা মূল্যবান রত্নশোভিত সিংহাসনে বসে দরবারের কাজ পরিচালনা করছেন। **এতকাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি**—ইংরেজরা উন্নত জাতি। কিন্তু ফষ্টর নারী অপহরণকারী ও অত্যাচারী ইংরেজ ছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্বে তার অনুশোচনা জাগ্রত হয়েছে। **জানিলাম তুমি ভয়শূন্য**—নবাব ফষ্টরকে জানালেন ভয়শূন্য হিসাবে। কারণ ফষ্টর সবসময় প্রাণভয়ে

আতঙ্কিত থাকত। এমন কি ওয়ারেন হেষ্টিংসের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছদ্মনামে যোগ দিয়েছিল প্রাণের মায়াতে। সেই ফষ্টর যখন গর্বিত উক্তি করল তখন বিস্ময় বোধ করল নবাব। **জীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাস পরিহিতা**—অসুস্থ শৈবলিনী মলিন ও স্বল্প পোশাকে দরবারে উপস্থিত হয়েছে। **অরঞ্জিতকুন্তলা**—আলুথালু কেশ। **শ্বেত শ্মশ্রু বিভূষিত**—সাদা দাড়ি দ্বারা শোভিত। **বিভূতিরঞ্জিত**—ভস্ম দ্বারা সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত। **সুষুপ্তিকালে**—রাত্রিকালে নিদ্রামগ্ন অবস্থায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ

যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়—নিষ্পাপ শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর গ্রহণ করতে রাজি, কিন্তু সমাজের চোখে সে কুলত্যাগিনী। তাকে গ্রহণ করলে চন্দ্রশেখরকেও সমাজচ্যুত হতে হবে। এর হাত থেকে মুক্তির উপায় প্রায়শ্চিত্ত করা। শৈবলিনী নিষ্পাপ জেনেও শুধু লোকের মনোরঞ্জনের জন্য চন্দ্রশেখরকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। **তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম**— শৈবলিনীর উন্মাদ রোগ সম্বন্ধে প্রতাপ জানত না বলে শৈবলিনী অভিনয় করছে বলে সে মনে করল। **স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার**—নীচু জাতি যেহেতু স্বভাবতই হৃদয়ের দিক থেকে দুর্বল, তাই শৈবলিনী প্রতাপকে দূরে চলে যেতে বলল। **যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে, যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে**—মহৎ ব্যক্তিরা শত্রুমিত্র নির্বিশেষে ভালোবেসে থাকে। নীচু মনের ব্যক্তিরা শত্রুকে শত্রু মনে করে তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয় কিন্তু মহৎ ব্যক্তি তাকে হিংসা না করে ক্ষমা দ্বারা আপন করে নেয়। **এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রত ধারী**— শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের গৃহে যাতে পুনরায় অশান্তি না দেখা দেয় সেজন্য শৈবলিনীর কথায় প্রতাপ নিশ্চিত মৃত্যু গ্রহণ করতে যুদ্ধে এসেছিল। তাই রমানন্দ স্বামী বুঝিয়েছেন পরের জন্য আত্মবিসর্জন করা মহতের কর্ম। **ইন্দ্রিয় জয়ে যদি পুণ্য থাকে তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই**—প্রতাপের এই ত্যাগ পৃথিবীর যে কোন ত্যাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাই তার অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে। **চিত্ত সংযমে যদি পুণ্য থাকে তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন**—অসংযমী মানুষ-ই সংসারে নানা বিপর্যয় ঘটায়। এমনকি দেবতারাও সবসময় এই সংযমের পরিচয় দিতে পারেননি। কিন্তু শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রতাপ যেভাবে আত্মবিসর্জন করল তা দেবতার থেকেও ভাল কাজ। **লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে চাহিবে না**—সংযমী ও ইন্দ্রিয়জয়ী প্রতাপ মৃত্যুর পর অমরলোকে যাত্রা করবে এটাই রমানন্দ স্বামীর আশীর্বাদ। সেখানে চিত্ত কোন প্রলোভনে বশীভূত হয় না। ইন্দ্রিয়জয়ে কোন কষ্ট নেই। তাই প্রতাপের এই সংযমের কাছে লক্ষ শৈবলিনীও পরাজিত।

সম্ভাব্য প্রশ্ন

১। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে উপকাহিনির প্রকৃতি ও সার্থকতা বিচার কর।

২। আধুনিক উপন্যাসে অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার কতদূর সমর্থনযোগ্য? 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এর প্রয়োগ কতটা শিল্পসম্মত।

৩। 'গঙ্গার পৌরাণিক মহিমা নয়, বঙ্কিমকে প্রভাবিত করেছে এর বহতা রূপের সৌন্দর্য, তিনি অনুভব করেছেন তার 'তটে তটে বাঁকে বাঁকে অনন্তের ইঙ্গিত।'— আলোচনা কর।

৪। 'সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয় গ্রন্থ তো ভস্ম হয় না।'— লেখকের এই উক্তির আলোকে চন্দ্রশেখর শর্মার চরিত্র আলোচনা কর।

৫। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রে যে রোমান্সের উপাদান লক্ষ করা যায় তা আলোচনা কর।

৬। 'এ সংসারে নবাবি এইরূপ।'—এই মন্তব্যের আলোকে মীরকাশিম চরিত্রের ট্রাজেডি বিচার কর।

৭। শৈবলিনী চরিত্রে অতিপ্রাকৃতের প্রভাব কতদূর ব্যাপ্ত, তা আলোচনা কর।

৮। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকলেও উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় কি?

৯। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মীরকাশিম ও দলনী চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

১০। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—এ বিষয়ে আলোচনা কর।

১১। প্রতাপ-শৈবলিনী কাহিনি প্রসঙ্গে বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে—মন্তব্যটি কতদূর প্রযোজ্য, বিচার কর।

১২। প্রতাপ, না চন্দ্রশেখর—কাকে তুমি যথার্থ ট্রাজিক নায়ক বলতে পার? —এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা কর।

১৩। 'বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাস সম্পর্কে 'চন্দ্রশেখর' 'প্রতাপ' প্রভৃতি কতগুলো বড় বড় মানুষ এঁকেছেন, কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেন নি।' —রবীন্দ্রনাথের এ অভিমত কতদূর সমর্থনযোগ্য।

১৪। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃতের প্রয়োগ চরিত্র ও ঘটনাবলীর তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনে কতটা সহায়ক হয়েছে তা আলোচনা কর।

১৫। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে নিসর্গ প্রকৃতির ব্যবহারে লেখকের শিল্প নৈপুণ্যের বিশদ পরিচয় দাও।

১৬। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সামাজিক ও ঐতিহাসিক, এই দুই কাহিনি ধারার সংযোগ সাধন চন্দ্রশেখর কিভাবে করেছেন এবং শৈবলিনী ও দলনীর জীবনে তাঁর ভূমিকা কিরূপ আলোচনা করে দেখাও।

১৭। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের গঠনকৌশল সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৮। কোন কোন সমালোচকের মতে চন্দ্রশেখর শর্মার ট্রাজিডির মূলে পুরুষের অন্ধ প্রবৃত্তি নয়, আছে অতিশয় আত্মসচেতনতা এবং অসহায় কামপ্রেমের দ্বন্দ্ব। — আলোচনা কর।

১৯। 'চন্দ্রশেখর উপন্যাসে নিসর্গ প্রকৃতির সবিশেষ গুরুত্ব দেখা যায়; মানব চরিত্রের উপর তার প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য।' —আলোচনা কর।

২০। 'উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনা ও চরিত্রের উপর তাঁর অভিভাবকোচিত নিয়ন্ত্রণ কখনই শিথিল করেননি। তার অন্যতম প্রমাণ শৈবলিনী চরিত্র।'—বিচার কর।

২১। চন্দ্রশেখর উপন্যাসটিকে কেউ কেউ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে মনে করেন—এ সম্পর্কে তোমার মতামত বিশদ কর।

২২। "ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া দিতাম।"

'তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখনো তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি।' —প্রতাপ ও শৈবলিনীর এই উক্তি দুটির আলোকে উভয়ের প্রেম সম্পর্ক বিচার কর।

২৩। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত উপাদান কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখাও। এই ব্যবহারের ফলে চরিত্র নির্মাণে কী সুবিধা বা অসুবিধা হয়েছে তার আলোচনা কর।

২৪। "আমার ভালোবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। .... এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এই দেহ পরিত্যাগ করিলাম।"—প্রতাপ রায়ের এই মৃত্যু ইচ্ছাকে রমানন্দ স্বামী ও লেখক কীভাবে সমর্থন করেছেন তা দেখাও। এই সংকল্প কতদূর সমর্থনযোগ্য সে বিষয়ে তোমার অভিমত দাও।

২৫। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ হয়েছে কিনা বিচার কর।

২৬। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের শৈবলিনী চরিত্রটি কতখানি শিল্পসার্থকতা লাভ করেছে আলোচনা কর।

২৭। "ঐতিহাসিক পরিবেশ সত্ত্বেও মূলতঃ 'চন্দ্রশেখর' সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস"—এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা বিচার কর।

২৮। "বঙ্কিমের ঘটনা সমাবেশ কৌশলের চরম বিকাশ শৈবলিনী কাহিনীর সহিত দলনী উপাখ্যানের গ্রন্থনে।"—আলোচনা কর।

২৯। তোমার মতে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নায়ক কে? প্রতাপ না চন্দ্রশেখর? তোমার অভিমত যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৩০। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত অংশটির তাৎপর্য নিরূপণ কর।

৩১। "চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা জটিল ও দ্বন্দ্বময় চরিত্র শৈবলিনী।"—এ মন্তব্যের যাথার্থ্য নিরূপণ কর।

৩২। দলনী উপকাহিনিটি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মূল কাহিনির গতি-প্রকৃতি ও পরিণতি নিরূপণে কি ভূমিকা পালন করেছে, তা নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ কর।

৩৩। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের 'প্রায়শ্চিত্ত' অংশটি সংক্ষেপে বর্ণনা করে উপন্যাসে এর সার্থকতা কতটুকু তা প্রতিপন্ন কর।

৩৪। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে দুটি সন্তরণ দৃশ্য আছে। এই দুটি দৃশ্য অবলম্বনে প্রতাপ ও শৈবলিনীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রধান দিকগুলি নির্দেশ কর।